১

উৎপাদন পদ্ধতি

তত্ত্ব, এশিয়াটিক, ইতিহাস রচনায় প্রাসঙ্গিকতা,
প্রাক্-পুঁজিবাদী চীন, আমেরিকা, বাংলাদেশ

আবুল বারকাত

মুক্তবুদ্ধি
প্রকাশনা

একটি মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা

উৎপাদন পদ্ধতিঃ
তত্ত্ব, এশিয়াটিক, ইতিহাস রচনায় প্রাসঙ্গিকতা,
প্রাক্-পুঁজিবাদী চীন, আমেরিকা, বাংলাদেশ

Abul Barkat (2019). Mode of Production:
Theory, Asiatic, Historiographic relevance, Pre-capitalist China,
America, Bangladesh

প্রথম প্রকাশ: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, ১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯
স্বত্ব ২০১৯ © আবুল বারকাত
মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনার অষ্টম গ্রন্থ

বাংলাদেশে আবুল বারকাত কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত

প্রকাশক
মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনার পক্ষে
আবুল বারকাত
বাড়ি নম্বর ৫, রোড নম্বর ৮, মোহাম্মদীয়া হাউজিং সোসাইটি
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
(ফোন নম্বরঃ (+৪৪) ০২-৫৮১৫০৩৮১, ০১৯৭৭৯৯২২৬৮; ০১৭৫৬১৪২৩১৫)
ই-মেইলঃ hdrc.bd@gmail.com
info@muktobuddhi.com
ওয়েবসাইটঃ www.muktobuddhi.com

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও অলংকরণঃ সব্যসাচী হাজরা

মুদ্রণ ও বাঁধাইঃ আগামী প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং কোং
২৭ বাবুপুরা রোড, নীলক্ষেত, ঢাকা।

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
এই গ্রন্থের কোনো অংশ লেখক-স্বত্বাধিকারী-প্রকাশকের লিখিত পূর্বানুমতি ছাড়া পুনর্মুদ্রণ বা অন্য কোনো মাধ্যমে রূপান্তর করা যাবে না। আলোকচিত্র, ফটোকপি, রেকর্ডিং এই আইনি নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত।

ISBN : 978-984-34-5039-5

মূল্যঃ ৫০০ টাকা, ইউএস ৫০ ডলার, ইউকে ৩০ পাউন্ড, ইউরোপ ৪০ ইউরো

উদ্ধৃতি সুপারিশঃ আবুল বারকাত (২০১৯),
উৎপাদন পদ্ধতিঃ তত্ত্ব, এশিয়াটিক, ইতিহাস রচনায় প্রাসঙ্গিকতা,
প্রাক্-পুঁজিবাদী চীন, আমেরিকা, বাংলাদেশ। ঢাকাঃ মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।

উৎসর্গ

মানবসমাজ বিকাশের
নির্মোহ জ্ঞানানুসন্ধানীদের

সূচিপত্র

মুখবন্ধ **৯**

অবতরণিকা **১৩**

প্রবন্ধ ১. মার্কসীয়, অমার্কসীয় অর্থনীতি চিন্তা– শ্রেণিস্বার্থ ও বাস্তব তথ্য ১৭

ভূমিকা **১৭**, অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ– অমার্কসীয়, ভাববাদী চিন্তা **১৯**, মার্কসীয় অর্থনীতি চিন্তা **৩২**, দার্শনিক ভিত্তি **৩২**, রাজনৈতিক অর্থনীতি– পদ্ধতিতাত্ত্বিক প্রশ্ন **৩৬**, মার্কসীয় রাজনৈতিক অর্থনীতিতে পুঁজিবাদ– মনুষ্যবিচ্ছিন্নতার চরম রূপ **৪৪**, বাস্তব পুঁজিবাদ **৪৭**, উপসংহার **৬১**

২. ইতিহাসের পদ্ধতিতাত্ত্বিক প্রশ্ন প্রসঙ্গে– একটি মার্কসীয় অবতারণা ৬৩,

ভূমিকা **৬৩**, ঐতিহাসিক বিকাশ সূত্রায়ন: মার্কসীয় ও অমার্কসীয় ধারণা **৬৫**, ইতিহাস রচনায় ভাবনার মৌল বিষয়াদি **৭০**, অমার্কসীয় ও মার্কসীয় ইতিহাস চিন্তা: মর্মার্থটা দাঁড়াল কী? **৮৭**, প্রবন্ধে ব্যবহৃত পরিভাষা **৮৯**, তথ্যনির্দেশ **৯১**

৩. এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে মার্কস ও এঙ্গেলসের ধারণার বিকাশ– একটি মূল্যায়ন ৯৫,

ভূমিকা **৯৬**, প্রবন্ধের লক্ষ্য **৯৭**, প্রথম পর্ব– সমর্থন পর্ব (১৮৫৩ সাল পর্যন্ত) **৯৮**, দ্বিতীয় পর্ব– পরিবর্তন পর্ব (১৮৫৭-১৮৬৭) **১০৩**, তৃতীয় পর্ব– বর্জন পর্ব (ঊনবিংশ শতাব্দীর ৭০-৮০-র দশক) **১০৮**, উপসংহার **১২১**, প্রবন্ধে ব্যবহৃত গ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহ **১২২**

৪. এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি– সোভিয়েত প্রাচ্য গবেষণার দুই পর্ব ১৩১,

ভূমিকা **১৩১**, সোভিয়েত বিতর্কের দুই পর্ব **১৩২**, সোভিয়েত বিতর্কের প্রথম পর্ব **১৩৩**, সোভিয়েত বিতর্কের দ্বিতীয় পর্ব **১৩৯**, উপসংহার **১৪৩**, প্রবন্ধে ব্যবহৃত পুস্তক ও রচনাবলী **১৪৪**

৫. প্রাক্-পুঁজিবাদী চীনে আর্থসামাজিক ব্যবস্থা ও এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি ১৫৫,

অবতরণিকা **১৫৫**, বিশ্লেষণের পদ্ধতিতাত্ত্বিক প্রসঙ্গ **১৫৭**, প্রাক্-

পুঁজিবাদী চীনে ভিত্তিকাঠামো: উৎপাদনের উপায়ের ওপর মালিকানার বৈশিষ্ট্য ও পরিবর্তন **১৬০**, প্রাক্-পুঁজিবাদী চীনে উপরিকাঠামো: 'সেন্‌সি' রাষ্ট্র, মতাদর্শ ও দর্শন **১৬৯**, 'সেন্‌সি' রাষ্ট্র **১৬৯**, মতাদর্শ ও দর্শন **১৭৪**, প্রাক্-পুঁজিবাদী চীনে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ **১৭৬**, উপরিকাঠামোর পরিবর্তন: অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ ও রাষ্ট্র **১৭৭**, উপসংহার **১৮৪**, প্রবন্ধে ব্যবহৃত পুস্তক ও রচনাবলী **১৮৪**

৬. আমেরিকার পুঁজিবাদ বিকাশের ইতিহাস প্রসঙ্গে: একটি মার্কসীয় বিশ্লেষণ ১৮৯,

ভূমিকা **১৮৯**, প্রথম পর্ব: ঔপনিবেশিক অর্থনীতি– পুঁজিবাদের প্রাথমিক পুঁজির জন্মরহস্য **১৯২**, দ্বিতীয় পর্ব: শিল্পবিপ্লব ও পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির ভিত্তি স্থাপন **১৯৮**, তৃতীয় পর্ব: শোষণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুঁজি বৃদ্ধি **২০০**, শ্রম ও পুঁজির দ্বন্দ্বের পরিণাম: শ্রমশোষণ, শ্রমদিন ও পুঁজিবাদের দাসত্বশৃঙ্খল থেকে মুক্তির আন্দোলন **২০৩**, উপসংহার **২০৬**, তথ্যনির্দেশ **২০৮**, গ্রন্থপঞ্জি **২১০**

৭. বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতি: বিতর্ক, পদ্ধতিগত সমস্যা ও সমাধান ২১৩,

প্রবন্ধের লক্ষ্য **২১৩**, উৎপাদন পদ্ধতি– রাজনীতি ও গবেষণা **২১৪**, উৎপাদন পদ্ধতি ও তৎসম্পর্কিত উপাদানসমূহ **২১৭**, বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতি– একাডেমিক বিতর্ক **২২১**, আধাসামন্তবাদ আধাপুঁজিবাদ **২২৫**, পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি **২২৯**, খুদে উৎপাদন পদ্ধতি **২৩১**, আধাসামন্তবাদ আধা-ঔপনিবেশিক উৎপাদন পদ্ধতি **২৩৩**, বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতি– বিকল্পচিন্তার ভিত্তি ও উপাদান প্রসঙ্গে **২৩৭**, বিকাশের মূল প্রবণতা নির্ণায়ক উৎপাদনসম্পর্ক ও নির্ধারক উৎপাদন পদ্ধতি **২৪০**, ভাগচাষ ও বর্গা প্রথা **২৪২**, মজুরিশ্রম **২৫০**, পণ্যোৎপাদন **২৫৭**, উপসংহার **২৬৩**, প্রবন্ধে ব্যবহৃত পুস্তক ও রচনাবলী **২৬৫**

সারণিঃ

সারণি ১. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আয়, রপ্তানি, খুচরা মূল্য ও ধর্মঘটের গতিবিধি, ১৯৬৩-১৯৬৯ **৫০**

২. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে শ্রমের উৎপাদনশীলতা ও উদ্বৃত্ত মূল্যের হার, ১৮৯৯-১৯৮০ **৫০**

৩. উন্নত পুঁজিবাদী দেশের কর্মরত জনসংখ্যায় মজুরিশ্রমিকের গতি-প্রকৃতি, ১৯০০-১৯৮০ **৫১**

৪. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ধর্মঘটের প্রধান কারণসমূহ (শতকরা হিসেবে) **৫২**

৫. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প-কর্পোরেশনের সংখ্যা, পুঁজি ও নিট মুনাফা: ১৯৬০, ১৯৭০ **৫৩**

৬. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে একচেটিয়া ও অ-একচেটিয়া পুঁজির মুনাফার হার, ১৯৪৮-১৯৭০ **৫৪**

৭. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দারিদ্র্যসীমা ও ১২৫ শতাংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থানরত জনসংখ্যা, ১৯৭২-১৯৮২ **৫৬**

৮. কয়েকটি উন্নত পুঁজিবাদী দেশে বেকারত্বের গতি-প্রকৃতি **৫৭**

৯. উন্নয়নশীল দেশে বেকারত্ব **৫৮**

১০. বিশ্বে নিয়োজিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় বেসরকারি বিনিয়োগ ও মুনাফার সম্পর্ক, ১৯৫১-১৯৭০ **৫৯**

১১. প্রধান পুঁজিবাদী দেশসমূহে ধর্মঘট (বছরসমূহের গড়) **৬০**

১২. পৃথিবীর সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশের গতি-প্রকৃতি, ১৯১৭-১৯৮২ **৬২**

১৩. ১৭৭৪ সালে নিউ ইংল্যান্ড ও মধ্য কলোনিতে সম্পদের বণ্টন **১৯৪**

১৪. ১৮৫৯ সালে থেকে ১৮৯৯ সাল পর্যন্ত আমেরিকার শিল্পকারখানার হালচাল **২০২**

ছক:

ছক ১. কনভারজেন্সির প্রধান উপাদানসমূহ **৩০**

২. মার্কসীয় অর্থনীতিচিন্তায় সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপাদানসমূহের সংযোগ **৩৮**

৩. উৎপাদন পদ্ধতির উপাদানসমূহের পারস্পরিক ক্রিয়া **৩৮**

৪. উৎপাদনসম্পর্কসমূহের বিভিন্ন উপাদানের অধীনস্থক্রম (subordination) **৪০**

৫. পুঁজিবাদে মোট সামাজিক উৎপাদের উৎপাদন ও বণ্টনপ্রক্রিয়া **৪৮**

৬. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিল্প ও বাণিজ্য কোম্পানিসমূহের বাৎসরিক দেউলিয়াত্বের সংখ্যা (হাজারে), ১৯৫০-১৯৮০ **৫৫**

৭. প্রাক্-পুঁজিবাদী চীনে গত তিন হাজার বছরে সংঘটিত প্রধান সামাজিক সংঘর্ষসমূহ **১৫৯**

৮. প্রাক্-পুঁজিবাদী চীনের তিন হাজার বছরের আর্থসামাজিক ইতিহাসের বিভাজন **১৮৩**

৯. সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও তার কাঠামোগত উপাদানসমূহ **২১৮**

১০. বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে বিভিন্ন মতামতের সরল শ্রেণিবিন্যাস **২২৩**

১১. ঐতিহাসিক ক্রমধারায় লেনিনের বিভিন্ন লেখায় আর্থসামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে আধাকৃত প্রত্যয়সমূহ **২২৮**

১২. ভাগ প্রথার অন্তর্গত বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সারসত্তা **২৪৭**

নির্ঘণ্ট: ২৭১

মুখবন্ধ

সারা বিশ্বে রাজনৈতিক অর্থনীতি ও ইতিহাসের অভিমুখ বদলে গেছে অনেকটা। কাল থেকে কালান্তরে গড়ে উঠেছে নুতন সমাজ, অর্থনীতি ও উৎপাদন ব্যবস্থা। রাজনৈতিক অর্থনীতির স্রোতধারা, এর ব্যাপ্তি, গভীরতা–– সবই আকাশের মতোই ছড়ানো, দেশের সীমানা পেরিয়ে উপমহাদেশে কিংবা মহাদেশে। এ পরিপ্রেক্ষিতে সুচর্চিত উন্নয়নদর্শন-ভাবনা, বিশেষ উৎপাদনশৈলী বা পদ্ধতির মৌলিক বৈশিষ্ট্যের সনিষ্ঠ অন্বেষণ, সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতি ও সাধারণ মানুষের যাপিত জীবন–– এসবই নিয়ে গবেষণা, আবহ সৃষ্টির দায়বদ্ধতা লেখক-গবেষকের। সেটিরই সপ্রমাণ দৃষ্টান্ত আবুল বারকাত-এর অনন্য গবেষণাগ্রন্থ "উৎপাদন পদ্ধতি: তত্ত্ব, এশিয়াটিক, ইতিহাস রচনার প্রাসঙ্গিকতা, প্রাক্-পুঁজিবাদী চীন, আমেরিকা, বাংলাদেশ" স্বকীয় ভাবনার সৌকর্যে, বিশ্লেষণের সৌন্দর্যে ও গভীরতায় অন্য মাত্রায় প্রতিফলিত।

বারকাত রচিত এ গ্রন্থের আগে উৎপাদন পদ্ধতির ক্রমবিবর্তন নিয়ে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো গবেষণাগ্রন্থ, তাও বাংলা ভাষায়; লেখা হয়নি। মনস্বী লেখক বারকাত শুধু অর্থনীতির স্বনামধন্য অধ্যাপক নন, তাঁর বড় পরিচয় তিনি অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন সমাদৃত 'পলিটিক্যাল ইকনোমিস্ট'। আলোচ্য গ্রন্থে বিধৃত রয়েছে ইউরোপ, চীন, আমেরিকা এমনকি আমাদের দেশে উৎপাদন পদ্ধতি কীভাবে বিকশিত হলো, গড়ে উঠলো নুতন উন্নয়নদর্শন সে-কথাও উঠে এসেছে লেখনীর মুনশিয়ানায়, প্রতিটি অধ্যায়ের আলোচনায়। এসবই বারকাত লিখিত আকারে প্রকাশ করেছেন এখন থেকে ৩১-৩৫ বছর আগে।

রাজনৈতিক অর্থনীতির ইতিহাস বলে দেয়, নব্বইয়ের দশকের শুরুতে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতনের পর প্রায় দু' দশক উৎপাদন পদ্ধতি নিয়ে তেমন কোনো গবেষণা হয়নি। তবে ওই সময় অধ্যাপক আবুল বারকাত এ নিয়ে বেশকিছু মননশীল, গবেষণাপ্রবন্ধ লিখেছিলেন, যা বিভিন্ন জার্নাল, পত্রপত্রিকায় প্রকাশের পর মূলস্রোতবিরুদ্ধ, বুদ্ধিজীবী এবং অনুসন্ধিৎসু পাঠকমহলে সাড়া জাগিয়েছিল। বাংলাদেশের উন্নয়নদর্শন বিশেষ করে উৎপাদন পদ্ধতি; সারবস্তুর মমার্থ কী এসব নিয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো গবেষণা নেই। সেক্ষেত্রে উৎপাদন পদ্ধতির বহুধা মমার্থ বারকাতের ব্যতিক্রমী গবেষণাগ্রন্থটি নিঃসন্দেহে এক মূল্যবান সংযোজন। মার্কসীয় উৎপাদন পদ্ধতি যথার্থ ও বস্তুনিষ্ঠ— এ আঙ্গিকেই লেখক এ দেশসহ অন্য কয়েকটি দেশের ঐতিহাসিক বিকাশমান আর্থসামাজিক প্রক্রিয়ার চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন। বারকাতের লেখা গ্রন্থে "অর্থনীতি হলো ভিত্তি, রাজনীতি তার ঘনীভূত প্রকাশ" লেনিনের এ অভিমতটি তাঁর সমগ্র বিশ্লেষণে প্রাধান্য পেয়েছে। মার্কসবাদী দর্শনের

আলোকে গ্রন্থের মোট সাতটি অধ্যায় মূলত এখন থেকে ৩০-৩৫ বছর আগে আবুল বারকাত কর্তৃক রচিত ও প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহের সমাহার।

'মার্কসীয়, অমার্কসীয় অর্থনীতি চিন্তা- শ্রেণিস্বার্থ ও বাস্তব তথ্য' প্রবন্ধে বারকাত অমার্কসীয় ভাববাদী চিন্তা ও মার্কসীয় অর্থনীতি চিন্তার দার্শনিক ভিত্তি নিয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। মার্কসীয় অর্থনীতিতে পুঁজিবাদ ও বাস্তব পুঁজিবাদ কী— সবই একে একে বিশ্লেষণে উঠে এসেছে। বারকাত দেখিয়েছেন যে অমার্কসীয় বিভিন্ন চিন্তাধারায় ভিন্নতা এবং স্ববিরোধিতা থাকলেও একটি ক্ষেত্রে তাদের ঐকমত্য রয়েছে: তা হলো 'পুঁজিবাদই সর্বোত্তম অর্থনৈতিক অবস্থা'।

ইতিহাস রচনার পদ্ধতিতাত্ত্বিক প্রশ্নে মার্কসীয় ভাবনা প্রসঙ্গে বারকাত অমার্কসীয় ইতিহাস চিন্তার অন্তঃসারশূন্যতা তুলে ধরেছেন। কেননা, অমার্কসীয় ইতিহাস চর্চায় ইতিহাসের পদ্ধতিসংক্রান্ত তাত্ত্বিক বিষয়ের তেমন গুরুত্ব নেই—আমি তাঁর সাথে একমত পোষণ করি। এখানে বারকাতের সাথে আমি সহমত পোষণ করি যখন তিনি বলেন যে— অমার্কসীয় ইতিহাস চর্চায় সমাজ ইতিহাস অবিরত দৈবঘটনা পরম্পরামাত্র, সেখানে কোনো সংযোগমাধ্যম খুঁজে পাওয়া কঠিন; তাদের বিষয় বর্ণনামূলক ও খণ্ডিত। এই অধ্যায়ে লেখক মার্কসীয় দর্শনে উৎপাদন ব্যবস্থা এবং পুঁজিবাদে বণ্টনব্যবস্থা চিহ্নিত করার পাশাপাশি পুঁজিবাদে অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব এবং এর পরিণতি নিয়ে বারকাত যে বিশ্লেষণ হাজির করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য করেছেন।

গ্রন্থে এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি বিষয়টি জোরালোভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ সম্পর্কে মার্কস ও এঙ্গেলসের ধারণার বিকাশ সম্পর্কে মূল্যায়ন করা হয়েছে। এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি নিয়ে খুবই উপযোগী সোভিয়েত প্রাচ্য গবেষণার দুটি পর্ব আলোচনা করা হয়েছে। এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি কোনো বিশেষ উৎপাদন পদ্ধতি কি না, হলে এর বৈশিষ্ট্যগুলো কী এসব প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু সমাধানহীন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। মার্কস-এঙ্গেলস ১৮৫৩ সালে ভারত ও চীনের ওপর গবেষণা করেন। তাদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী উৎপাদনের উপায়ের ওপর মালিকানার ধরনই কোনো সমাজব্যবস্থার এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উত্তরণের ভিত্তি। আর সামাজিক অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের স্তরের ওপর।

এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি নিয়ে মার্কস-এঙ্গেলস বলেছেন, তার মর্মকথা হলো (যা বারকাত গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করেছেন) ভূমির ওপর ব্যক্তিমালিকানা নেই, ভূমির প্রকৃত মালিক গোষ্ঠীসমাজ আর সর্বোচ্চ আইন হলো স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র (despotic State and Rule)। এসব বিবেচেনার প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সমাজ নিঃসন্দেহে ভিন্নতর। ভূমির ওপর ব্যক্তিমালিকানার অনুপস্থিতি প্রাচ্য স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় অনিবার্য, এ নিয়ে বিভিন্ন গবেষক অবশ্য একমত নন। কেননা ইংরেজরা আসার আগে কৃষি জমির ওপর ব্যক্তিগত অধিকার খুব বেশি ছিল না, সমস্ত কৃষিজমি ছিল গ্রাম-সমাজের নিয়ন্ত্রণে। বারকাতের মতে, মার্কস-

এঙ্গেলস 'সনাতন প্রাচ্যে ভূমির ওপর ব্যক্তি-মালিকানার অনুপস্থিতি ছাড়া প্রায় সব বৈশিষ্ট্য পরবর্তী গবেষণায় ভুল প্রমাণ করেছেন। এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি নিয়ে বিতর্ক এখনো থেমে যায়নি, এখনো চলমান।

'প্রাক্-পুঁজিবাদী চীনে আর্থসামাজিক অবস্থা ও এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি' প্রবন্ধে বারকাত উত্থাপন করেছেন যে, এশিয়াটিক উৎপাদন ব্যবস্থার ভেতরেই চীনের আর্থসামাজিক অবস্থা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। প্রাক্-পুঁজিবাদী চীনে তিন হাজার বছরের আর্থসামাজিক ব্যবস্থার ভিত্তি-ভূমির মালিকানা ও এ সম্পর্কিত বিষয়ের বিভিন্ন পরিবর্তন তুলে ধরেছেন। এখানে দেখানো হয়েছে, প্রাচীন থেকে মধ্যযুগীয় চীনে ব্যতিক্রমী কিছু পরিবর্তনের ভিত্তি ছিল ভাগচাষ প্রথা, যার সূচনাকাল খ্রীষ্টীয় তৃতীয়-সপ্তম শতক। বারকাতের মতে, এই সময়টি, দাস ও সামন্তবাদী সামাজিক স্তর। প্রাক্ পুঁজিবাদী চীনে তিন হাজার বছরে উৎপাদিকা শক্তি ও বিভিন্ন উৎপাদনসম্পর্ককে পরিবর্তন এসেছে অনেক; বিভিন্ন মাত্রার সামাজিক সংঘর্ষে সেই পরিবর্তনগুলোর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বারকাতের এসব আবিষ্কার নিঃসন্দেহে চিন্তা উদ্রেককারী।

আমেরিকার পুঁজিবাদ বিকাশের ইতিহাসকে বারকাত মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে অনেকেই পুঁজি ও শ্রমের দ্বন্দ্বের বিষয়টি নিতান্তই গৌণ মনে করেন। সে কারণেই আমেরিকার পুঁজিবাদ ইতিহাস প্রণয়নেও তাদের তেমন আগ্রহ নেই। অথচ ব্রিটিশ সামাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামের মাধ্যমেই আমেরিকার স্বাধীনতা এসেছে, সেখানে অনেক প্রগতিশীল আন্দোলন হয়েছে, যা কোনোভাবেই উপেক্ষণীয় নয়। প্রকৃতপক্ষে, আমেরিকার ইতিহাস শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস। আমেরিকার প্রাথমিক পুঁজি সঞ্চয়ের মূল উৎস ছিল আফ্রিকার মানুষদের দাসত্ব। আমেরিকার পুঁজি সঞ্চয়ের চরিত্র দ্বিমুখী। স্বাধীনতাপরবর্তী সময়ে শিল্প বিপ্লবের ক্ষেত্র গড়ে তোলা, কৃষি ও শিল্পোন্নয়নের নানা কারণ, দাস শ্রমভিত্তিক কৃষিব্যবস্থা ও পুঁজিবাদী চাষপ্রথা, গৃহযুদ্ধর কারণ সবই উঠে এসেছে বারকাতের আলোচনা-বিশ্লেষণ।

বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতি নিয়ে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে এবং স্বাধীনতার পর থেকে আশির দশক পর্যন্ত বির্তক চলেছে। তবে সেগুলোর ধারাবাহিকতা ছিল না; আর অন্যদিকে সেসবে ছিল না পদ্ধতিতাত্ত্বিক শক্তি। এসব নিয়ে এখন নতুন করে কিছু চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে। বারকাতের মতে, উৎপাদন পদ্ধতির স্বরূপ উন্মোচনে বামপন্থীরা মার্কসীয় প্রত্যয়ের চেয়ে রাজনৈতিক প্রত্যয়গুলোকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর মতে, এসবই তাদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সীমাবদ্ধতা। বারকাত উৎপাদন পদ্ধতি, এর উপাদান এবং উৎপাদনসম্পর্কের উপাদানগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে ধারণা দিয়েছেন। বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতির প্রাসঙ্গিক আলোচনায় আধা- সামন্তবাদ, আধা-উপনিবেশিক উৎপাদন পদ্ধতি, ভাগচাষ ও

বর্গাপ্রথা, মজুরিশ্রম, এ দেশের উৎপাদন পদ্ধতি নিয়ে বিকল্প চিন্তার ভিত্তি— এমন গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ই বারকাতের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি।

সমাজ বিবর্তনের ইতিহাস থেকে যেকোনো দেশ-কালের "উৎপাদনব্যবস্থা"র স্বরূপ চেনা যায়। কার্ল মার্কস সমাজের ঐতিহাসিক বিবর্তনকে কয়েকটি উৎপাদন ব্যবস্থা পরম্পরার আলোকে দেখেছিলেন। কিন্তু, অন্য কোনো কোনো প্রাচ্যদেশ এবং সেখানকার সমাজের জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট গবেষণার প্রাথমিক পর্বে প্রবর্তন করেছিলেন স্বকীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সম্পূর্ণ ভিন্ন এক উৎপাদন ব্যবস্থার ধারণা, যার নাম 'এশিয়াটিক মোড অব প্রোডাকশন' বা 'এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি'। গবেষণার প্রাথমিক স্তরে মার্কস মনে করতেন, ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের আগমন পর্যন্ত এ উৎপাদন ব্যবস্থায় তেমন বদল হয়নি।

নিটোল বাংলা ভাষায় লেখা এ গ্রন্থের এক অধ্যায় থেকে অন্য অধ্যায়ে, পর্ব থেকে পর্বান্তরে স্বচ্ছন্দ, সুস্থিত ভাবনার বিন্যাস বলে দেয় আদিম সাম্যবাদ, দাস, সামন্ত, পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদ এই বহুমাত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার পরতে পরতে কীভাবে মিশে আছে স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের নানা অভিব্যক্তি। উন্নয়নদর্শনের আলোকে প্রতিটি বিষয়ে তাত্ত্বিক ও তথ্যনিষ্ঠ পরিমিত বিশ্লেষণ খুঁজে পাবেন এ গ্রন্থের উৎসাহী পাঠক। বিভিন্ন দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ে প্রাসঙ্গিক তত্ত্ব ও ভাবনার বুনোট বারকাত-এর এই গ্রন্থ।

রাজনৈতিক-অর্থনীতির আঙিনা বৈচিত্র্যে ভরা। বারকাত-এর এ গ্রন্থে এসব বৈচিত্র্যের মধ্যে আছে দেশ-কালভেদে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে, উৎপাদন ব্যবস্থায় নিহিত শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মানুষের লড়াইয়ের ছবি। এ গ্রন্থে বারকাতের ভাবনা বারবার মনে করিয়ে দেয় নানা আন্দোলন, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, সহিংসতা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সমাজ-দেশ-মহাদেশনির্বিশেষে পালটে গেছে উৎপাদন পদ্ধতি। এটি বলতে গিয়ে রাজনীতি-অর্থনীতি-ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের অর্ন্তগত কিছু প্রশ্নে মেধাবী আলো ফেলেছেন বারকাত; সন্ধান করেছেন উপযুক্ত কোনো দর্শন-ভিত্তিরও। বলতে দ্বিধা নেই যে বারকাত বহুধা ও জটিল জিজ্ঞাসার পল্লব মেলে ধরেছেন আমাদের সামনে। উৎপাদন পদ্ধতির মতো অতি দুরূহ, জটিল একটি বিষয়ে বারকাত তাঁর নিজস্ব ধারণা যে-ভাবে পৌঁছে দিলেন গ্রন্থবদ্ধ করে— তা আমাদের জ্ঞানজগতের বড়ো একটি ঘটনা। সাতটি অধ্যায়ে বিভাজিত ভাবনা; কিন্তু আশ্চর্য সন্নিবদ্ধ বারকাত- এর এই গ্রন্থ— সাময়িক নয়, চিরকালের।

ঢাকা: ৫ জানুয়ারি, ২০১৯

ড. শফিক উজ জামান
অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
অর্থনীতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অবতরণিকা

এখন থেকে ৩০-৩৫ বছর আগে (১৯৮৪-১৯৯০) প্রকাশিত মর্মবস্তুর নিরিখে মূলত একই ধরনের বিষয়ে আমার সাতটি প্রবন্ধের সংকলন– এই গ্রন্থ। মূল বিষয়বস্তু "উৎপাদন পদ্ধতি" (Mode of Production)। সাথে আছে বিভিন্ন সময় ও পরিপ্রেক্ষিতে তার বিচার-বিশ্লেষণ। বিষয়বস্তুর নিরিখে প্রবন্ধসমূহ পরস্পরসম্পর্কিত হলেও প্রতিটি প্রবন্ধই স্বয়ংসম্পূর্ণ (Stand alone অর্থে)। সাতটি প্রবন্ধের চারটিতে "উৎপাদন পদ্ধতি" প্রত্যয়টি শিরোনামেই অন্তর্ভুক্ত, আর অন্য তিনটি প্রবন্ধের শিরোনামে প্রত্যয়টি না থাকলেও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে উৎপাদন পদ্ধতির ধারণাটিই প্রধান।

প্রবন্ধসমূহ যেহেতু ৩০-৩৫ বছর আগে প্রকাশিত এবং যেহেতু গত ৩০-৩৫ বছরে পৃথিবীতে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে, সেহেতু পাঠকের সুবিধার কথা বিবেচনা করে প্রতিটি প্রবন্ধের শুরুতে *'প্রসঙ্গকথা'* নামে কিছু কথা যোগ করেছি মাত্র (যা প্রকাশিত মূল প্রবন্ধে ছিল না)। ৩০-৩৫ বছর আগে আমার নামে প্রকাশিত মূল প্রবন্ধের কোথাও কোনো ধরনের পরিবর্তন-পরিবর্ধন করিনি। পরিমার্জন যতটুকু করেছি তা হলো বাংলা বানান পরিশুদ্ধ এবং ক্ষেত্রবিশেষে অসম্পূর্ণ বাক্য সম্পূর্ণ করার চেষ্টামাত্র অথবা বলা চলে যথারীতি (Uniform) করার প্রয়াস। আরো একটি কথা না বললেই নয়। তা হলো এখন থেকে ৩০-৩৫ বছর আগে কম্পিউটার ছিল না। টাইপের কাজটা করতে হতো ম্যানুয়াল টাইপরাইটারে; আর একই অবস্থা ছিল মুদ্রণশিল্পে। এসব কারণে প্রকাশিত মূল প্রবন্ধে কোথাও কোথাও, এমনকি বাক্যও অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। এ ধরনের ক্ষেত্রে বাক্য সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করেছি মাত্র। আর পাঠকের পাঠসুবিধা বিবেচনায় রেখে গ্রন্থের শেষে একটি নির্ঘণ্ট (Index) সংযোজন করেছি।

আজ থেকে ৩০-৩৫ বছর আগের উৎপাদন পদ্ধতিসংশ্লিষ্ট লেখাপত্তর-প্রবন্ধসমূহ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার কারণ কী? এ প্রশ্নটি অমূলক নয়। এ নিয়ে আমার সরল উত্তর হলো– ৩০-৩৫ বছর আগে 'উৎপাদন পদ্ধতি' নিয়ে আমার ভাবনাউদ্ভূত প্রকাশিত লেখার সময়োপযোগিতা, সঠিকতা ও কালোত্তীর্ণ উপযোগিতা পরীক্ষা করে দেখা (বলতে পারেন একধরনের "Validation" অথবা অনুসিদ্ধান্ত-ভাবনা পরীক্ষা "Hypothesis testing")। কিন্তু তার চেয়ে বড় কারণ যেটা, তা হলো– এই যে আজকের যুগের সামাজিক বিজ্ঞানীরা "উৎপাদন পদ্ধতি" নিয়ে আর লেখেন না, তেমন ভাবেন না, অথবা বলা চলে সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্রবিকাশের বৈশিষ্ট্য গতি-প্রকৃতি বুঝতে "উৎপাদন পদ্ধতি" প্রত্যয়টি মোটামুটি বাতিল ঘোষণা করেছেন। আবার এসবের পাশাপাশি "উৎপাদন পদ্ধতি"র তত্ত্ববিনির্মাতা কার্ল মার্কসের জন্মের ২০০ বছর পরে নতুন করে পৃথিবীকে বুঝতে শুরু করতে হয়েছে 'মার্কস পুনঃচিন্তা' (Rethinking Marx), 'মার্কসকে অনুধাবন' (Understading Marx), 'মার্কস পুনঃমূল্যায়ন' (Re-evaluating Marx) ইত্যাদি।

অর্থনীতিশাস্ত্রের পণ্ডিতরা এখন মনে করেন, আর্থসামাজিক বিকাশের প্রবণতা বুঝতে 'প্রবৃদ্ধি', 'কর্মসংস্থান', 'মূল্যস্ফীতি', 'বিশ্বায়ন', 'রেশন্যালিটি'– এসব বুঝলেই চলবে; চলবে সংশ্লিষ্ট গাণিতিক মডেল বিনির্মাণ ও তা পরীক্ষা-নীরিক্ষা করলেই। তাঁরা মনে করেন, "উৎপাদন পদ্ধতি" নিয়ে গবেষণা অপ্রয়োজনীয়; বিষয়টি সেকেলে এবং সময়ক্ষেপণমাত্র। কারণ, মূলধারার অর্থনীতিবিদদের (Mainstream economists) ধারণায় "পুঁজিবাদ" হলো সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বশেষ এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। অর্থনীতিবিদদের কেউ কেউ আবার মনে করেন যে "উৎপাদন পদ্ধতি" অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি "সমাজবিজ্ঞানীয় অর্থনীতিবিদদের" (Sociological School of Economics) বিচরণক্ষেত্র হলেও হতে পারে। আর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রায় সব মূলধারাও "উৎপাদন পদ্ধতি"-সংশ্লিষ্ট বিষয়টিকে রাষ্ট্রবিকাশের গতি-প্রকৃতির নির্ণায়ক মনে করে না। অথচ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের (Political scientists) অনেকেই এখনো মনে করেন রাষ্ট্রমাত্রেই "শোষিতদের শোষকদের অধীনে রাখার যন্ত্রবিশেষ"। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা প্রাচীন দার্শনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্লেটোর কথা ভুলেও গেছেন যে "একটি ভালো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তি হলো জ্ঞান; সংখ্যা বা পরিমাণ নয়"। আর ইতিহাসবেত্তারা (Historians) ঐতিহাসিক বিকাশে এবং ইতিহাস রচনার (historiography) ক্ষেত্রে এখন আর "উৎপাদন পদ্ধতি" প্রত্যয়টিকে তেমন গুরুত্ববহ মনে করেন না। এসবের বিপরীতে এখন ইতিহাসবেত্তারা 'ক্লিওমেট্রিকস' অথবা অধুনা-উত্তর অথবা উপনিবেশ-উত্তর ধারণা নিয়ে মাতামাতি করছেন। আর সমাজবিজ্ঞানীরা (Sociologists) এখনো 'শ্রেণি' (class) নিয়ে কথাবার্তা বলেন; কিন্তু অধিকাংশই শ্রেণিবিশ্লেষণে নিয়ামক উপাদান অথবা নিয়ামক ধারণা হিসেবে "উৎপাদন পদ্ধতি" ধারণাটিকে সম্ভবত এড়িয়ে চলছেন। এতক্ষণ যা বললাম সেসবের পাশাপাশি আছে পোস্ট-কলোনিয়ালইজম, পোস্ট-মর্ডানিজম, নিম্নবর্গের ইতিহাসসহ হরেক তত্ত্বকথা, যেখানে "উৎপাদন পদ্ধতি" তত্ত্ব হয় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত না হয় উপেক্ষিত। এসবই এ গ্রন্থটি প্রকাশের প্রধান ভিত্তি-কারণ।

এ গ্রন্থটি পাঠ করে হয়তো বা পাঠক আবিষ্কার করবেন যে লেখক 'সমাজতন্ত্র' নিয়ে অতি-উচ্ছ্বাসী আর 'পুঁজিতন্ত্র' নিয়ে বিদ্বেষাভাবাপন্ন। এসব নিয়ে আমি ভূমিকাতে কোনো ধরনের মত প্রকাশে বিরত থাকা শ্রেয় বোধ করছি। কারণ, ৩০-৩৫ বছর আগের এসব লেখা থেকে উপসংহার টানবেন পাঠক নিজেই। বিষয়টি পাঠকের জ্ঞানসংশ্লিষ্ট অধিকার। তবে আমার মতটা পরিষ্কার– "উৎপাদন পদ্ধতি"সংশ্লিষ্ট ধারণাটি সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র-এর নিহিতার্থ অনুধাবনে অপরিহার্য ধারণা। পাঠক লক্ষ করবেন যে আজ থেকে ৩০ বছর আগে প্রথম প্রবন্ধে আমি লিখেছি যে, "পুঁজিবাদের সহজাত দ্বন্দ্বসমূহ নিরসনে বৈজ্ঞানিক-কারিগরি বিপ্লব নয়, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবই একমাত্র পথ" (পৃষ্ঠা ৬২)। আমি এও লিখেছি যে "সুতরাং সভ্যতার অতীত ও বর্তমান ইতিহাস এবং সেই সাথে ভবিষ্যতের প্রবণতা শ্রেণিভিত্তিক সমাজের শ্রেণিহীন সমাজে উত্তরণের অবশ্যম্ভাবিতার মার্কসীয় তত্ত্বকে অকাট্য প্রতিপন্ন করে" (পৃষ্ঠা ৬১)। এসব উপসংহারিক বক্তব্যের ৩০ বছর পরেও আমি মনে করি, আমার বক্তব্য

যুক্তিযুক্ত। কারণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমার বক্তব্যসমূহ কোনো নির্দিষ্ট সমাজতান্ত্রিক দেশকেন্দ্রিক নয়, বিকাশের গতিধারায় সমাজতন্ত্র তথা সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থার ঐতিহাসিক অনিবার্যতাকেন্দ্রিক। এখানে প্রশ্নটা হতে পারে 'সময়' (time) এবং 'পরিপ্রেক্ষিত' (context) নিয়ে। আমার ধারণা হলো– প্রায়োগিক সমাজতন্ত্র ছিল মনুষ্যসভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় মাপের এক্সপেরিমেন্ট (যা হয়তো বা ব্যর্থ হয়েছে এবং যে ব্যর্থতার কারণ 'সাম্যবাদে'র অনিবার্যতার তত্ত্ব নয়, অন্য অনেক কিছু)।

পাঠকের সুবিধে বিবেচনা করে আরো একটি বিষয় বলা দরকার। আর তা হলো ৩০-৩৫ বছর আগে লেখা ও প্রকাশিত স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রবন্ধসমূহ যেহেতু এ গ্রন্থে একই মলাটের মধ্যে আনা হয়েছে, সেহেতু প্রতিটি প্রবন্ধের ছক-সারণিসমূহের ক্রম আগের মতো নেই। এসবের ক্রম পরিবর্তন করে গ্রন্থধারা/বিধি মেনে চলার চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন এই গ্রন্থের ছক ৭ প্রকাশিত মূল প্রবন্ধে ছিল ছক ১, আবার এই গ্রন্থের সারণি ১৩ প্রকাশিত মূল প্রবন্ধে ছিল সারণি ১।

মোট সাতটি প্রবন্ধ নিয়ে এ গ্রন্থ। প্রতিটি প্রবন্ধের বিষয়বস্তু শিরোনামেই সব্যাখ্যায়িত। শিরোনামসমূহ নিম্নরূপ: মার্কসীয়, অমার্কসীয় অর্থনীতি চিন্তা শ্রেণিস্বার্থ ও বাস্তব তথ্য (প্রবন্ধ ১); ইতিহাসের পদ্ধতিতাত্ত্বিক প্রশ্ন প্রসঙ্গে একটি মার্কসীয় অবতারণা (প্রবন্ধ ২); এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে মার্কস ও এঙ্গেলসের ধারণার বিকাশ একটি মূল্যায়ন (প্রবন্ধ ৩); এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি সোভিয়েত প্রাচ্যগবেষণার দুই পর্ব (প্রবন্ধ ৪); পুঁজিবাদী চীনে আর্থসামাজিক ব্যবস্থা ও এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি (প্রবন্ধ ৫); আমেরিকায় পুঁজিবাদ বিকাশের ইতিহাস প্রসঙ্গে একটি মার্কসীয় বিশ্লেষণ (প্রবন্ধ ৬); বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতি: বিতর্ক, পদ্ধতিগত সমস্যা ও সমাধান (প্রবন্ধ ৭)।

পাঠক এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত প্রবন্ধসমূহে আপাতদৃষ্টিতে বেশকিছু অসামঞ্জস্য (Inconsistency) লক্ষ করবেন। যেমন কোনো কোনো প্রবন্ধের শেষে 'উপসংহার' শিরোনামটি নেই অথবা প্রবন্ধের শেষে 'তথ্যপঞ্জির' নামকরণ একই নয়। এসব আমার সচেতন সিদ্ধান্ত। আমি ৩০-৩৫ বছর আগে প্রকাশিত আমার রচনাসমূহ কোনো ধরনের পরিবর্তন করতে চাইনি। কারণ পরিবর্তন করলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমার ৩০-৩৫ বছর আগের ধারণার বিকৃতি ঘটতো, যা আমার উদ্দেশ্য নয়; এবং রাজনৈতিক অর্থনীতির "উৎপাদন পদ্ধতি" (Mode of Production) ধারণাটি যে সমাজবিকাশ-বোধে মৌলিক এক ধারণা তা থেকে আমাকে বিচ্যুত হতে হতো (যা আমি সচেতনভাবেই এড়িয়ে গিয়েছি)।

আমার রচিত "উৎপাদন পদ্ধতি" শিরোনামে প্রবন্ধসমূহ গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য অনেক বছর ধরে অনেকেই তাগাদা দিয়েছেন; উৎসাহিত করেছেন অনেকেই, যাঁদের কেউ কেউ ইতিমধ্যে গত হয়েছেন। ওই অনুপ্রেরণাদানকারীদের মধ্যে কয়েকজনের নাম না বললেই নয়— প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক ড. সালাউদ্দিন আহমদ (ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়), প্রয়াত অধ্যাপক ড. আবু মাহমুদ (অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক ড. অজয় রায় (পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক ড. রঙ্গলাল সেন (সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক ড. শফিক উজ জামান (অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক সুভাস কুমার সেনগুপ্ত (ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ, সরকারী তিতুমীর কলেজ), আসমার ওসমান (এইচডিআরসি) প্রমুখ। আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

এ গ্রন্থের মুখবন্ধ লিখেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. শফিক উজ জামান। এজন্য তাঁর প্রতি আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ।

গ্রন্থটির মূল পাণ্ডুলিপি টাইপ ও পুনঃটাইপে সহযোগিতা করেছেন হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টারের (এইচডিআরসি) মো. মোজাম্মেল হক; পাণ্ডুলিপি টাইপের পরে প্রকাশিত মূল প্রবন্ধের সাথে মিলিয়ে দেখতে সহায়তা করেছেন সেলিম রেজা (এইচডিআরসি); পাণ্ডুলিপির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বাংলা ভাষার বানানরীতি একাগ্রতার সাথে দেখে দিয়েছেন এস এম তারিকুল ইসলাম— আমি এদের সবার কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। গ্রন্থের প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও অলঙ্করণের কাজটি করেছেন সব্যসাচী হাজরা। আর ছাপার কাজটি নিখুঁত করার চেষ্টা করেছেন শাহিন আহমেদ— এদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। প্রেসে দিনরাত শ্রম দিয়েছেন আব্দুল মোতালেব, নিত্য চন্দ্র, আরিফ রব্বানী, ইমরান ও গিয়াসউদ্দিন সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

আমার চিন্তাভাবনা ও লেখালেখির মূল জায়গা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তর ফুলার রোড ৩৭/জি— এর চিলেকোঠায় আমাকে সময়-অসময়ে চা-পানি দিয়েছে শিল্পী খাতুন, আদুরি খাতুন, আব্দুল হক বাবুল— ওদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আর আমার চিন্তাশ্রমে বরাবরের মতোই উৎসাহ জুগিয়েছে— আমার কন্যাত্রয় অরণি, আনোখি, অবন্তি ও সহধর্মিণী অধ্যাপক ডা. শাহিদা আখতার ওদের ঋণ অপরিমেয়।

পাঠকদের আগাম ধন্যবাদ।

ঢাকা: ৮ জানুয়ারি, ২০১৯ আবুল বারকাত

প্রবন্ধ ১

মার্কসীয়, অমার্কসীয় অর্থনীতি চিন্তা– শ্রেণিস্বার্থ ও বাস্তব তথ্য

প্রসঙ্গকথা: *এ প্রবন্ধের রচনাকাল ১৯৮৩-৮৫ এবং প্রকাশকাল ১৯৮৬ সাল। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল* ***ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকায়*** *(চতুর্বিংশ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৯২, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬, পৃ. ৬৪-১১১)। প্রবন্ধে উত্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ে বিশ্লেষণমূলক মতামত দিয়ে সহায়তা করেছিলেন* ***ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকার*** *তৎকালীন সম্পাদক অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (এখন এমিরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রয়াত অধ্যাপক ড. আবু মাহমুদ– উভয়ের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তবে সব বিশ্লেষণাত্মক অভিমতের দায়ভার একান্তই আমার নিজের। এ প্রবন্ধের পাঠককে দুটো বিষয় স্মরণে রাখতে অনুরোধ করব। প্রথম বিষয়– প্রবন্ধটি যখন প্রকাশ হয় (১৯৮৬ সাল) তখনো সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বৈশ্বিক আর্থসামাজিক ব্যবস্থার অন্যতম মেরু, আর সে কারণেই ক্ষেত্রমতে দৃশ্যমান সমাজতন্ত্রের অন্তর্নিহিত শক্তি নিয়ে "উচ্ছ্বাস"-এর ছোয়া আছে। ক্ষেত্রবিশেষে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা আর পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে খটকা লাগতে পারে। দ্বিতীয় বিষয়– প্রবন্ধটি যেহেতু ১৯৮৩-৮৫ সালের দিকে রচিত, সেহেতু পরিসংখ্যানিক তথ্য-উপাত্তের সময়কালও তদনুরূপ। তবে আমি মনে করি যে প্রবন্ধে উত্থাপিত বিষয়াদি এখনো গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশ্লেষণ-উদ্ভূত উপসংহার সঠিক প্রবণতা নির্দেশকারী। একই সাথে মনে করি, উত্থাপিত বিষয়াদি নিয়ে ব্যাপক-বিস্তৃত ও সুগভীর গবেষণা করতে হবে। সেক্ষেত্রে সবচেয়ে জরুরি বিষয় হতে পারে চিন্তা-চেতনার প্রথাসিদ্ধ পথ থেকে বেরিয়ে এসে এগিয়ে যাওয়া।*

ক. ভূমিকা

"প্রত্যেক সমাজের অর্থনৈতিক সম্পর্ক প্রকাশ পায় প্রধানত স্বার্থ রূপে।"[১] শ্রেণিবিভক্ত সমাজে কোনো একটি একক অর্থনীতিশাস্ত্র বা অভিন্ন অর্থনীতি চিন্তা থাকতে পারে

[১] "মার্কস-এঙ্গেলস রচনাসমগ্র", রুশ সংস্করণ, খণ্ড ১৮, পৃ. ২৭১। প্রবন্ধে ব্যবহৃত উদ্ধৃতিসমূহ (রুশ ও ইংরেজি ভাষা থেকে গৃহীত) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লেখক কর্তৃক অনূদিত।

না। যেখানে শ্রমের প্রক্রিয়া (process of labour) সামাজিক এবং শ্রমোৎপাদিত উদ্বৃত্ত মূল্যের মালিক ব্যক্তি, সেখানে অবশ্যই একাধিক অর্থনীতি চিন্তা থাকবে। একটা শ্রমিকের, অন্যটা শ্রমফল আত্মসাৎকারী মালিকের; অবশ্যই আধিপত্য বিস্তারকারী শ্রেণির রাজত্বে আধিপত্য বিস্তারকারী মতাদর্শকে ঐ শ্রেণির স্বার্থই রক্ষা করতে হবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বললে বলতে হয় যে আমাদের দেশে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, সেমিনারসমূহে, পত্রপত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন মারফত যে অর্থনীতি চিন্তা প্রচার করা ও শেখানো হয়, তা অবশ্যই শোষিত মানুষের স্বপক্ষে নয়। আর বাস্তব বিচারে তেমনটা আশা করা বস্তুনিষ্ঠও নয়।

উল্লেখ্য যে, বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়া– যার অন্তর্ভুক্ত সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা, উন্নত পুঁজিবাদী দেশসমূহে একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রামের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং উন্নয়নশীল দেশে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন– বিকশিত হওয়ার সাথে সাথে সামাজিক-অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের মার্কসীয় পদ্ধতির প্রতিও আকর্ষণ বাড়ছে, শ্রেণিসংগ্রাম প্রকট থেকে প্রকটতর হওয়ার সাথে সাথে যেমনি মেহনতি মানুষের মধ্যে, তেমনি শত্রু মহলেও মার্কসীয় অর্থনীতি চিন্তার প্রতি আকর্ষণ বাড়ছে। এমনকি "মার্কস চর্চা" (Marxology) পশ্চিমা পুঁজিবাদী দেশসমূহে প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যও পেয়েছে। তাই মার্কসের মৃত্যুর শতবর্ষ পরেও আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সত্যিকার মুক্তি আন্দোলনে রূপান্তরিত করার মতাদর্শগত হাতিয়ার হিসেবে অমার্কসীয় অর্থনীতি চিন্তার মার্কসীয় মূল্যায়ন ও মার্কসীয় অর্থনীতি চিন্তার স্বরূপ আলোচনাটা একান্ত প্রয়োজন ও সময়োপযাগী। আর বাস্তবই যেহেতু মানদণ্ড, তাই বুর্জোয়া সমাজের অন্তর্নিহিত অসঙ্গতিসমূহের সারসত্তা উদ্‌ঘাটন করেই মার্কসীয় অর্থনীতি চিন্তার সত্যতা যাচাই করা বিজ্ঞানসম্মত।

যেকোনো বিষয় সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাভাবনার মূল লক্ষ্য হলো ঐ বিষয়াভ্যন্তরের ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করা, ক্রিয়াগুলোর পরস্পরসম্পর্ক উদ্‌ঘাটন করা এবং বাস্তব সত্যকে তার গভীর ঐক্য ও নিরবচ্ছিন্ন বিকাশের পথে জানা। অর্থনীতিবিষয়ক চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। তবে উল্লেখ করা উচিত যে অর্থনীতি চিন্তার পথটা প্রকৃতিবিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্রিয়াকাণ্ড নিয়ে চিন্তার চেয়ে জটিল। কারণ সেক্ষেত্রে যা অনুসন্ধান করতে হয় তা হলো বৈষয়িক উৎপাদনের উপায়সমূহ ও শ্রমপদ্ধতি কর্তৃক প্রতিফলিত ও প্রকাশিত সামাজিক-অর্থনৈতিক সম্পর্ক।[২] আর

[২] উল্লেখ্য যে "পলিটিক্যাল ইকনোমি"র বিষয়বস্তু হলো যেকোনো সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অন্তর্গত উৎপাদন সম্পর্কসমূহকে তাদের সহজাত উৎপাদিকা শক্তিসমূহের সাথে সঙ্গতি রেখে

এই অনুসন্ধান প্রসঙ্গে মার্কসের কথায় বলা যায়, "অর্থনৈতিক রূপসমূহের বিশ্লেষণে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ও রাসায়নিক বিকারক কোনো কাজে আসে না। এ দুয়ের পরিবর্তে চাই বৈজ্ঞানিক বিমূর্তকরণ (Scientific abstraction)।"[৩] অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনা যে প্রকৃতিবিজ্ঞানের যেকোনো প্রশ্ন নিয়ে চিন্তাভাবনার চেয়ে জটিল তার কারণ অর্থনীতির কাজকারবার প্রকৃতির অপরিবর্তিত সূত্রাবলী নিয়ে নয়, তার অনুসন্ধানের বিষয় ঐতিহাসিকভাবে প্রতিনিয়ত পরিবর্তমান অর্থনৈতিক সম্পর্ক; অনুরূপ প্রত্যয় ও নিয়মসমূহ (Categories and Laws)। দুয়ের মাঝে মিল যতটুকু তা হলো (ক) বেঠিক চিন্তাপদ্ধতি উভয় ক্ষেত্রেই চিন্তার বিষয় সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করে এবং (খ) শ্রেণিবিভক্ত সমাজে উভয় ক্ষেত্রে চিন্তাপদ্ধতি শ্রেণিস্বার্থের কোনো না কোনো বেড়াজালে আবদ্ধ।

সারা বিশ্বে অর্থনীতিবিষয়ক ক্রিয়াকলাপ নিয়ে এ পর্যন্ত যে ধাঁচে, যে পদ্ধতিতে চিন্তাভাবনা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে, সেটাকে আমরা মূলত দুই ধারায় (শ্রেণিতে) বিভক্ত করতে পারি। প্রথমটি অমার্কসীয় ও ভাববাদীয়, দ্বিতীয়টি মার্কসীয় ও দ্বন্দ্বাত্মক বস্তুবাদী ধারা। উল্লেখ করা উচিত যে আলোচ্য প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর ওপর লক্ষ্য রেখে আমরা প্রবন্ধকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেছি। সেগুলো হলো:

- "অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ"– অমার্কসীয়, ভাববাদী চিন্তা ও শ্রেণিস্বার্থ;
- মার্কসীয় অর্থনীতি চিন্তা– দার্শনিক ভিত্তি, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-পদ্ধতিতাত্ত্বিক প্রশ্ন ও পুঁজিবাদ– মনুষ্যবিচ্ছিন্নতা;
- বাস্তব পুঁজিবাদের গতিশীল তথ্যাবলী;
- উপসংহার।

এ ধরনের বিভক্তিকরণের ফলে আমরা আশা করি যে হয়তো বা বিষয়বস্তু সম্পর্কে পাঠক একটি সামগ্রিক প্রতিচ্ছবি এবং চিন্তা উদ্রেককারী তত্ত্ব ও তথ্যাদি একীভূত অবস্থায় পেতে সক্ষম হবেন।

খ. অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ– অমার্কসীয়, ভাববাদী চিন্তা

অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ে বিভিন্ন ধরনের ভাববাদী চিন্তাভাবনাকে মোটামুটি তিনটি বর্গে বিভক্ত করা সম্ভব। সেগুলো হলো– (ক) মন্ময়, চেতনানির্ভর বা

বিশ্লেষণ করা অথবা (একই কথা) নির্দিষ্ট সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় ও পরিভোগের বিকাশসূত্র উদ্‌ঘাটন করা।

[৩] মার্কস, "পুঁজি", রুশ সংস্করণ, (মস্কো, ১৯৭৩) প্রথম খণ্ড, পৃ. ৬।

আধ্যাত্মীয় ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি (Subjective Idealism); (খ) নব-নিসর্গবাদীয়– অভিজ্ঞতাবাদী ও সন্দেহবাদী দৃষ্টিভঙ্গি (Neopositive-Empiricism and Scepticism); (গ) ভাববাদীয় যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি (Idealistic Rationalism)।[৪] আলোচনার শুরুতেই বলে রাখা উচিত যে দর্শনশাস্ত্রের উল্লিখিত বিষয় সম্পর্কে সচেতন মার্কসবাদীমাত্রেরই অবহিত থাকা উচিত; দর্শনালোচনা প্রবন্ধের লক্ষ্য নয়; অর্থনৈতিক ক্রিয়া নিয়ে সঠিক চিন্তাপদ্ধতি অনুসন্ধানের স্বার্থেই উল্লিখিত তিনটি ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক বিষয়বস্তুকে তাদের বিকাশের ইতিহাসে দেখা উচিত এবং উল্লিখিত দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ শ্রেণিবিভক্ত সমাজে একই সময় উদ্ভূত হয়নি।

আসা যাক সংক্ষেপ আলোচনায়–

১. *মন্ময় বা আধ্যাত্মীয় ভাববাদী চিন্তাপদ্ধতি*
(Subjective Idealism)

এ ধারার চিন্তানুযায়ী অর্থনীতি হলো 'সীমাবদ্ধ সম্পদ' ও 'অসীম চাহিদা' শর্তাধীনে মানুষের কার্যকলাপসম্পর্কিত বিজ্ঞান। আর সেই চাহিদা পূরণই উপরোক্ত কার্যকলাপের লক্ষ্য। অর্থাৎ অর্থনীতি হচ্ছে অর্থনৈতিক সত্তা বা কর্তার (Economic Subject) দ্বারা পণ্যসামগ্রী নির্বাচন বা বাছাইয়ের তত্ত্ব। আসলে সম্পদ সীমিত বা অসীম কি না তা নির্ভর করে সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার (Socio-economic formation) চরিত্রের ওপর। পুঁজিবাদী সমাজেও সম্পদ সীমাবদ্ধ নয়। তাই যদি না হবে, তাহলে অতি উৎপাদন কেন? কেনই বা অতি উৎপাদনজনিত অর্থনৈতিক সংকট? নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে অর্থনৈতিক চাহিদাও অসীম নয়, বরং তার সীমা নির্ধারিত। নির্ধারক– নির্দিষ্ট উৎপাদন পদ্ধতি (Mode of Production)।

মন্ময় ভাববাদী অর্থনীতি চিন্তা পদ্ধতির উৎসবিন্দু হলো উপরোল্লিখিত অর্থনৈতিক সত্তা বা কর্তা। নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পর্বে পারিপার্শ্বিক জগতে ঐ কর্তার ক্রিয়াকলাপ "সীমিত" এবং সে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ। মন্ময় ভাববাদীদের মতে, ঐ কর্তা যে সমাজব্যবস্থায় বাস করে তা (অর্থাৎ

[৪] অমার্কসীয় অর্থনীতি চিন্তার বিষয়বস্তুগত দিকটি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পেতে হলে পড়তে পারেন; আন্দ্রেই আনিকিন, "অর্থশাস্ত্র বিকাশের ধারা", (মস্কো, ১৯৮২); ড্যানিয়েল ফাসফেল্ড, "অর্থনীতিবিদের যুগ" (অনুবাদক: আবদুল্লাহ ফারুক), ঢাকা ১৯৮৪।

পুঁজিবাদ) প্রকৃতির চিরস্থায়ী দান; অথচ তত্ত্ব ও বাস্তব ইতিহাসানুযায়ী পুঁজিবাদ উত্তরণশীল এবং সমাজবিকাশের নির্দিষ্ট পর্বমাত্র। উল্লিখিত দৃষ্টিভঙ্গিতে কাল ও পাত্রভেদে "অর্থনৈতিক কর্তার" অবস্থার উল্লেখ নেই, সে অপরিবর্তিত এবং অনুমানগতভাবে (hypothetically) সে স্বাধীন ও সার্বভৌম।

২. *নব নিসর্গবাদীয় অভিজ্ঞাতাবাদী ও সন্দেহবাদী চিন্তাপদ্ধতি*
(Neo-positive Empiricism and Scepticism)

অভিজ্ঞতাবাদীদের আবির্ভাব হচ্ছে তখন, যখন পুঁজিবাদ তার বিকাশপথে সার্বজনীন সংঘাতযুগে (প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে) প্রবেশ করছে। নবনিসর্গবাদীয় অভিজ্ঞতাবাদী ও সন্দেহবাদীদের অর্থনীতি চিন্তায় (ক) অর্থনৈতিক নিয়ম বা সূত্রের অস্তিত্ব নেই; (খ) বিভিন্ন অর্থনৈতিক ক্রিয়াবলীর মাঝে বিদ্যমান পরিমাণগত (গুণগত নয়) সম্পর্ক নির্ধারণই মূল কথা। এই চিন্তাপদ্ধতি প্রথম ধারার চিন্তাপদ্ধতি থেকে যেমনি এক পা এগিয়েছে, তেমনি পিছিয়েছেও। এখানে উন্নত হয়েছে চিন্তার সরঞ্জামাদী (Tools and Apparatus)। কিন্তু এ ধারার প্রবক্তারা অর্থনৈতিক ক্রিয়ার অভ্যন্তরীণ গুণগত দিকসমূহ অবজ্ঞা করেছেন এবং বোঝাতে অক্ষম হয়েছেন যে, মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের মূলে আছে অবজেকটিভ সূত্রাবলী অর্থাৎ সেইসব সূত্র, যা জ্ঞেয় (অজ্ঞেয়বাদীরা অবশ্য সেটা বিশ্বাস করেন না); কিন্তু চেতনানির্ভর নয়।

৩. *ভাববাদী যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি*
(Idealistic Rationalism)

রাজনৈতিক অর্থনীতি (Political Economy) স্বাধীন বিজ্ঞান হিসেবে স্বীকৃতি প্রাপ্তির সময় থেকেই ভাববাদীয় যুক্তিবাদীদের অভ্যুদয়। অর্থাৎ পুঁজিবাদ যখন থেকে নির্ধারক উৎপাদন পদ্ধতিতে (Predominant Mode of Production) উত্তরণ করছে, তখনই উল্লিখিত চিন্তার বাহকেরা দৃশ্যপটে আসছেন। এঁদের খ্যাতিমান প্রতিনিধি হলেন ডেভিড রিকার্ডো, অ্যাডাম স্মিথ, ফ্রঁসোয়া কেনে্ প্রমুখ।

অর্থশাস্ত্র চিন্তার ইতিহাসে ভাববাদীয় যুক্তিবাদীরাই প্রথম অর্থনীতিবিষয়ক চিন্তার ক্ষেত্রকে প্রচলন ও সঞ্চলন (Circulation) থেকে তুলে এনে উৎপাদনের ক্ষেত্রে (Sphere of Production) নিয়োজিত করেন। তাদের চিন্তাভাবনার ক্ষেত্র হিসেবে আবির্ভূত হয়– (সামাজিক শ্রেণিসমূহ) ভূমিমালিক, শ্রমিক ও পুঁজিপতি এবং রাজস্ব, মজুরি ও মুনাফা-উদ্ভূত প্রত্যয়সমূহ এবং অর্থনৈতিক বিকাশের অন্তর্নিহিত সূত্র (Inherent Laws)। আর তাই অর্থনীতি চিন্তার ইতিহাসে ভাববাদীয়যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি– চিরায়ত (Classical)। সাথে সাথে ভাববাদীয়যুক্তিবাদীরা যেহেতু পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উত্তরণকে অস্বীকার করেছেন, সেহেতু তারা নিঃসন্দেহে বুর্জোয়া চিন্তার বাহক।

৪. *ভাববাদী অর্থনীতি চিন্তা ও শ্রেণিস্বার্থ*

ভাববাদী অর্থনীতি চিন্তা কোনো শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করে কি না? কোন শ্রেণির? নাকি অর্থনীতি চিন্তা শ্রেণিনিরপেক্ষ, শ্রেণির ঊর্ধ্বে? নাকি আজকের দ্রুত পরিবর্তনশীল জগতে ভাববাদীরা যা বলছেন "বিজ্ঞানে মতাদর্শ নেই, নেই মতাদর্শের লড়াই, বিজ্ঞান বিজ্ঞানই" (De-ideologization of Science)— সেটা ঠিক?

অর্থনীতি চিন্তার ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অর্থনৈতিক জগতে ভাববাদী অর্থনীতি চিন্তা প্রধানত তিনটি দায়িত্ব পালন করে: (১) উদ্দেশ্যগত দায়িত্ব– অর্থাৎ প্রমাণ করতে হবে যে, পুঁজিবাদ প্রগতিশীল ও চিরন্তন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা; (২) অভিজ্ঞতাগত দায়িত্ব– অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ক্রিয়া বিশ্লেষণ করা ও উদ্দেশ্যগত লক্ষ্যে পৌঁছানো; (৩) প্রায়োগিক দায়িত্ব– পুঁজিবাদের জন্য সুপারিশমূলক প্রশংসাপত্র প্রণয়ন করা।

উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ আবার একে অপরের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কারণ, তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করলে পুঁজিবাদের বস্তুনিষ্ঠ (objective) সূত্রগুলো নির্ণয় করতে হবে, অথচ প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি সেটা নাকচ করে দেয়; কারণ, বস্তুনিষ্ঠ সূত্র মেনে নেওয়ার অর্থ পুঁজিবাদের ধ্বংসকে অবশ্যম্ভাবী বলে স্বীকৃতি দেওয়া। সুতরাং ভাববাদী অর্থনীতি চিন্তাবিদদের দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে কলুষিত। ভাববাদী অর্থনীতি চিন্তাকে যদি তার দৃষ্টিভঙ্গি পালন থেকে বিশ্লেষণ করা যায়; তাহলে সহজেই অনুমেয় যে, কয়েকটি অত্যন্ত সরল ও মৌলিক সত্যকে তারা স্বীকার করেন না। সেগুলো হলো:

(১) সমাজের বিকাশ প্রাকৃতিক-ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ামাত্র; (২) এই প্রক্রিয়া যে নিয়মের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত সেটা ব্যক্তির ইচ্ছা, চেতনা ও বুদ্ধিনিরপেক্ষই শুধু নয়, বরং তা সেই ইচ্ছা, চেতনা ও বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণকারীও বটে এবং (৩) সমাজবিকাশের প্রধান মৌল বৈষয়িক বিধান হচ্ছে উৎপাদনব্যবস্থার বিকাশ (পরে ২ ও ৪ নম্বর ছকে বিষয়টির মৌলাদির সহসম্পর্ক দেখানো হয়েছে।)

ভাববাদী অর্থনীতি চিন্তায় শ্রেণিস্বার্থ রক্ষার সবচেয়ে উর্বর ক্ষেত্র হলো "আয় বণ্টনের" প্রশ্ন। ফরাসী অর্থনীতিবিদ জ্যাঁ বাতিস্ত সেঁ'ই-এর ত্রি-ঐক্য (১৮০৩ সাল) সর্বজনবিদিত। (ত্রি-ঐক্য সূত্রানুযায়ী) উৎপাদনের উপাদানসমূহ ও আয়ের উৎসগুলো হচ্ছে– শ্রম, পুঁজি, ভূমি। মজুরি, মুনাফা ও রাজস্ব যথাক্রমে শ্রম, পুঁজি ও ভূমিমালিকের পারিতোষিক। সেঁ'ই-এর মতে, উৎপাদনের উপকরণসমূহ মূল্য উৎপাদনে স্বাধীন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, আর তাই প্রত্যেকে নিজস্ব অংশের ফলভোগের অধিকার রাখে। সুতরাং পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমশক্তি শোষণের অবকাশ নেই।

পরবর্তীকালে আমেরিকার অর্থনীতিবিদ জন বেইটস ক্লার্ক (১৮৮৬ সালে) আয় বণ্টনের প্রাকৃতিক নিয়ম নিরূপণ করে বললেন, উৎপাদনের প্রত্যেক এজেন্ট বা বাহককে (অর্থাৎ শ্রমিক, পুঁজিপতি ও ভূমির মালিককে) উৎপন্ন পণ্যের নির্দিষ্ট ভাগ এবং প্রত্যেককে অনুরূপ পারিতোষিক প্রদান– এটাই হচ্ছে বণ্টনের প্রাকৃতিক নিয়ম। ক্লার্কের মতে, শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধির মূলে আছে প্রযুক্তির উন্নতি ও পুঁজি সঞ্চয়নের বৃদ্ধি। আর তাই শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে তাঁর পরামর্শ হলো "মিতব্যয়ী হও, উৎপাদন ও পুঁজি বৃদ্ধির প্রতি মনোযোগী হও"। আসলে পুঁজিবাদী অর্থনীতিপ্রক্রিয়ার অন্তর্নিহিত সত্য উদ্‌ঘাটনে আগ্রহী ব্যক্তিমাত্রেই অবগত যে প্রযুক্তির উন্নতি ও পুঁজি সঞ্চয় দুটোরই মূলে আছে শ্রমিকের উদ্বৃত্ত শ্রম (৫ নম্বর ছক দেখুন)।

উদ্বৃত্ত শ্রমের ফসল উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করেন উৎপাদনের উপায়ের মালিক– পুঁজিপতি। আজ থেকে শতাধিক বছর আগেই মার্কস প্রমাণ করেছেন যে, পুঁজিবাদে পুঁজি সঞ্চয়নের সূত্রানুযায়ী যা অবশ্যই ঘটবে তা হলো– একদিকে পুঞ্জীভূত হবে সম্পদ; আর অন্যদিকে দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও উদ্বৃত্ত জনসমষ্টি (পরে প্রবন্ধের 'খ' অংশে এ সম্পর্কে বাস্তব তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ পরিবেশিত হয়েছে)। সুতরাং প্রকৃতবিচারে অর্থনৈতিক শোষণ ব্যতিরেকে পুঁজিবাদী সমাজের কারিগরি, প্রযুক্তিগত উন্নতি ও পুঁজি সঞ্চয়নের বৃদ্ধি ঘটে না। সুতরাং প্রকারান্তরে ক্লার্ক সাহেবই তো স্বীকার করে নিচ্ছেন যে, শ্রমিক শোষণ না করলে তার মজুরিও বৃদ্ধি পায় না (অবশ্য

সেটা তিনি কোথাও স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করছেন না)। যা বলছেন তা হলো– আয় বণ্টনে শোষণের স্থান নেই। সুতরাং পুঁজিবাদ শ্রেণিসম্প্রীতি বজায় রাখছে; পুঁজিবাদে শ্রেণিসংগ্রামের অর্থনৈতিক ভিত্তি অনুপস্থিত।

পুঁজিবাদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব প্রকট থেকে প্রকটতর হওয়ার সাথে সাথে অর্থনীতিবিষয়ক চিন্তাভাবনাও রূপ পরিবর্তন করছে। উৎপাদনের উপাদানতত্ত্বে ফরাস্টে (ফ্রান্স, ১৯৫০) "পুঁজির" পরিবর্তে সংযোজন করছেন "কারিগরি প্রগতি", সুলজ্ (আমেরিকা, ১৯৬১) সংযোজন করছেন মনুষ্যপুঁজি, গলব্রেথ (আমেরিকা, ১৯৬৭) সংযোজন করছেন "দক্ষ ও শিক্ষিত ক্যাডার", মুরাট (ফ্রান্স, ১৯৬৮) সংযোজন করছেন "প্রশাসনব্যবস্থা"। উল্লেখ্য, এসব নবসংযোজনে প্রত্যয় প্রয়োগের ক্ষেত্রে নতুনত্ব থাকলেও পদ্ধতিতত্ত্ব (Methodology) ও উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে নতুন কোনো সংযোজন এখানে অনুপস্থিত। পুঁজির স্বার্থে শ্রেণিসম্প্রীতি প্রমাণের উদ্দেশ্যে নতুন পরিস্থিতিতে প্রমাণ করতে হচ্ছে সেসব 'প্রাকৃতিক নিয়মসমূহকে' যেগুলো সেঁই, ক্লার্ক শতাধিক বছর আগেই আবিষ্কার করেছেন। উল্লিখিত চিন্তাভাবনার মূল উদ্দেশ্য– পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে চিরন্তন ব্যবস্থা হিসাবে ঘোষণা করা এবং সেইসাথে উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব ও পণ্যে নিহিত শ্রমের দ্বৈত বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করা।

বুর্জোয়া অর্থনীতিতে 'দুই মার্কস' বলতে যাঁদের বোঝানো হয়ে থাকে তাঁরা হলেন কার্ল মার্কস ও জন মেইনার্ড কেইনস্। অমার্কসীয় অর্থনীতি চিন্তায় কেইনস্কে আধুনিক যুগের মার্কসবাদী হিসেবেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। সম্ভবত মার্কসীয় অর্থনীতি চিন্তার সত্যতা, জনপ্রিয়তা ও বিশ্ববিপ্লবী-প্রক্রিয়ার দ্রুত বিকাশের কারণেই এই তুলনা। আসলে "মার্কস ও কেইনস্ অভিন্ন"– উক্তিটি অবৈজ্ঞানিক ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। কারণ কার্ল মার্কস ও লর্ড কেইনসের অর্থনীতি চিন্তা সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। মার্কসের অর্থনীতি চিন্তার দার্শনিক ভিত্তি দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, আর কেইনসের ভাববাদ। মার্কসের অর্থনীতি চিন্তা শ্রমিকশ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করে, আর কেইনসের অর্থনীতি চিন্তা স্বার্থ রক্ষা করে পুঁজিপতি শ্রেণির। মার্কস প্রমাণ করেছেন পুঁজিবাদের উত্তরণধর্ম ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার আগমন-অনিবার্যতা; আর কেইনস্ আবিষ্কার করেছেন বিনিয়োগের সামাজিকীকরণ (Socialization of Investment)। মার্কস দিচ্ছেন অর্থনৈতিক সংকটের তত্ত্ব, আর কেইনস্ কার্যকর চাহিদার অপ্রতুলতা তত্ত্ব (Insufficiency of Effective Demand)। মার্কস প্রমাণ করেছেন– মুনাফার হার হ্রাসের ঝোঁক, আর সেক্ষেত্রে কেইনস্ পুঁজির প্রান্তিক ফলপ্রদতা হ্রাস। সুতরাং অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, অর্থনীতি চিন্তার ক্ষেত্রে মার্কস ও কেইনস্– সম্পূর্ণ

বিপরীত গোলার্ধে অবস্থানরত চিন্তাবিদ। আমার মতে, কেইনসকে মার্কসের সমতুল্য করা অথবা উভয়ের মাঝে অভিন্নতা অনুসন্ধানের অর্থ হলো, একদিকে মার্কসকে অর্থনীতিবিদ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হওয়া, অন্যদিকে মার্কসের অর্থনীতি চিন্তাকে তাঁর মূল সত্তা, অর্থাৎ বিপ্লবী সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করার অপচেষ্টা।[৫]

মার্কস প্রমাণ করেছেন– পুঁজিবাদী অর্থনীতির ধ্বংসের বীজ পুঁজিবাদই সৃষ্টি করেছে। মার্কসের মতে, শ্রম ও শ্রমসৃষ্ট পুঁজির আপোসহীন দ্বন্দ্বের শেষ পরিণতিই পুঁজিবাদের ধ্বংস। উৎপাদনের উপায়ের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার সারসত্তা বিশ্লেষণ করেই তিনি এই ধ্বংসের বীজ উদ্‌ঘাটন করেছেন। আর তাই মতাদর্শগত দিক থেকে তিনি অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় বিবৃত করেছেন, "...কমিউনিস্টদের তত্ত্বকে এক কথায় প্রকাশ করে বলা চলে যে, তাদের তত্ত্ব হচ্ছে ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ। সংক্ষেপে বলা যায়, কমিউনিস্টরা সর্বত্রই বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিটি বিপ্লবী আন্দোলনকে সমর্থন করে। এসব আন্দোলনেই তারা প্রত্যেকটির প্রধান হিসেবে সামনে এনে ধরে মালিকানার প্রশ্ন, তার বিকাশের মাত্রা তখন যা-ই থাক না কেন।"[৬] আর কেইনস্? তাঁরই ভাষায়, "আমার শেষ লক্ষ্য হচ্ছে– স্বীয় অর্থনৈতিক পদ্ধতির গণ্ডির মাঝে সেই ধরনের সম্ভাব্য পরিবর্তনশীল রাশিগুলোকে খুঁজে বের করা, যেগুলোকে সচেতনভাবে নিয়ন্ত্রণ অথবা কেন্দ্রের পক্ষে পরিচালিত করা সম্ভব।"[৭] মহাসংকটের যুগে পুঁজিবাদের সবচেয়ে জটিল সমস্যা বেকার সমস্যা সমাধানকল্পে কেইনস্ খুঁজে পেলেন পরিবর্তনশীল রাশিগুলোকে। বললেন, কর্মসংস্থানের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য মজুরির হ্রাস প্রয়োজন। আর প্রকৃত মজুরি কমাতে হলে হয় নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রের দাম বাড়াতে হবে অথবা নমিনাল বা অর্থমজুরি কমাতে হবে। কেইনস্ অবশ্য নমিনাল মজুরি কমানোর বিপক্ষে। কারণ, অন্যথায় শ্রমিক ধর্মঘট চরম রূপ নিতে পারে। সুতরাং শ্রেণিস্বার্থ রক্ষার দৃষ্টিতে কেইনস্ ও মার্কসের অর্থনীতি চিন্তা সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। এ প্রসঙ্গে কেইনস্‌ের সক্রিয় সমর্থক ওয়ালরাস-এর মূল্যায়ন উল্লেখ্য–"কেইনস্ মার্কসবাদের কবল থেকে পুঁজিবাদকে রক্ষা করেছেন।... তিনি বংশপরম্পরায় বুদ্ধিশালীদের কম্যুনিস্টে রূপান্তর থেকে

---

[৫] বুর্জোয়া অর্থনীতি চিন্তার ইতিহাসে দীর্ঘকাল মার্কস ছিলেন "অশিক্ষিত ব্যক্তি"। শুধু চল্লিশের দশকে সুমপিটার "১০ জন মহান অর্থনীতিবিদ" পুস্তকে স্বীকার করলেন "মার্কস ছিলেন জ্ঞানী মানুষ" (দেখুন, Schumpeter, *Ten Great Economists*)।

[৬] মার্কস-এঙ্গেলস, "কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার", (মস্কো, ১৯৭৭), পৃ. ৪৮, ৭১।

[৭] J. M. Keynes, *General Theory of Employment, Interest and Money* (London), পৃ. ২২০।

উদ্ধার করেছেন।"[৮] এমতাবস্থায় রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের প্রধান বুর্জোয়া তাত্ত্বিক জন মেইনার্ড কেইনস্-এর অর্থনীতি চিন্তা সমাজের কোন শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করেছে এবং কী ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছে— এ ব্যাপারে তর্কের বিশেষ অবকাশ নেই।

সমাজের অর্থনৈতিক বাস্তবতার ওপর রচিত, পুঁজির স্বার্থবহনকারী নাটকীয় তত্ত্বের বহুলতা আমাদের অজানা নয়। এসব তত্ত্বের মধ্যে বহুলপ্রচলিত ও জনপ্রিয় হলো "পুঁজির গণতন্ত্রীকরণের তত্ত্ব" (Democratization of Capital), "পুঁজিবাদের রূপান্তরের তত্ত্ব" (Transformation of Capitalism), "মিশ্র অর্থনীতি তত্ত্ব" (Mixed Economy)। তত্ত্বের চুলচেরা বিশ্লেষণ এ প্রবন্ধের লক্ষ্য নয়। যতটুকু আলোচিত হওয়া উচিত তা হলো– বাস্তব বিকাশের নিরিখে পরিষ্কারভাবে দেখা যে, তত্ত্বগুলো কোন শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করছে। "পুঁজির গণতন্ত্রীকরণের তত্ত্ব" ঘোষণা করে যে, আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজে উৎপাদনের উপায়গুলোর ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা অনুপস্থিত। মালিকানা এখন যৌথকৃত বা সমবায়ীকৃত। অতএব সমাজের সব সদস্যই মালিকে রূপান্তরিত হয়েছেন। আর এটাই নাকি পুঁজিবাদ বিকাশের অমোঘ নিয়ম। আসলে এ যুক্তি এমন 'ট্রাম্প কার্ড', যার সাহায্যে একই সাথে পুঁজিবাদে শ্রেণিসংগ্রামের অবশ্যম্ভাবিকতাকে অস্বীকার করা যায় এবং সেই সাথে সমাজতন্ত্রের আবশ্যকতাকেও বিকাশের নিয়মের বাইরে রাখা যায়। "মিশ্র অর্থনীতির তত্ত্ব" হলো আধুনিক সংস্কারবাদীদের অর্থনীতি চিন্তা-উদ্ভূত ও তাদের মতাদর্শের ভিত্তি। তাদের মতে, ভবিষ্যতে যে সমাজ পুঁজিবাদের স্থান দখল করবে, সেখানে উৎপাদনের উপায়সমূহের ওপর রাষ্ট্রীয়, সমবায়ীকৃত ও ব্যক্তিগত মালিকানা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করবে। উল্লেখ্য, ব্যক্তিগত মালিকানা দৃঢ় করার প্রতিজ্ঞা ছাড়া সর্বহারা, খুদে ও প্রান্তিক কৃষকদের ভাগ্য নিয়ে কোনো প্রতিজ্ঞা মিশ্র অর্থনীতিতে নেই। মিশ্র অর্থনীতিতে সমাজতন্ত্র ও খুদে পণ্য-উৎপাদন ব্যবস্থা সহাবস্থান করবে। অথচ আমরা জানি যে, খুদে পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থা হলো সেই ব্যবস্থা, যেখান থেকে পুঁজিবাদ প্রতিনিয়ত জন্মগ্রহণ করছে, যেটা পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি। মিশ্র অর্থনীতিতে নেই মালিক কৃষিজীবী (জমিদার, জোতদার) ও মেহনতি কৃষকের মাঝের পার্থক্য। সুতরাং সামগ্রিকভাবে মিশ্র অর্থনীতির চিন্তা পুঁজির সেবায় শামিল।

"পুঁজিবাদের রূপান্তরতত্ত্বের" মাঝে বহুলপ্রচলিত ও প্রচারিত হচ্ছে "জনগণের পুঁজিবাদ" (People's Capitalism), "সার্বজনীন কল্যাণ রাষ্ট্র" (Welfare State),

[৮] M. Walras, *Keynes-Reexamined: The Man, The Theory (New York, 1958)*।

"বিপরীতধর্মী দুই সমাজব্যবস্থার একই বিন্দুতে মিলন"-এর (Convergency) তত্ত্বসমূহ।

"জনগণের পুঁজিবাদ" তত্ত্বের বাহক অর্থনীতিবিদেরা আজকের পুঁজিবাদ যে মার্কসের আমলের দুর্বিসহ পুঁজিবাদ নয়, তা গণ-স্বার্থরক্ষাকারী পুঁজিবাদে রূপান্তরিত হয়ে গেছে, সেটা প্রমাণের জন্য মূলত তিনটি কাল্পনিক বিপ্লবের আশ্রয় নিয়ে থাকেন; যেগুলো হলো– (১) মালিকানার ক্ষেত্রে বিপ্লব (২) প্রশাসন বা অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বিপ্লব, (৩) আয়ের ক্ষেত্রে বিপ্লব।

উৎপাদনের উপায়সমূহের ওপর মালিকানার প্রশ্নে বিপ্লব প্রমাণের জন্য 'শেয়ারের' বহুলতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ১৯৭৬-১৯৮০ সময়কালে যুক্তরাষ্ট্রে জনগণের ৩৫ শতাংশই ছিল শেয়ারমালিক। সাথে সাথে এটাও সত্য যে, ঐ সময় ৮৬ শতাংশ শেয়ারপুঁজি ছিল জনসংখ্যার মাত্র ১ শতাংশের মালিকানাধীনে। অন্য এক হিসাব অনুযায়ী, যদি ১০ মিলিয়ন ডলার ও তার ঊর্ধ্বের শেয়ারপরিবারকে আমেরিকার ধনী পরিবার আখ্যায়িত করা যায়, তাহলে ১৯৬৮ সালে তাদের সংখ্যা ছিল ২০২৪টি পরিবার এবং তাদের মোট শেয়ারপুঁজির পরিমাণ ১১১.৩ বিলিয়ন ডলার। সেসব পরিবার, যাদের গড় শেয়ারপুঁজির পরিমাণ ১০০ মিলিয়ন ডলার ও তদূর্ধ্বে, তারা হলো মোট পরিবারের ১০ শতাংশ, অথচ তাদের মালিকানায় ৫৩ শতাংশ শেয়ারপুঁজি।[৯] অন্যদিকে খুদে শেয়ারমালিকেরা "প্রতীক মালিকমাত্র" (Symbol of Proprietorship) অর্থাৎ প্রতিনিধিত্বকারী শেয়ারের প্রকৃত মালিক তারা নয়।[১০] আসলে মাঝারি ও ক্ষুদ্র শেয়ারমালিকদের কাছে শেয়ার বিলির ফলে জয়েন্ট স্টক কোম্পানি নিয়ন্ত্রণে ফিন্যান্স-পুঁজির মালিকদের কোনো অসুবিধাই হয় না, বরং এটি তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে সহায়তাই করে। এটাই হচ্ছে মালিকানার জগতে বিপ্লবের প্রকৃত রূপ।

'প্রশাসনের ক্ষেত্রে বিপ্লব' বলতে বোঝানো হয় যে, আধুনিককালে "উন্নত পুঁজিবাদী দেশসমূহে" অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পুঁজিপতির হাত থেকে এসেছে মজুরি ম্যানেজারের হাতে। বলা হয়ে থাকে, বেতনভুক্ত ম্যানেজার বেতনভুক্ত শ্রমিকদের

---

[৯] *International Economics and International Relations,* (Moscow, 1968), No. 3, পৃ. ৫২-৬৩ (রুশ ভাষায়)।

[১০] *R. Ells, The Govt. of Corporation,* (New York, 1962), পৃ. ২৫৯; F Lundberg, *The Rich and Super-Rich, A Study in the power of Money Today,* (New York, 1968), পৃ. ২৪৯।

স্বার্থ রক্ষা করে এবং তাদের কল্যাণেই নিয়োজিত। অর্থাৎ পুঁজিবাদের বদলে এসেছে ম্যানেজারবাদ। বস্তুত মালিকানার চরিত্রই পরিচালনা বা প্রশাসনের চরিত্রের নির্ধারক, উল্টোটা নয়। পুঁজিবাদ পরিচালনা করে বলেই পুঁজিবাদ নয়, বরং পুঁজিবাদ বলেই পরিচালনা করে। আসলে ধনিকচক্রের প্রাধান্য ও তাদের মুনাফা বৃদ্ধিকে প্রচ্ছন্ন রাখাটাই "ম্যানেজেরিয়াল বিপ্লবের" প্রধান লক্ষ্য।

"আয়ের ক্ষেত্রে বিপ্লব" বলতে যা বোঝানো হচ্ছে তা হলো, বৈজ্ঞানিক-কারিগরি প্রগতির যুগে পশ্চিমা সমাজ আয়ের ক্ষেত্রে সমতা আনয়নের মাধ্যমে একটা মধ্যশ্রেণিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। বুর্জোয়া পরিসংখ্যান-তথ্যের পদ্ধতিগত মারপ্যাঁচের কথা অথবা পুঁজিপতির প্রকৃত আয় ও প্রকৃত মুনাফার পদ্ধতিগত মারপ্যাঁচের কথা (পুঁজিপতির প্রকৃত মুনাফার হিসাব কখনো পাবেন না)– বাদ দিয়েও সহজে যা বোধগম্য তা হলো: ১৯১০ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের জনসমষ্টির সবচেয়ে উচু গ্রুপের আয় অর্থাৎ ৩০ শতাংশের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৬০-৭০ শতাংশ, অন্যদিকে সবচেয়ে নিচু গ্রুপের অর্থাৎ জনসংখ্যার ৩০ শতাংশের আয় হ্রাস পেয়েছে ১৫-২০ শতাংশ। ১৯৬০ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে দ্বিতীয় ও দশম গ্রুপের (যুক্তরাষ্ট্রের আয় পরিসংখ্যানে পরিবারের ১০টি শ্রেণিবিভক্তি বিদ্যমান) আয়ের ব্যবধান বৃদ্ধি পেয়েছে ৯,৫৯০ থেকে ১,১৭,৯৮০ ডলার পর্যন্ত।[১১] ১৯৭০ সালে যখন ১০ হাজার ডলার পর্যন্ত আয় করত ১৪ শতাংশ পরিবার এবং ৫০ হাজার ডলার ও তার বেশি আয় করত ৯ শতাংশ পরিবার, তখন ১৯৮২ সালে উল্লিখিত দুই গ্রুপের অধীন ছিল যথাক্রমে ১৬.৬ শতাংশ ও ১০.৯ শতাংশ পরিবার। ফলশ্রুতিতে ১৯৭০ সালে যখন জনসংখ্যার ১২ শতাংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করত, তখন ১৯৮২ সালে তাদের আপেক্ষিক ভর হলো ১৫ শতাংশ (যথাক্রমে মোট ২৫.৪ মিলিয়ন ও ৩৪.৪ মিলিয়ন)।[১২] উল্লেখ্য, পুঁজিবাদে উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে এটা সত্য। তবে উচ্চহারে প্রবৃদ্ধি থেকে কে উপকৃত হচ্ছে? অবশ্যই বৃহৎ পুঁজি। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৭৯-৮০ সালে অস্ট্রিয়ায় যখন মেহনতি শ্রমিক ও কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি পেয়েছে ১৪ শতাংশ, তখন শিল্পমালিকদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৫ শতাংশ। ১৯৮০ সালে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ছিল ৩.৬ শতাংশ, আর মেহনতি মানুষের প্রকৃত মজুরি হ্রাস পেয়েছে ০.৫ শতাংশ।[১৩] এমতাবস্থায় পশ্চিমা সমাজের একক মধ্য সমাজে রূপান্তর ধারণাটি উদ্ভট কল্পনা নয় কি? আসলে অবাধ বাজারব্যবস্থার আওতাধীনে

---

[১১] *Statistical Abstract of the United States, (1972).* পৃ. ৩২৪।

[১২] *Statistical Abstract of the United States, 1984,* পৃ. ৪৪৪, ৪৬৪, ৪৭১, ৯৮৪।

[১৩] *Problems of Peace and Socialism, 1982, No.1,* পৃ. ৬৬ (রুশ ভাষায়)।

উৎপাদন আগ্রহ বাড়াতে হলে মুনাফার ওপরই নির্ভর করতে হবে। মুনাফা বৃদ্ধিই এক্ষেত্রে অন্ধ সূত্র। এমতাবস্থায় পুঁজির মালিকের প্রকৃত আয় বৃদ্ধির হার মেহনতি শ্রমিকের প্রকৃত আয় বৃদ্ধির হারের অধিক হবে– এটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক। অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে শ্রমিকশ্রেণির আপেক্ষিক ও সামগ্রিক দারিদ্র্যও ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাবে (প্রবন্ধের 'ঘ' অংশের সব তথ্যই সেটা প্রমাণ করে)।

অমার্কসীয় অর্থনীতি চিন্তায় "প্রযুক্তিগত নির্ধারকতাবাদ" (Technological Determinism)-ভিত্তিক সর্বাধুনিক তত্ত্ব হলো, "বিপরীতধর্মী দুই সমাজব্যবস্থা একই বিন্দুতে মিলনের তত্ত্ব" (বা কনভারজেন্সি)। এই চিন্তানুসারে পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক উভয় উপাদানই বিদ্যমান। তবে তাদের ধারণা হলো এ রকম– বিকাশের সাধারণ নিয়মানুযায়ী পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র উভয়েই তাদের ঋণাত্মক গুণসমূহ বর্জন করছে এবং একে অন্যের ধনাত্মক গুণসমূহ গ্রহণ করছে। সুতরাং ফলাফলে ভবিষ্যতের সমাজ হবে– না পুঁজিবাদী না সমাজতান্ত্রিক সমাজ; ভবিষ্যতের সমাজ হবে উভয় সমাজব্যবস্থার ধনাত্মক গুণের সমাহার– "অপটিমাম সমাজ", "ইনটেগ্রাল সমাজ", "উচ্চমাত্রায় সংগঠিত কারিগরি উন্নত সমাজ"। অনুরূপ সমাজব্যবস্থার চেহারা সম্পর্কে হল্যান্ডের অর্থনীতিবিদ ইয়ান টিনবারজেন যা ভাবছেন (দেখানো হয়েছে ১ নম্বর ছকে) সেখান থেকে সুস্পষ্ট যে, কনভারজেন্সি তত্ত্বটা একটা অভিনব, কাল্পনিক জগাখিঁচুড়ি। একটু চিন্তা করলেই বোধগম্য হবে যে, মডেলটি অবাস্তব। কারণ ভবিষ্যৎ অর্থনীতির মূল উপাদানসমূহের সহাবস্থান অসঙ্গতিপূর্ণ। সমাজতন্ত্র পরিত্যাগ করছে তার অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে, অর্থাৎ উৎপাদনের উপায়ের ওপর সামাজিক মালিকানাকে। আর পুঁজিবাদ ব্যক্তিগত মালিকানার ওপর দাঁড়িয়ে অবাধ বাজারের অন্ধ নিয়মাধীনে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা রচনা করছে, সামাজিক সমতা ও শ্রমিকদের অধিকারের গ্যারান্টি দিচ্ছে– এটা অবাস্তব ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত চিন্তা এবং সেই সাথে অবৈজ্ঞানিক ও রাজনৈতিকভাবে ক্ষতিকর, প্রতিক্রিয়াশীল। কারণ এ তত্ত্ব সামাজিক বিপ্লবের সাধারণ মিত্রদের বিভ্রান্ত করছে। আমাদের বলছে– হে তৃতীয় বিশ্বের 'বন্ধুগণ', দুটি বিপরীতধর্মী সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যখন একই বিন্দুতে মিলতে যাচ্ছে, তখন তোমাদের বিকাশের জন্য পথ নির্ধারণের লড়াইটা অযথা সময় নষ্ট নয় কি?

ছক ১: কনভারজেন্সির প্রধান উপাদানসমূহ

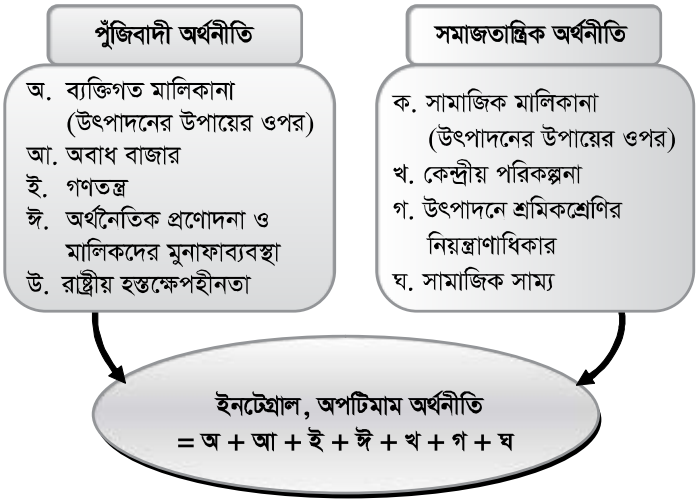

কনভারজেন্সি তত্ত্বের অন্যতম প্রবক্তা হলেন আমেরিকার নন্দিত অধ্যাপক, প্রযুক্তিবাদী উদারপন্থী অর্থনীতিবিদ জন কেনেথ গলব্রেথ। গলব্রেথের যুক্তি হলো নিম্নরূপ:[১৪] "যেহেতু সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আমেরিকা একই শিল্পসমাজের বিভিন্ন রূপ, সুতরাং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তির প্রগতি উভয় সমাজেই অনুরূপ প্রতিফল ও অর্থনৈতিক বিকাশ সৃষ্টি করে।" উভয় সমাজেই অর্থনৈতিক পরিকল্পনা উপস্থিত; পুঁজিবাদের বৃহৎ কর্পোরেশন ও সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার আধুনিক প্রশাসন একইধরনের চাহিদা পূরণের বিভিন্ন পদ্ধতিমাত্র (পৃ. ৩৩), সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী দেশে "উৎপাদন ও ব্যবসায় সংগঠনের ক্ষেত্রে মিল লক্ষণীয়" (পৃ. ৩৮৯); লক্ষণীয় উৎপাদন এককের সার্বভৌমত্ব (পৃ. ১০৪); সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিত্তি হলো প্রযুক্তিগত ও সাংগঠনিক মৌলসমূহ, সেখানে মতাদর্শগত ফর্মুলার কোনো মূল্য নেই (পৃ. ৭)। উল্লেখ্য, কনভারজেন্সি তত্ত্ব বিশেষভাবে বিকশিত ও বহুলপ্রচারিত হচ্ছে যখন পুঁজিবাদের সাথে প্রতিযোগিতায় সমাজতন্ত্র তার বিকাশশক্তি সুপ্রমাণিত করেছে, যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন পৃথিবীতে দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্পশক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে এবং সমাজতন্ত্রের পুঁজিবাদে ফিরে আসার সব তত্ত্বই

[১৪] J.K. Galbraith, *The New Industrial State,* (Boston, 1967)। পরবর্তীকালে গলব্রেথ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্থনৈতিক সংস্কারের মাধ্যমে "নতুন সমাজতন্ত্রে" উত্তরণের কথা বলেছেন (দেখুন, *Economics and the Public Purpsoe, Boston, 1973,* পৃ. ২১১, ২২২, ২৭৩)।

ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। "প্রযুক্তিগত কনভারজেন্সি" (Technological Convergency) তত্ত্ব প্রমাণের জন্য বুর্জোয়া সমাজবিজ্ঞানীদের প্রয়োজন ছিল আনুষঙ্গিক আরো কিছু তত্ত্ব খাড়া করার। আর সেগুলো হলো: মনোপলি, মনোপলি মুনাফা, লগ্নিপুঁজির অস্তিত্বহীনতা এবং তাদের "বৃহৎ প্রযুক্তিগত একক", "প্রযুক্তিগত কাঠামো"তে (Technological Structure) রূপান্তর এবং সেইসাথে পুঁজির লক্ষ্য রূপান্তরিত হয়েছে সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যে। শুধু তা-ই নয়, কনভারজেন্সির গলব্রেথীয় তত্ত্বকে সংযুক্ত করা হয়েছে মতাদর্শনিরপেক্ষ তত্ত্বের (Theory of de-ideologization) সাথে, যার মূল উদ্দেশ্য হলো প্রমাণ করা যে, বিপরীতধর্মী সমাজব্যবস্থার মধ্যে কোনো মতাদর্শগত, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিরোধ নেই; সুতরাং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতারও যুক্তি নেই। সেই সাথে ষাটের দশকে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ইদানীং চীনের অর্থনৈতিক সংস্কারসমূহকে কনভারজেন্সি তত্ত্বের বাহকেরা "সমাজতন্ত্রের বিকাশে পুঁজিবাদী উপাদানের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যম্ভাবী" হিসেবেও দেখানোর চেষ্টা করেছেন। সুতরাং কনভারজেন্সি তত্ত্বের যে নমুনা (variant)-ই বিশ্লেষণ করা হোক না কেন, তাদের শ্রেণিস্বার্থ রক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্যটা তর্কাতীত।

অন্যদের মতো গলব্রেথও পুঁজিবাদে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে প্রযুক্তিগত বিকাশের ফলশ্রুতি হিসেবে দেখছেন এবং সেক্ষেত্রে দুই বিপরীতধর্মী সমাজব্যবস্থার ভিত্তিগত পার্থক্যকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না। আসলে উৎপাদনের উপায়ের ওপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা ব্যতীত যে সমষ্টিক কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা রচনা সম্ভব নয়, আর ঐ পরিকল্পনা রচনা ও বাস্তবায়নে ব্যাপক মেহনতি মানুষের অংশগ্রহণের প্রশ্নই ওঠে না– সে সত্যটাকে গলব্রেথসহ অনুরূপ চিন্তার বাহকেরা অনুধাবনে সক্ষম হননি। প্রকৃতপক্ষে সারার্থের বিচারে পুঁজিবাদের আন্তফার্ম পরিকল্পনা অথবা রাষ্ট্রীয় প্রোগ্রামিং এবং সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। আসলে সামাজিক বিকাশে অর্থনীতি ও প্রযুক্তির আপেক্ষিক গুরুত্বের প্রশ্নে প্রথমটিকে "মতাদর্শগতভাবে নিরপেক্ষ" ও দ্বিতীয়টিকে "প্রধান বা নির্ধারক" হিসেবে ঘোষণা করা এবং বৈজ্ঞানিক-কারিগরি বিপ্লবের যুগে সেটা তর্কাতীতভাবে সত্য– এ বিবেচনা থেকেই গলব্রেথসহ কনভারজেন্সি তত্ত্বের অন্য বাহকেরা দুটি বিপরীতধর্মী সমাজব্যবস্থার গুণগত পার্থক্যসমূহ উদ্‌ঘাটনে অপারগ।[১৫]

---

[১৫] যেমন ফাসফেল্ডও মনে করেন যে, জেনারেল মটরস থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন পর্যন্ত পরিকল্পনা হলো সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার নমুনা (দেখুন, D. Fusfeld. *Economics,* Lexyngton. 1972, পৃ. ৫২২)। ডানিয়েল বেলও তাঁর "পোস্ট-ইন্ডাসট্রিয়াল' তত্ত্বে মতাদর্শের মৃত্যু ও একক

গ. মার্কসীয় অর্থনীতি চিন্তা

১. দার্শনিক ভিত্তি

মার্কসীয় দর্শনানুযায়ী মানুষের চিন্তাধারায় প্রকৃতির প্রতিফলন প্রাণহীন, কাল্পনিক, গতিহীন বা দ্বন্দ্বহীন নয়; বরং সে প্রতিফলন ঘটে গতির চিরন্তন পদ্ধতিতে, দ্বন্দ্বের উদ্ভব ও তার সমাধানে। অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ে মার্কসীয় চিন্তার ক্ষেত্রেও এটা সমভাবে প্রযোজ্য। শুধু বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণেই অর্থনৈতিক বাস্তবের সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব। অর্থনৈতিক ক্রিয়াবলীর মার্কসীয় বিশ্লেষণের ভিত্তিপ্রস্তর হলো– দ্বন্দ্বাত্মক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দর্শন।

মার্কসীয় অর্থনীতি চিন্তানুযায়ী অর্থনৈতিক ক্রিয়াবলী পরস্পরসম্পর্কিত নির্দিষ্ট সূত্রাধীনে বিকাশমান, তারা বস্তুনিষ্ঠ (ইচ্ছা বা চেতনানির্ভর নয়) এবং ক্রিয়ার অভ্যন্তরীণ অসঙ্গতিই তাদের বিকাশের প্রধান শর্ত। মার্কসীয় অর্থনীতি চিন্তায় ভাববাদী চিন্তার ন্যায় অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সারার্থ উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর সম্পর্ক দ্বারা নিরূপিত হয় না; নিরূপিত হয় নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক কাঠামোর গণ্ডিভুক্ত ক্রিয়ারত মানুষদের মাঝের সম্পর্কের মাধ্যমে।

মার্কসীয় অর্থনীতি চিন্তার কেন্দ্রীয় পদ্ধতি হলো ডায়ালেকটিক পদ্ধতি। মার্কসীয় ডায়ালেকটিক পদ্ধতি ভাববাদী পদ্ধতির তুলনায় মৌলিকভাবে ভিন্ন। মার্কসেরই ভাষায়, "আমার ডায়ালেকটিক পদ্ধতি ভিত্তির প্রশ্নে হেগেলীয় পদ্ধতি থেকে শুধু ভিন্নই নয়, বরং সরাসরি বিপরীত। হেগেলের কাছে মানবমস্তিষ্কের জীবনপ্রক্রিয়া, অর্থাৎ চিন্তনপ্রক্রিয়া, যাকে তিনি 'ভাব' নাম দিয়ে একটা স্বাধীন সত্তায় রূপান্তরিত করেছেন, সেটাই বাস্তব জগতের সৃষ্টিকর্তা এবং বাস্তবজগৎ হলো শুধু এই ভাবের বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ। অন্যপক্ষে, আমার কাছে ভাব হলো মানবমনে প্রতিবিম্বিত ও চিন্তার রূপে রূপায়িত বাস্তব জগৎ ছাড়া আর কিছুই নয়।"[১৬]

মার্কসীয় অর্থনীতি চিন্তার কেন্দ্রীয় পদ্ধতি হলো ডায়ালেকটিকসের নীতিসমূহ; অর্থনৈতিক ক্রিয়াসমূহের পরস্পরনির্ভরশীলতা এবং বিকাশের নীতি ও বিকাশ

মতাদর্শ হিসেবে ধর্মের পুনরাবির্ভাবের কথা উল্লেখ করেছেন (দেখুন : D. Bell. Cultural Contradictions of Capitalism, New York, 1976, পৃ. ১৭৬)। একইভাবে সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশে প্রাথমিক উপাদানকে দ্বিতীয় ও দ্বিতীয় স্তরের উপাদানকে প্রাথমিক হিসেবে বিবেচনার মাধ্যমে বেজেজিনস্কি ("টেকনট্রন সমাজের তত্ত্ব") ও টফলের ("সুপার-ইন্ডাসট্রিয়াল সমাজের তত্ত্ব") বিপরীতধর্মী দুই সমাজব্যবস্থার মিলনের তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন।

[১৬] কার্ল মার্কস, "পুঁজি", তৃতীয় রুশ সংস্করণ, (মস্কো, ১৯৭৮), খণ্ড ১, পৃ.২৯।

সূত্রসমূহ: (১) পরিমাণগত পরিবর্তনের গুণগত পরিবর্তনে উত্তরণ ও তার বিপরীতের নিয়ম (The law of transformation of quantity into quality and vice-versa) (২) বিপরীতের ঐক্য ও দ্বন্দ্বের নিয়ম (The law of the unity and struggle of opposites) (৩) নিরাকরণের নিরাকরণ সূত্র (The law of the negation of negation)।

অর্থনৈতিক ক্রিয়াসমূহের পরস্পরনির্ভরশীলতার নীতি অনুযায়ী অর্থনৈতিক ক্রিয়াসমূহকে বিচ্ছিন্নভাবে বা একে অপরের সাথে সম্পর্কহীনভাবে দেখা হয় না; বরং সেগুলোকে পরস্পরনির্ভরশীল এবং পরস্পর শর্তসাপেক্ষ হিসেবে দেখা হয়। উৎপাদন পদ্ধতিকে দেখা হয় উৎপাদনসম্পর্ক ও উৎপাদিকা শক্তির ঐক্যে। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে যাদের অসঙ্গতির ফলাফল হলো "সমাজের বৈষয়িক উৎপাদিকা শক্তি বিকাশের এক নির্দিষ্ট পর্যায়ে এলে তার সাথে সংঘর্ষ হয় প্রচলিত উৎপাদনসম্পর্কের, অর্থাৎ আইনানুগ ভাষায়– সংঘাত লাগে এতদিন যে সম্পত্তিসম্পর্কের মধ্যে থেকে উৎপাদিকা শক্তি সক্রিয় ছিল তারই সাথে, উৎপাদনসম্পর্ক উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের শর্ত থেকে রূপান্তরিত হয় প্রতিবন্ধকে। তারপর শুরু হয় সমাজবিপ্লবের যুগ।"[১৭] সুতরাং পুঁজিবাদী উৎপাদনসম্পর্ক যে বিশাল উৎপাদিকা শক্তির জন্ম দিয়েছে তার বিকাশের একপর্যায়ে আরো অধিকতর বিকাশের স্বার্থেই বিরাজমান উৎপাদনসম্পর্কের ধ্বংস অনিবার্য– বিকাশের সাধারণ সূত্রানুযায়ী এটা ঘটবেই।

মার্কসীয় অর্থনীতি চিন্তায় অর্থনৈতিক ক্রিয়া ও ঘটনাসমূহকে শুধু পরস্পর সম্পর্কিতই মনে করা হয় না, উপরন্তু ঐসব ক্রিয়া ও ঘটনাসমূহকে দেখা হয় তাদের উদ্ভবে, বিরামহীন বিকাশে ও ধ্বংসে। বিকাশ ঘটে সুনির্দিষ্ট বিকাশ ইতিহাসসহ। এ মর্মে এঙ্গেলসের উক্তি সুনির্দিষ্ট ও যথার্থ– প্রকৃতিবিজ্ঞান ব্যতীত সব বিজ্ঞানই হলো ইতিহাসগত বিজ্ঞান। চিন্তার মার্কসীয় ইতিহাসবাদী নীতি অনুযায়ী অর্থনৈতিক সম্পর্ক ধ্রুব বা স্থির নয়, তা গতিশীল। এ দৃষ্টি থেকে বলা যায়, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার কারণ অনুসন্ধান করতে হবে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও শ্রমবিভাগে আমাদের অবস্থানের গতিতে। এ দৃষ্টি থেকে অর্থনৈতিক নিয়মসমূহকে দেখার অর্থ অন্তত তিনটি বিষয় স্বীকার করে নেওয়া; (১) সাধারণ অর্থনৈতিক নিয়মসমূহ (general economic laws) বিভিন্ন সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিভিন্নভাবে ক্রিয়া করে এবং প্রতিফলিত হয় (২) প্রত্যেক সামাজিক-অর্থনৈতিক

[১৭] কার্ল মার্কস, "অর্থশাস্ত্র বিচার প্রসঙ্গে", (মস্কো, ১৯৮২), পৃ.১৩।

ব্যবস্থা সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক নিয়মসমূহের (specific economic laws) অধিকারী এবং (৩) ঐসব নিয়মসমূহ ধাপে ধাপে বিকাশমান। ব্যাপারটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ; কারণ উল্লিখিত নিয়মসমূহ উদ্‌ঘাটন করার অর্থই অর্থনৈতিক ঘটনাবলীর কারণ-পরিণাম সম্পর্ক উদ্‌ঘাটন করা।

ইতিহাসবিরোধী ও অধিবিদ্যক (মেটাফিজিক্যাল) চিন্তার বিপরীতে মার্কসীয় চিন্তার অর্থনীতিতে স্থির, অনড় ও চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট কিছু নেই। ভুল হবে যদি মনে করা হয় যে, মেটাফিজিশিয়ানরা তথা অধিবিদ্যকগণ বিকাশ উপলব্ধিতে অপারগ। বিকাশ বলতে তারা শুধু সাধারণ পরিমাণগত পরিবর্তন (হ্রাস অথবা বৃদ্ধি) বুঝে থাকেন। তাদের মতে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয় অসঙ্গতি ও উল্লম্ফন ছাড়াই। তারা স্বীকার করেন শুধু ক্রমবিবর্তন (evolution); অস্বীকার করেন গুণগত বৈপ্লবিক পরিবর্তন (revolutionary change)। এখান থেকেই উৎপত্তি হয়েছে "পুঁজিবাদে সংকটবিহীন আদর্শ বিকাশের সম্ভাবনার তত্ত্ব"সমূহ।

অর্থনৈতিক এককের পরিমাণগত পরিবর্তন হলো অর্থনৈতিক এককের বাহ্যিক রূপ। গুণগত পরিবর্তন বাহ্যিক রূপের সারসত্তা, আর তাই নির্ধারক শক্তি। নতুন গুণে উত্তরণ হওয়ার আগে অর্থনৈতিক ক্রিয়ার পরিমাণগুলো পুঞ্জীভূত হয়; তারপর ধীরে ধীরে অথবা উলম্ফনের সাহায্যে বিকাশ ঘটে। নতুন গুণ আবার উচ্চমাত্রায় পরিমাণগত বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রশস্ত করে। আর তাই শ্রেণিবিভক্ত অর্থনীতিব্যবস্থায় মৌলিক নতুন গুণে উত্তরণের প্রধান শর্ত হলো উৎপাদনের উপায়ের মালিকানাসমস্যা সমাধান করা। এমতাবস্থায় প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বাংলাদেশে আজ যখন (শ্রেণিসংগ্রামের স্তর যা-ই হোক না কেন) ভূমি সংস্কারের প্রশ্নে উৎপাদনসম্পর্ককে (মূলত মালিকানাসম্পর্ককে) উহ্য রাখা হচ্ছে, তখন মার্কসবাদীদের আদৌ বুঝতে কষ্ট হয় না যে, ভূমি সংস্কার (যদি হয়ও) কাদের স্বার্থে হতে চলেছে। এ মর্মে মার্কসীয় অর্থনীতি চিন্তায় সুস্পষ্ট যুক্তিসহকারে যা বলা হয় তা হলো "উৎপাদনের উপায়সমূহের ওপর সামাজিক মালিকানার আমলে, বুর্জোয়ার ওপর প্রলেতারিয়েতের জয়লাভের আমলে সুসভ্য সমবায়ীদের যে ব্যবস্থা — তা-ই হলো সমাজতন্ত্রের ব্যবস্থা।"[১৮]

মার্কসীয় অর্থনীতি চিন্তার অন্যতম পদ্ধতিগত অবদান হলো অর্থনৈতিক ক্রিয়া ও ঘটনাবলীর অভ্যন্তরীণ অসঙ্গতি অনুসন্ধান করা। অর্থনৈতিক ক্রিয়ার আছে ধনাত্মক

[১৮] ভ. ই লেনিন, "শ্রমিকশ্রেণি ও কৃষকদের জোট", (মস্কো, ১৯৭১), পৃ. ৩৯৬।

ও ঋণাত্মক দিকসমূহ, যার বর্তমান অবস্থা হচ্ছে অতীত ও ভবিষ্যতের সদ্যজন্মপ্রাপ্ত ও মুমূর্ষু, পুরাতন ও নতুন প্রভৃতি বিপরীতের সমষ্টিমাত্র। এই বিপরীতগুলোর দ্বন্দ্বই অর্থনৈতিক ক্রিয়ার বিকাশ পদ্ধতির অভ্যন্তরীণ আধেয়। উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদনসম্পর্কের (উৎপাদন পদ্ধতির দুটি দিক) ঐক্য হলো ঐতিহাসিক বিকাশের নির্দিষ্ট পর্যায়ে মূর্ত সামাজিক গঠন, যাদের দ্বন্দ্ব হলো উৎপাদন পদ্ধতি ও অর্থনৈতিক বিকাশের চালিকাশক্তি।

ডায়ালেকটিকসের নিরাকরণের নিরাকরণ সূত্রানুযায়ী (law of negation of negation) অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটে নিরবচ্ছিন্নভাবে, অপেক্ষাকৃত নীচু পর্যায় থেকে উচ্চতর পর্যায়ে, পুরাতন থেকে নতুনের দিকে, এক নিরাকরণ থেকে অপর নিরাকরণে ইত্যাদি। এখানে অর্থনৈতিক বিকাশের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নিরাকরণের মূল মুহূর্তগুলো হলো: (১) পুরাতন, মুমূর্ষু রূপের ধ্বংস (২) অতীত বিকাশের আধেয় থেকে জীবনীশক্তিসম্পন্ন মৌলসমূহ সংরক্ষণ (৩) উচ্চতর রূপের অভ্যুদয়। সুতরাং ভবিষ্যতের শোষণহীন, ক্ষুধাহীন বাংলাদেশে আজকের সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে তা নয়, বরং জীবনীশক্তিসম্পন্ন মৌলসমূহ (অতীতের) সংরক্ষিত হবে।

মার্কসীয় অর্থনীতি চিন্তায় ডায়ালেকটিকসের নীতি ও সূত্র ছাড়া আরো যেসব মাধ্যম ব্যবহৃত হয় তা হলো— দর্শনশাস্ত্রের দ্বৈত প্রত্যয়সমূহ (dual categories): সারসত্তা ও বহিঃপ্রকাশ (essence and appearance); আধার ও আধেয় (form and content); একক, বিশেষ, সাধারণ ও সর্বজনীন; কারণ ও পরিণাম; অনিবার্যতা ও আকস্মিকতা (neccessity and chance); সম্ভাবনা ও বাস্তবতা (possibility and reality); লক্ষ্য ও স্বাধীনতা; বিশেষতা ও সর্বজনীনতা ইত্যাদি। আর অর্থনৈতিক তথ্যসমূহের তাত্ত্বিক সাধারণীকরণ বা সরলীকরণের লক্ষ্যে যেসব পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে, সেগুলো হলো: বিমূর্ত থেকে মূর্তে আরোহণ পদ্ধতি (from abstract to concrete); বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ পদ্ধতি (analysis and synthesis); আরোহ ও অবরোহ (induction and deduction); তুলনামূলক পদ্ধতি; সাদৃশ্যতা (analogy); অনুসিদ্ধান্ত (hypothesis); যুক্তিগত ও ঐতিহাসিক পদ্ধতির ঐক্য (unity of logical and historical methods); সামাজিক বাস্তবতা (সামাজিক বাস্তবতাই সত্যের ভিত্তি ও সত্যের মানদণ্ড)।

উপরোক্ত পদ্ধতিসমূহের সাথে আরো যে একটি চিন্তা পদ্ধতি মার্কসীয় অর্থনীতিশাস্ত্রে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে সেটি হলো– সমালোচনা পদ্ধতি (method of

criticism)। এই পদ্ধতির ভিত্তি হলো দ্বন্দ্বাত্মক নিরাকরণ (dialectic negation)। সমালোচনার মার্কসীয় পদ্ধতিটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় নিম্নরূপ: "যতক্ষণ পর্যন্ত রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সাধারণ তত্ত্ব নিয়ে কথা চলছে, ততক্ষণ বুর্জোয়া প্রফেসরদের একজনকেও বিশ্বাস করা উচিত নয়; যদিও বাস্তব, সামাজিক গবেষণায় তাঁরা অত্যন্ত মূল্যবান রচনা উপহার দিতে সক্ষম। কারণ রাজনৈতিক অর্থনীতি তেমনই পার্টিবিজ্ঞান যেমন জ্ঞানতত্ত্ব (epistemology)। ...আর অন্যদিকে "মার্কসবাদীদের দায়িত্ব– ঐসব 'আজ্ঞাবাহীর' গবেষণালব্ধ ফলাফলকে আত্মস্থ করতে শেখা (ঐসব আজ্ঞাবাহীর ব্যবহার না করে আপনারা অর্থনীতিশাস্ত্রের নতুন প্রক্রিয়াসমূহ নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে এক পা-ও এগোতে পারবেন না)। আপনাদের শিখতে হবে তাদের প্রতিক্রিয়াশীল লক্ষণসমূহ উদ্‌ঘাটন করতে এবং আমাদের শত্রুশক্তি ও শত্রুশ্রেণির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের লাইনকে তুলে ধরতে।"[১৯]

২. রাজনৈতিক-অর্থনীতি– পদ্ধতিতাত্ত্বিক প্রশ্ন

অর্থনৈতিক গবেষণার ক্ষেত্রে উপরোল্লিখিত ডায়ালেকটিকসের নীতি, সূত্র, প্রত্যয় ও পদ্ধতিসমূহের একীভূত প্রয়োগের ফসলই হলো মার্কসের, চিরায়ত গ্রন্থ– "পুঁজি"। এ গ্রন্থটিকে মার্কস "অর্থনীতিশাস্ত্রের সমালোচনা" নামেও আখ্যায়িত করেছেন।

দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ– চিন্তার জগতে কার্ল মার্কসের বৈপ্লবিক অবদান। যার ফলশ্রুতি অর্থনীতি চিন্তার জগতে বিপ্লব, যার প্রকাশ মার্কসীয় রাজনৈতিক অর্থনীতি। মার্কসীয় রাজনৈতিক অর্থনীতিই সর্বপ্রথম উদ্‌ঘাটন করে যে, সব ধরনের মনুষ্যসম্পর্কের মধ্যে নির্ধারক সম্পর্ক হলো উৎপাদনসম্পর্ক। মার্কসীয় অর্থনীতি চিন্তানুযায়ী নির্দিষ্ট উৎপাদনপ্রক্রিয়া প্রাকৃতিক, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নয়। তা সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া।

মার্কসীয় রাজনৈতিক অর্থনীতি অত্যন্ত যৌক্তিক ধাঁচে তৈরি (যার বিষয়বস্তুগত দিকগুলো সহজবোধ্যভাবে ২, ৩ ও ৪ নম্বর ছকে দেখানো হয়েছে)। যার বিষয়বস্তু হলো নির্দিষ্ট সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোতে উৎপাদন সম্পর্কসমূহ উদ্‌ঘাটন করা। আর সেটা করা হয় উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের সাথে সম্পর্ক রেখে। উৎপাদনসম্পর্ক হলো উৎপাদনপ্রক্রিয়ায় মানুষের মধ্যে সম্পর্ক। উৎপাদিকা শক্তি হলো মানুষের সাথে প্রকৃতির সম্পর্ক (মানুষ প্রকৃতিকে বশ করে এবং শ্রম প্রয়োগে

[১৯] ভ. ই. লেনিন, "বস্তুবাদ ও ইন্দ্রিয়ানুভূতিবাদ," রচনাসমগ্র (রুশ সংস্করণ), খণ্ড ১৮, পৃ. ৩৬৩-৩৬৪।

সম্পদ সৃষ্টি করে)। সমাজের মূল উৎপাদনসম্পর্কগুলো হলো– উৎপাদনের উপায়ের ওপর মালিকানাজনিত সম্পর্ক (প্রধান সম্পর্ক); সামাজিক উৎপাদনপ্রক্রিয়ায় বিভিন্ন শ্রেণি ও স্তরের অবস্থানজনিত সম্পর্ক এবং উৎপাদিত দ্রব্যের বণ্টন ও পরিভোগজনিত সম্পর্ক। এসব সম্পর্কের মধ্যে "নির্ধারক উৎপাদনসম্পর্ক হলো উৎপাদনের উপায়ের ওপর মালিকানাজনিত সম্পর্ক।" কারণ উৎপাদনের উপায়ের মালিকই হবে উৎপাদনের মালিক, অন্যদিকে সে-ই নির্ধারণ করবে সেই পদ্ধতিটি যে পদ্ধতি অবলম্বনে শ্রমিক যন্ত্রের সাথে সংযুক্ত হবে (শিল্পের উদাহরণ)। উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের চরিত্র ও স্তরই নির্ধারণ করবে উৎপাদন সম্পর্কের বিকাশের চরিত্র ও দিক। উৎপাদিকা শক্তির মূল উপাদানসমূহ হলো– উৎপাদনী অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাসহ শ্রমশক্তি; শ্রমের বস্তু ও শ্রমের উপায় (যার অন্যতম উপাদান শ্রমের উপকরণ)।

শ্রমপ্রক্রিয়ার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেই মার্কস অর্থনীতিদর্শনকে ভাববাদী বিষয়বাদ থেকে মুক্ত করেন।[২০] মার্কসীয় অর্থনীতি চিন্তাতেই সর্বপ্রথম শ্রমরত মানুষকে সমাজের মূল উৎপাদিকা শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। বিজ্ঞান-প্রযুক্তি সরাসরি উৎপাদিকা শক্তি। শ্রমের বস্তুর সাথে শ্রমের উপায়ের সংযুক্তিই উৎপাদনের উপায়।

উৎপাদন পদ্ধতির উপাদানসমূহের পারস্পরিক ক্রিয়ার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন– প্রশ্নটি জটিল। বাস্তবত বিভিন্ন প্রক্রিয়ার পারস্পরিক নির্ভরতা বিষয়টি এমন যে, প্রায়শ তাদের মাঝে সীমারেখা নির্ধারণ অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। উপরন্তু একই সামাজিকসম্পর্ক বিভিন্ন শর্তাধীনে একই প্রক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন দিকসমূহ প্রতিফলিত করতে পারে এবং বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতে পারে। যেমন যন্ত্রপাতি– এটি উৎপাদিকা শক্তির উপাদান, কিন্তু তার প্রয়োগ (বা ব্যবহার)– অর্থনৈতিক প্রত্যয়, উৎপাদনের সামাজিকসম্পর্কের সাথে জড়িত। শ্রমশক্তি সম্পর্কেও অনুরূপ ধারণা প্রযোজ্য। কারণ, শ্রমশক্তি একাধারে উৎপাদিকা শক্তি (শ্রম করার সামর্থ্যের দৃষ্টিতে); আর অন্যদিকে– অর্থনৈতিক বুনিয়াদের উপাদান (উদ্বৃত্ত দ্রব্য সৃষ্টির সক্ষমতার দৃষ্টিতে)। উৎপাদন পদ্ধতির উপাদানসমূহের মধ্যে অনুরূপ সম্পর্ক দেখানো হয়েছে ছক ৩-এ।

---

[২০] এ-প্রসঙ্গে সোভিয়েত রাজনৈতিক-অর্থনীতিবিদেরা অত্যন্ত মূল্যবান গবেষণাগ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন বিশেষ উল্লেখ্য: ভ্লাদিমির আফানাসিয়েভ (রুশ ভাষায়) "শ্রমের দ্বৈত চরিত্রের পদ্ধতিগত তাৎপর্য– কার্ল মার্কসের মহান আবিষ্কার," (মস্কো, ১৯৮০)।

ছক ২: মার্কসীয় অর্থনীতি চিন্তায় সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপাদানসমূহের সংযোগ

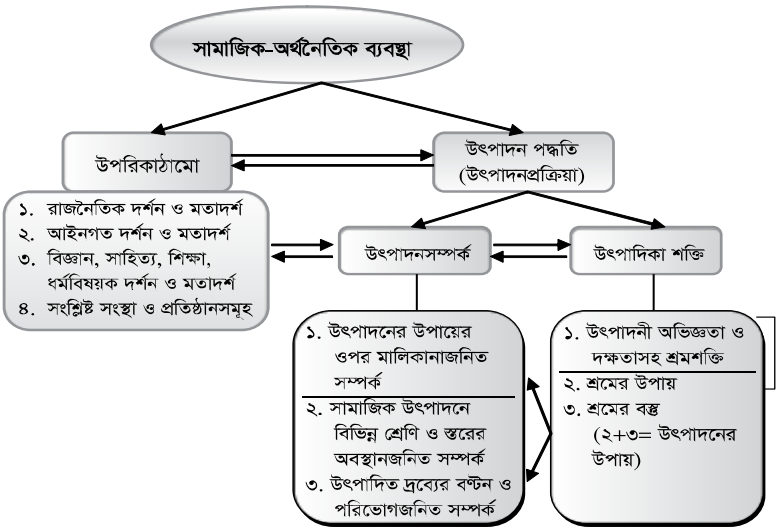

ছক ৩: উৎপাদন পদ্ধতির উপাদানসমূহের পারস্পরিক ক্রিয়া

উৎপাদিকা শক্তি		উৎপাদনসম্পর্ক
(উৎপাদন ও প্রযুক্তিগত সংগঠনের সূত্রসমূহের ক্রিয়াক্ষেত্র)		(অর্থনৈতিক সূত্রসমূহের ক্রিয়াক্ষেত্র)
১. শ্রমশক্তি– শ্রম করার সামর্থ্য; ২. শ্রমের উপায় ও শ্রমের বস্তু; ৩. উৎপাদনের উপায় ও যন্ত্রপাতির কারিগরি ও প্রযুক্তিগত বণ্টন; ৪. প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়াভাণ্ডারে দ্রব্যের বিনিময়।	সূত্রসমূহ ক্রিয়ার সীমারেখা	১. শ্রমশক্তি– উদ্বৃত্ত দ্রব্য সৃষ্টির সক্ষমতা; ২. শ্রমের উপায় ও শ্রমের বস্তুর সামাজিক উৎপাদনে ব্যবহার (রীতি); ৩. উৎপাদনের উপায়ের ওপর মালিকানার ধারণানুযায়ী উৎপাদিত দ্রব্যের বণ্টন; ৪. সামাজিক উৎপাদনপ্রক্রিয়ায় পণ্যের বিনিময়।

উল্লেখ্য, বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক নিয়ম বা সূত্রের ক্রিয়ার সীমারেখা, সেই সাথে সামাজিক উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্ক ও নির্ভরতার রূপ ও

পদ্ধতিসম্পর্কিত অভিজ্ঞান– অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের অন্যতম নির্ধারক পূর্বশর্ত। বর্তমান যুগে, বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের অনেকেই বলছেন যে, বিভিন্ন আর্থসামাজিক ব্যবস্থায় একই যন্ত্রের ব্যবহারের সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিণতি অভিন্ন, অনুরূপ। আর এই অভিন্নতার ভিত্তিতেই প্রমাণ করা হচ্ছে "দুই সমাজব্যবস্থার সম্মিলনী" তত্ত্বকে (যেটা টিনবারজেন ও গলব্রেথের উদাহরণে ইতিমধ্যে আলোচিত হয়েছে)। এমতাবস্থায় ২ নম্বর ছকের সারসত্তা অনুধাবন করা মৌলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

মার্কর্সই সর্বপ্রথম সামাজিক উৎপাদনের উপাদানসমূহের অন্তর্নিহিত সম্পর্কসমূহের দ্বন্দ্ব উদ্‌ঘাটন করেন।[২১] সামাজিক উৎপাদনপ্রক্রিয়ার বিশ্লেষণে মার্কস বলেন যে, উৎপাদনের শেষ পরিণতি ও অভিষ্ট লক্ষ্য হিসেবে পরিভোগ (consumption) রাজনৈতিক-অর্থনীতির বাইরের ব্যাপার। অবশ্যই পরিভোগ চিন্তার জগতের বিষয় হিসেবে উৎপাদনকে সরাসরিভাবে প্রভাবান্বিত করে। কিন্তু উৎপাদক ও উৎপাদিত দ্রব্যের মাঝে অবস্থান করে বণ্টন, এবং সে সামাজিক সূত্রসমূহের সহায়তায় দ্রব্যজগতে তার অংশ নির্ধারণ করে। সুতরাং, পরিভোগ যদিও উৎপাদনের মুহূর্ত, উৎপাদিকা শক্তির উপাদান; তথাপি তার বাস্তব অবস্থান, আকার, অংশ সম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান উৎপাদনসম্পর্কের চরিত্রের ওপর নির্ভরশীল। আর তাই পরিভোগ সরাসরি নয়, বণ্টন ও বিনিময়ের মাধ্যমেই উৎপাদনসম্পর্কের সাথে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, বণ্টনও একই সাথে হতে পারে উৎপাদিকা শক্তির উপাদান (প্রযুক্তিগত শ্রমবিভাগ অর্থাৎ বিভিন্ন উৎপাদনকর্মে উৎপাদনযন্ত্র ও শ্রমশক্তির বণ্টন) এবং উৎপাদনসম্পর্কের উপাদান (উৎপাদনের উপায়ের বণ্টন)। অনুরূপভাবে বিনিময়ও একাধারে উৎপাদনসম্পর্ক ও উৎপাদিকা শক্তিসম্পর্কিত প্রত্যয়। উপরোক্ত প্রত্যয়সমূহ কোন শর্তে উৎপাদিকা শক্তি, কোন শর্তে উৎপাদনসম্পর্কের বাহক হবে তার সীমারেখা নির্ধারণ মার্কসীয় রাজনৈতিক-অর্থনীতির মৌলিক আবিষ্কার। সম্ভবত এখানেই বুর্জোয়া রাজনৈতিক-অর্থনীতির সাথে মার্কসীয় রাজনৈতিক-অর্থনীতির অন্যতম মৌলিক পার্থক্য।

উৎপাদনসম্পর্কের উপাদানসমূহের অধীনস্থক্রমানুযায়ী বন্দোবস্তটা (mechanism of subordination) সামাজিক-অর্থনৈতিক গবেষণায় অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সমগ্র উৎপাদনসম্পর্ক "সিস্টেমের" উপাদানসমূহের আন্তসম্পর্কের রূপ ও চরিত্রকে ৪ নম্বর ছকে সরলভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় সামাজিক

[২১] বিস্তারিত দেখুন: মার্কস, "অর্থনৈতিক পাণ্ডুলিপি ১৮৫৭-১৮৫৮ সালে"র ভূমিকা, 'মার্কস-এঙ্গেলস রচনাসমগ্র', তৃতীয় রুশ সংস্করণ, খণ্ড ১২, পৃ. ৭০৯-৭৩৮; মার্কস, "অর্থশাস্ত্র বিচার প্রসঙ্গে", প্রগতি প্রকাশন (মস্কো ১৯৮২)।

শ্রমবিভাগের ভূমিকাও দেখানো হয়েছে। অবশ্যই ছকে বর্ণিত সিস্টেমে বিভিন্ন যোগসূত্র ও নির্ভরশীলতা সমমানের নয়। ক্ষেত্রবিশেষে নির্ভরশীলতা হয়– সরাসরি (যেমন মালিকানা– বণ্টন), আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেটা উৎপাদনসম্পর্কের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যস্থতায়। যেমন বিনিময়– মালিকানার ধরনের ওপর সরাসরি নির্ভরশীল নয়, তা নির্ভরশীল বণ্টন ও সামাজিক শ্রমবিভাগের মাধ্যমে (যাদের উপস্থিতি ছাড়া বিনিময়ের অস্তিত্ব নেই)। মালিকানার সাথে সামাজিক শ্রমবিভাগের যোগ ঘটে বণ্টন ও বিনিময়ের মধ্যস্থতায়। মালিকানা ও সামাজিক শ্রমবিভাগের মধ্যে আবার সরাসরি যোগসূত্রও ঘটে। যেমন উৎপাদনের উপায়ের মালিক এবং যার সেই মালিকানা অনুপস্থিত– উভয়ে সামাজিক উৎপাদনের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করছে, বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করছে; আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী শ্রমবিভাগ জন্ম দিচ্ছে আন্তর্জাতিক মনোপলির ইত্যাদি।

ছক ৪: উৎপাদনসম্পর্কসমূহের বিভিন্ন উপাদানের অধীনস্থক্রম (subordination)

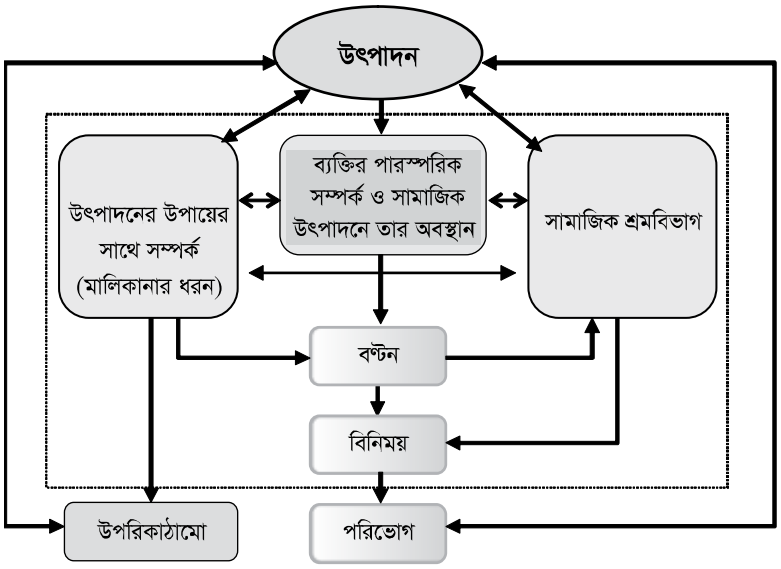

উৎপাদনসম্পর্কের "সিস্টেমে" নির্দিষ্ট উপাদানের পরিবর্তন শেষ পর্যন্ত অন্যান্য উপাদানের পরিবর্তন আনয়ন করে। কিন্তু সব উপাদানই "সিস্টেমের" অন্যান্য উপাদানের মতো সমমাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ নয়। মালিকানার ধরন পরিবর্তন অন্যান্য উপাদানের পরিবর্তনে তাৎক্ষণিক ক্রিয়া করে, কিন্তু বিনিময়ের ধরন পরিবর্তন সবসময়ই এবং সাথে সাথে মালিকানার ধরন ও সামাজিক শ্রমবিভাগের পরিবর্তন সাধন করে না। আবার শ্রমবিভাগের পরিবর্তন সরাসরি ও তাৎক্ষণিকভাবে বিনিময়ের ক্ষেত্রে ক্রিয়া করে। ছক ৪-এর বিশ্লেষণ থেকে এমন কোনো উপসংহারে উপনীত হওয়া সঠিক হবে না যে, দ্রব্যখাজনার পণ্যখাজনায় রূপান্তর, মজুরির রূপ পরিবর্তন মালিকানার ধরনকে পূর্ণতাপ্রাপ্তির দিকে নিয়ে যায়, সামন্তপ্রভু ধীরে ধীরে পুঁজিবাদী ভিত্তিতে খামার পরিচালনার দিকে অগ্রসর হয়, জোতদারে রূপান্তরিত হয়; দ্রব্য মজুরিপ্রাপ্ত আধাশ্রমিক পণ্যমজুরি প্রাপ্তির ফলে প্রলেতারিয়েতে পরিণত হয় (এটি আধাশ্রমিকের প্রলেতারিয়েতে রূপান্তরের আবশ্যকীয় শর্ত)। অনুরূপ বক্তব্য বিনিময়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। পণ্যের সাথে পণ্যবিনিময় যখন রূপান্তরিত হয়ে-হয়ে অর্থের মধ্যস্থতায় শুরু হলো, সেটা তখন বণ্টন ও মালিকানার ধরনকে প্রভাবান্বিত করল।

সুতরাং "উৎপাদনসম্পর্ক সিস্টেমের" সব উপাদানের গতিপ্রকৃতি সরাসরিভাবে মালিকানার ধরনের ওপর নির্ভরশীল। এই মালিকানা-ধরনের সাথে সামাজিক শ্রমবিভাগ ও উৎপাদনসম্পর্কের সমমুখী ও বিপরীতমুখী যোগসূত্র বিদ্যমান। উৎপাদনসম্পর্ক এবং মালিকানার ধরনই শেষপর্যন্ত উপরিকাঠামোর চরিত্র ও প্রধান রূপসমূহের নির্ধারক। মালিকানার ধরনটা হতে পারে– ব্যক্তিগত, সামাজিক ও অন্তবর্তীকালীন। যেখানে শ্রমপ্রক্রিয়া সামাজিক এবং উৎপাদনের উপায়ের ওপর মালিকানা ব্যক্তিগত চরিত্রের, সেখানে অর্থনৈতিক শোষণ ও আপোসহীন দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী, আর তাই সামাজিক বিপ্লব অনিবার্য। শ্রমপ্রক্রিয়ার সামাজিক চরিত্রের আমলে সব প্রকার আপোসহীন দ্বন্দ্বের মীমাংসার উদ্দেশ্যে উৎপাদনের উপায়ের ওপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে– এটাই স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক। মার্কসের চিরায়ত গবেষণা "পুঁজি" অথবা "অর্থনৈতিক পাণ্ডুলিপি ১৮৫৭-১৮৫৮", এঙ্গেলসের "অ্যান্টি ড্যুরিং" এই সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। স্ব-সম্পর্কেও মার্কস ওয়াইদেমায়ারের কাছে চিঠিতে লিখেছেন যে, "আধুনিক সমাজে শ্রেণি ও শ্রেণিসংগ্রামের অস্তিত্ব আবিষ্কারের ব্যাপারে আমার কোনো কৃতিত্ব নেই। আমার বহু আগে বুর্জোয়া ঐতিহাসিকেরা এবং বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদেরা যথাক্রমে শ্রেণিসংগ্রামের ঐতিহাসিক বিকাশ ও শ্রেণিসমূহের অর্থনীতিক 'অ্যানাটোমি' বর্ণনা করেছেন। নতুন আমি যা করেছি, তা হলো প্রমাণ করেছি (১) 'উৎপাদনের বিকাশের বিশেষ ঐতিহাসিক

স্তরের সঙ্গেই শুধু শ্রেণিসমূহের অস্তিত্ব জড়িত'; (২) শ্রেণিসংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী রূপে সর্বহারার একনায়কত্বে পৌঁছায়; (৩) এই একনায়কত্বটাও হলো সমস্ত শ্রেণির বিলুপ্তি ও একটি শ্রেণিহীন সমাজে উত্তরণমাত্র।"[২২]

মার্কসীয় অর্থনীতিশাস্ত্রে বিকাশের ক্ষেত্রে শুধু উৎপাদনসম্পর্ক ও উৎপাদিকা শক্তির ভূমিকাই বিশ্লেষিত হয় না। অর্থনীতির ভিত্তি (উৎপাদনসম্পর্কসমূহের দ্বান্দ্বিক সমাহার), উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন পদ্ধতির বিকাশে উপরিকাঠামোর অন্যতম উপাদান– রাষ্ট্রশক্তির ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

আধুনিক বুর্জোয়া "মার্কস চর্চা" (Marxology) সোচ্চার প্রচার চালাচ্ছে যে, মার্কসবাদীরা নাকি অর্থনৈতিক বিকাশে উপরিকাঠামোর (বিশেষত রাষ্ট্রকাঠামোর) সক্রিয় ভূমিকা অস্বীকার করেন অথবা সেটাকে সর্বক্ষেত্রে গৌণ হিসেবে গণ্য করে থাকেন। প্রকৃত অর্থে মার্কসীয় অর্থনীতি চিন্তায় সামাজিক অর্থনৈতিক বিকাশে উপরিকাঠামোর আপেক্ষিক স্বাধীন ভূমিকা যথেষ্ট মাত্রায় স্বীকৃত (ছক ২ ও ৪-এ দেখানো হয়েছে)। এ মর্মে ব্লকের কাছে এঙ্গেলসের লেখা চিঠিটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, "... ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা অনুসারে বাস্তব জীবনের উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনই হচ্ছে ইতিহাসে শেষপর্যন্ত নির্ধারক বস্তু। এর বেশি কিছু, মার্কস বা আমি কখনো বলিনি। অতএব কেউ যদি তাকে বিকৃত করে এই দাঁড় করায় যে, অর্থনৈতিক ব্যাপারই হচ্ছে একমাত্র নির্ধারক বস্তু, তাহলে সে প্রতিপাদ্যটিকে একটি অর্থহীন, অমূর্ত, নির্বোধ উক্তিতে পরিণত করে। অর্থনৈতিক পরিস্থিতি হলো ভিত্তি; কিন্তু উপরিকাঠামোর বিভিন্ন বস্তু, যেমন শ্রেণিসংগ্রামের রূপগুলো এবং তার ফলাফল... ... ঐতিহাসিক সংগ্রামগুলোর গতিকে প্রভাবিত করে এবং বহু ক্ষেত্রে তাদের রূপ নির্ধারণে প্রধান হয়ে ওঠে।"[২৩]

মার্কসের "পুঁজি", এঙ্গেলসের "অ্যান্টি ড্যুরিং" এবং লেনিনের "রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ" গ্রন্থে অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাষ্ট্রের (বা উপরিকাঠামোর অন্যান্য উপাদানের) ভূমিকা সম্পর্কে সুস্পষ্ট দ্বন্দ্বাত্মক ধারণা অনুপস্থিত। আর বুর্জোয়া মার্কস চর্চা মার্কসের সাহায্যে মার্কসবাদ নিধনের জন্য উল্লিখিত পুস্তকসমূহের অংশবিশেষকে পুঁজি হিসেবে গ্রহণ করছে। এসব পুস্তকে আলোচিত প্রশ্নে সুস্পষ্ট ধারণা নেই, কারণ এক্ষেত্রে

---

[২২] Marx, "Letter to Weydemeyer (1852)", Marx and Engels Selected Correspondence, পৃ. ৫৭।

[২৩] ই, ব্লক সমীপে এঙ্গেলসের চিঠি, লন্ডন ১৮৯০, "মার্কস-এঙ্গেলস রচনা সংকলন" (মস্কো থেকে বাংলায় প্রকাশিত), দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় অংশ, পৃ. ১৭৫।

গবেষণার বিষয়বস্তু ও লক্ষ্য ছিল ভিন্নতর, আর তা হলো চিরায়ত পথে বিকাশমান অর্থনীতি, বিশেষত পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশসূত্র অনুসন্ধান করা। সেক্ষেত্রে উপরিকাঠামো অবশ্যই ভিত্তিকাঠামোর চরিত্র দ্বারা নির্ধারিত। উল্লিখিত পুস্তকসমূহে বিশেষ ঐতিহাসিক কারণেই আলোচিত বিষয়ের শুধু একটি দিকের ওপরই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আর এঙ্গেলসের ভাষায় সেটা হলো– "তরুণেরা যে অনেক সময় অর্থনৈতিক দিকের ওপর যতখানি উচিত তার চেয়ে বেশি জোর দিয়ে থাকেন, তজ্জন্য মার্কস ও আমি, আমরা নিজেরাই কিছুটা দায়ী। আমাদের প্রতিপক্ষরা অস্বীকার করতেন বলেই তাঁদের বিপরীতে অর্থনৈতিক দিকটির ওপর আমাদের জোর দিতে হয়েছিল। পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য দিকগুলোর যথাযথ গুরুত্ব দেওয়ার মতো সময়, স্থান বা সুযোগ আমরা পাইনি।"[২৪]

উপরিকাঠামো ও ভিত্তিকাঠামোর পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণে সমস্যা প্রধানত (শুধু নয়) সেই অর্থনৈতিক কাঠামোর জন্য, যা চিরায়ত পথে বিকশিত নয়। উদাহরণস্বরূপ– বাংলাদেশের সমাজ ও অর্থনীতি।[২৫] অর্থাৎ যেখানে সামন্তবাদ নির্ধারক উৎপাদন পদ্ধতি নয়; পুঁজিবাদ "ইনজেকটেড", বহিরাগত, শিল্পপুঁজির স্বাধীন বিকাশের সম্ভাবনা অতিমাত্রায় সীমিত, বাণিজ্যপুঁজি তার নিকৃষ্টতর রূপ পরিগ্রহ করতে বাধ্য হচ্ছে (যা বিভিন্ন ধরনের পুঁজিকে শিল্পপুঁজিতে রূপান্তরের পথে অন্তরায়)।

এহেন ঐতিহাসিক কাঠামোর মুক্তবিকাশে উপরিকাঠামো কি স্বাধীন ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে না? অবশ্যই, শুধু হতেই পারে তা-ই নয়, হচ্ছেও– ভবিষ্যতেও হবে। হচ্ছে, কারণ আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদ, বাংলাদেশের বিদ্যমান সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোকে তাদের কক্ষপথে ধরে রাখার লক্ষ্যে সরাসরি রাষ্ট্রকাঠামোর ওপরও সর্বাধিক ভর করছে (আবার বলছি– আমাদের অর্থনীতি আমাদের নয়, সেটা আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের নির্ভরশীল অংশমাত্র)। আবার ঐতিহাসিকভাবেই যেহেতু শিল্পপুঁজি বিকাশের পূর্বশর্তাদি আমরা ইতিমধ্যে হারিয়েছি; আর তাই আমাদের ভবিষ্যৎ মুক্ত-অর্থনীতির শিল্পায়নে মেহনতি মানুষের রাষ্ট্রক্ষমতা হবে অন্যতম প্রধান উৎপাদনসম্পর্কের বাহক, যার ভিত্তি হবে– রাষ্ট্রায়ত্ব মালিকানা। সুতরাং উপরিকাঠামো তার স্বাধীন ভূমিকা পালন করবে– ঐতিহাসিক কারণেই। আলোচিত প্রক্রিয়ার সাথে চিরায়ত মার্কসবাদের কোনোই অসঙ্গতি নেই। প্রসঙ্গটা আরো সুস্পষ্ট

---

[২৪] ই, ব্লক সমীপে এঙ্গেলসের চিঠি, পৃ. ১৭৭।

[২৫] এ প্রসঙ্গে দেখুন: আবুল বারকাত, "বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতি-বিতর্ক, পদ্ধতিগত সমস্যা ও সমাধান," *সমাজ, অর্থনীতি, রাষ্ট্র জর্নাল*, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ৬৩-১৩০।

করার জন্য এঙ্গেলসের– অর্থনৈতিক বিকাশে উপরিকাঠামোর প্রভাবসূত্র উদ্ধৃত করা যেতে পারে: "অথনৈতিক বিকাশে রাষ্ট্রশক্তির প্রভাব তিন ধরনের হতে পারে। রাষ্ট্রশক্তি একই অভিমুখে যেতে পারে এবং সেক্ষেত্রে বিকাশ দ্রুততর হয়। রাষ্ট্রশক্তি অর্থনৈতিক বিকাশধারার বিপরীত দিকে যেতে পারে এবং সেক্ষেত্রে আজকাল প্রত্যেক বৃহৎ জাতির মধ্যে রাষ্ট্রশক্তি শেষপর্যন্ত চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। অথবা সেটা (রাষ্ট্রশক্তি–) অর্থনৈতিক বিকাশে কয়েকটি পথ বন্ধ করে তাকে অন্য কয়েকটি পথে ঠেলে দিতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যাপারটি শেষপর্যন্ত আগের দুটির একটিতে পর্যবসিত হয়। কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যায়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্থনৈতিক বিকাশের প্রচণ্ড ক্ষতি সাধন করতে পারে এবং বিপুল পরিমাণ শক্তি ও বৈষয়িক সম্পদের অপচয় ঘটাতে পারে।" [২৬]

৩. মার্কসীয় রাজনৈতিক অর্থনীতিতে পুঁজিবাদ– মনুষ্যবিচ্ছিন্নতার চরম রূপ

মার্কসীয় বিশ্লেষণ সর্বোচ্চ যুক্তিসহকারে প্রমাণ করে যে, পুঁজিবাদ তার বিকাশের বিভিন্ন পর্বে যত জটিল ও দুর্বোধ্য তত্ত্বই প্রদর্শন করুক না কেন, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে তা সর্বশেষ শ্রেণিভিত্তিক সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। পুঁজিবাদ মনুষ্যবিচ্ছিন্নতার চরমতম রূপ। আর এই বিচ্ছিন্নতার মূল উৎস– উৎপাদনের উপায়ের ওপর ব্যক্তিগত, পুঁজিবাদী মালিকানা; যার ফলশ্রুতি হলো সামাজিক উৎপাদনপ্রক্রিয়ায় শ্রমোৎপাদিত ফসলের ব্যক্তিমালিক কর্তৃক আত্মসাৎকরণ (উদ্বৃত্ত শ্রম আত্মসাৎ)। এখানে বৈষয়িক সম্পদই শুধু নয়, মানুষের সাথে মানুষের আত্মিক সম্পর্কটিও পণ্যরূপ পরিগ্রহ করে। কাল্পনিক সমাজতন্ত্রী কাম্পান্নেলা ও সেইন্ট সাইমন থেকে শুরু করে আধুনিক অস্তিত্ববাদী জ্যাঁ-পল-সাত্রে– সবাই পুঁজিবাদের এই সমস্যাটা অন্যতম মূল সমস্যা হিসেবে দেখেছেন। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা মনুষ্যবিচ্ছিন্নতার চরম রূপ; কারণ, শ্রম ও পুঁজির আপোসহীন দ্বন্দ্বটা এখানে চরম রূপ পরিগ্রহ করে। মার্কসীয় অর্থনীতি এসব প্রক্রিয়ার বহুমুখী বিশ্লেষণ করেছে এবং প্রমাণ করেছে যে, পুঁজিবাদ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নয়, তা ঐতিহাসিক বিকাশের স্তরমাত্র এবং পুঁজিবাদই শ্রেণিশোষণহীন সমাজব্যবস্থার আগমনকে অনিবার্য করে তোলে।

রাজনৈতিক-অর্থনীতির মূল গবেষণাগ্রন্থ "পুঁজি"র ৪ খণ্ডে (পুঁজিবাদী উৎপাদনপ্রক্রিয়া, ১ম খণ্ড; পুঁজি সঞ্চালন প্রক্রিয়া, ২য় খণ্ড; পুঁজি উৎপাদন ও

---

[২৬] ক. স্মিদ সমীপে এঙ্গেলসের চিঠি। "মার্কস-এঙ্গেলস রচনা সংকলন" (মস্কো থেকে বাংলায় প্রকাশিত) দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৮০।

সঞ্চালন প্রক্রিয়ার ঐক্য, ৩য় খণ্ড; উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্বের উদ্ভব-ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড) মার্কস প্রমাণ করেছেন যে, পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি অবশ্যম্ভাবীভাবেই সর্বহারা বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হবে। মার্কস শ্রেণিবিভক্ত সমাজবিকাশে শ্রমিকশ্রেণির "ঐতিহাসিক দায়িত্ব" বিশ্লেষণ করেছেন। পুঁজিবাদ যে মনুষ্যবিচ্ছিন্নতার চরম রূপ, তা প্রমাণ করতে গিয়ে অর্থনীতি চিন্তার ক্ষেত্রে "পুঁজি"-তে মার্কস যা আবিষ্কার করেছেন সেগুলো যুক্তিক্রমানুযায়ী নিম্নরূপ:

ক. পুঁজিবাদ-সর্বজনীন পণ্যোৎপাদনের যুগ। আর একক পণ্য হলো পুঁজিবাদের সব দ্বন্দ্বের ঘনীভূত বহিঃপ্রকাশ (পুঁজি, খণ্ড ১, বিভাগ ১);

খ. পণ্যে নিহিত শ্রমের দ্বৈত চরিত্র ও তার দ্বন্দ্ব (পুঁজি, খণ্ড ১, বিভাগ ১);

গ. অর্থের পণ্যে রূপান্তর বা পুঁজির সাধারণ সূত্র (পুঁজি, খণ্ড ১, বিভাগ ২);

ঘ. উদ্বৃত্ত মূল্যের উৎপাদনপ্রক্রিয়া ও বৃদ্ধির শর্তাবলী (পুঁজি, খণ্ড ১, বিভাগ ৩, ৪, ৫, ৬);

ঙ. পুঁজি সঞ্চয়ন প্রক্রিয়ায় পুঁজির জৈবিক গঠনের পরিবর্তনের সাথে সাথে পুঁজিপতির সম্পদ বৃদ্ধি ও ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব ও সংকট (পুঁজি, খণ্ড ১, বিভাগ ৭)। উল্লেখ্য, "উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব" যখন প্রমাণ করে যে– পুঁজিই উদ্বৃত্ত মূল্যের জন্মদাতা, "পুঁজি সঞ্চয়নের তত্ত্ব" প্রমাণ করে যে, উদ্বৃত্ত মূল্যই পুঁজির জন্মদাতা; কারণ পুঁজি হলো সঞ্চয়কৃত উদ্বৃত্ত মূল্য (accumulated surplus value)। এই পরিচ্ছেদেই মার্কস সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবিতার পক্ষে যুক্তি প্রতিষ্ঠা করেন;

চ. শ্রেণিসম্পর্ক হিসেবে পুঁজি ও গতি হিসেবে পুঁজি এবং তার বিভিন্ন মেটামরফোসিস (পুঁজি, খণ্ড ২, বিভাগ ৩);

ছ. মোট সামাজিক উৎপাদনের পুনরুৎপাদন ও সঞ্চালন প্রক্রিয়া, যা প্রমাণ করে পুঁজিবাদে সংকট অনিবার্য, (পুঁজি, খণ্ড ২, বিভাগ ৩); এবং

জ. উৎপাদনসম্পর্কের মূর্ত রূপসমূহ অথবা উদ্বৃত্ত মূল্যের রূপান্তর তত্ত্ব (খণ্ড ৩)।

সুতরাং মার্কসীয় গবেষণার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্বের ভিত্তিতে সহজভাবেই প্রমাণ করে যে, পুঁজিবাদ মনুষ্যবিচ্ছিন্নতার সর্বোচ্চ বা চরম রূপ। আমার মতে, পুঁজিবাদে মোট সামাজিক উৎপাদের উৎপাদন ও বণ্টনপ্রক্রিয়া (দেখুন ছক-৫) ও পুঁজি বিকাশপ্রক্রিয়া (যার মধ্যে অন্যতম হলো পুঁজির সম্প্রসারিত পুনরুৎপাদন, উৎপাদনচক্র ও পুঁজির জৈবিক গঠনের বিকাশপ্রক্রিয়া)– উপরোল্লিখিত "বিচ্ছিন্নতার" সবচেয়ে সংশ্লেষিত বহিঃপ্রকাশের সাক্ষ্য বহন করে।

২, ৩ ও ৪ নম্বর ছকের অন্তর্নিহিত সম্পর্কসমূহই ৫ নম্বর ছকের বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণভিত্তি। ৫ নম্বর ছক অনুযায়ী পুঁজিবাদে মনুষ্যবিচ্ছিন্নতার রূপগুলো হলো নিম্নরূপ:

প্রথম বিচ্ছিন্নতা: সমাজে এক মেরুতে অবস্থান করছে গুটিকয়েক পুঁজিমালিক; আর অন্যদিকে বিশাল মজুরিশ্রমিক। মজুরিশ্রমিকের উৎপাদনের উপায়ের ওপর কোনো মালিকানা নেই, মালিকানা নেই জীবনোপায়ের ওপর। সে মালিক তার শ্রমশক্তির। পুঁজির মালিক তার অর্থের বিনিময়ে বাজার থেকে ক্রয় করছে ধ্রুব পুঁজি ও পরিবর্তনীয় পুঁজি অর্থাৎ যথাক্রমে উৎপাদনের উপায় (C) ও শ্রমশক্তি (V)। এ-দুটোর সম্মিলনে সৃষ্টি হচ্ছে পণ্য, যার আছে পণ্যমূল্য। সমগ্র সমাজের জন্য এরই নাম মোট সামাজিক উৎপাদন (Aggregate Social Product = ১০০ একক)। সুতরাং বিচ্ছিন্নতার শুরু মালিকানাসমস্যা থেকে।

দ্বিতীয় বিচ্ছিন্নতা: উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হচ্ছে "নতুন মূল্য" (Newly Created Value = ৪০ একক)। এই নতুন মূল্যের সৃষ্টিকর্তা বৈষয়িক উৎপাদনে নিয়োজিত মজুরিশ্রমিক। মজুরিশ্রমিক সৃষ্টি করল ৪০ একক; তবে মজুরি হিসেবে পেল ২০ একক। অবশিষ্ট ২০ একক আত্মসাৎ করল উৎপাদনের উপায়ের মালিক। এটা মালিকের মুনাফা। সুতরাং মালিকানার বিচ্ছিন্নতার কারণেই জন্ম নিল বণ্টনজনিত বিচ্ছিন্নতা।

তৃতীয় বিচ্ছিন্নতা: অর্থনীতির "সুষ্ঠু" পরিচালনার জন্য গঠিত হলো পুনঃবণ্টন তহবিল, (যেখানে মজুরিশ্রমিক ও মালিকের "যৌথ" অবদান = ১৬ একক)। পুনঃবণ্টন তহবিলের উদ্দেশ্য "সবার সুস্থতা" (!) কামনা করা। সুতরাং সমাজের সব মনুষ্যজীবই এটির অংশ ভোগ করবে। তবে মোট তহবিলের ৫০ শতাংশ প্রদানকারীর ভাগ্যে ফিরে এল মাত্র ২৫ শতাংশ; অথচ বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকারী ৫০ শতাংশ এর বিনিময়ে ফিরে পেল ৭৫ শতাংশ। পুনঃবণ্টন তহবিল সৃষ্টি করছে রাষ্ট্রের আয় তহবিল, যার প্রকৃত উৎস উদ্বৃত্ত মূল্য। এটা কোন রাষ্ট্রের তহবিল? সেই রাষ্ট্রের, যে রাষ্ট্রের মূল দায়িত্ব বিচ্ছিন্নতার উৎসকে উত্তরোত্তর শক্তিশালী করা; অর্থাৎ উৎপাদনের উপায়ের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার স্বার্থের সেবা করা। এভাবেই মূল বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করছে– শ্রমজীবীদের মোট আয়, রাষ্ট্রের মোট আয় এবং শোষকশ্রেণির মোট আয়– যেগুলো যথাক্রমে জাতীয় আয়ের ৪০ শতাংশ, ৩০ শতাংশ এবং ৩০ শতাংশ। সুতরাং জাতীয় আয়ের ৬০ শতাংশের মালিক হলো তারা, যাদের জাতীয় আয় সৃষ্টিতে কোনো অবদানই নেই– আর তাই পরগাছা। পরগাছার শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে চতুর্থ বিচ্ছিন্নতায়।

চতুর্থ বিচ্ছিন্নতা: এ পর্বে মোট জাতীয় আয়ের সর্বশেষ ব্যবহার (final utilization or final use) হচ্ছে। হচ্ছে সর্বশেষ ভোগ ও সর্বশেষ সঞ্চয় তহবিল। শ্রমজীবী ভোগ করছে তার আওতার সবটুকু (১৬ একক); রাষ্ট্র ও শোষকশ্রেণি ভোগ করছে তাদের আওতার মাত্র অর্ধেকটুকু। বাকি অর্ধেকটুকু "সঞ্চয়"। আর এটাই হলো "সঞ্চিত উদ্বৃত্ত মূল্য" বা 'পুঁজি'। এবারে উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় পুঁজির পরিমাণ কিন্তু প্রথম বিচ্ছিন্নতায় বিনিয়োজিত পুঁজির অধিক (প্রথমে ছিল ৮০ একক; আর এবার ৮০ + ১২ বা ৯২ একক, তন্মধ্যে পুঁজির জৈবিক গঠনের সম্পর্ক বজায় রাখার কারণে ৬৯ একক ধ্রুব পুঁজি এবং ২৩ একক পরিবর্তনশীল পুঁজি)। বৃদ্ধি পাচ্ছে উৎপাদন ও বিকশিত হচ্ছে উৎপাদিকা শক্তি। অবশ্য এই উৎপাদন ও উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি শর্তহীন নয়। উৎপাদনে বিনিয়োজিত পুঁজি তার সহজাত ধর্ম থেকেই তা অবশ্যম্ভাবীভাবে সৃষ্টি করবে।

অধিকতর বিচ্ছিন্নতা। আর পুঁজির ধর্ম হলো "মুনাফার গন্ধ পুঁজিকে সাহসী করে তোলে। ১০ শতাংশ মুনাফা দিন– পুঁজি যেকোনো বিনিয়োগে সম্মত। ২০ শতাংশ মুনাফা দিন– পুঁজি সক্রিয়তর। ৫০ শতাংশ মুনাফা দিন– পুঁজি নিজের বিপদ ডেকে আনতেও কুণ্ঠা বোধ করবে না। আর যদি ১০০ শতাংশ মুনাফা প্রাপ্তির আশা থাকে– সেক্ষেত্রে ফাঁসির রায়ের সম্ভাবনা জেনেও এমন কোনো অপরাধ নেই, যার ঝুঁকি পুঁজি নেবে না।"[২৭]

ঘ. বাস্তব পুঁজিবাদ

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, বৈজ্ঞানিক কারিগরি বিকাশ এবং সেই সাথে আপোসহীন দ্বন্দ্বের প্রকটতা– পুঁজিবাদের বিকাশে এটি অবশ্যম্ভাবী প্রক্রিয়া। প্রক্রিয়ার ভিত্তি– উদ্বৃত্ত মূল্য। উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে শোষণ বৃদ্ধি– এটি পুঁজিবাদী উৎপাদনের একক প্রক্রিয়ার দুটি অঙ্গাঙ্গী দিক। এ মর্মে প্রাসঙ্গিক সারণি ১-এর পরিসংখ্যানতথ্যে পুঁজিবাদী উৎপাদনের উভয় পরিণামই পরিষ্কার– শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সাথে সাথে শ্রমিকের ওপর পুঁজির শোষণও বৃদ্ধি পায়। ১৮৯৯ সাল থেকে ১৯৮০ সালের তথ্যে সুস্পষ্ট যে, আমেরিকার প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে ক্রমাগত হারে উৎপাদন-বৃদ্ধি হয়েছে, উৎপাদনশীলতাও (শ্রমঘণ্টাপ্রতি) বৃদ্ধি পেয়েছে, গড় সাপ্তাহিক মজুরিও বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের হিসাবমতে, আলোচিত শিল্পে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সাথে শোষণের হারের সহসম্পর্ক অত্যন্ত উঁচু মাত্রার (০.৯৭৩৩) এবং উৎপাদনশীলতা ও

[২৭] মার্কস, "মার্কস-এঙ্গেলস রচনাসমগ্র", তৃতীয় রুশ সংস্করণ, খণ্ড ২৩, পৃ ৭৭০।

ছক ৫: পুঁজিবাদে মোট সামাজিক উৎপাদের উৎপাদন ও বণ্টন প্রক্রিয়া*

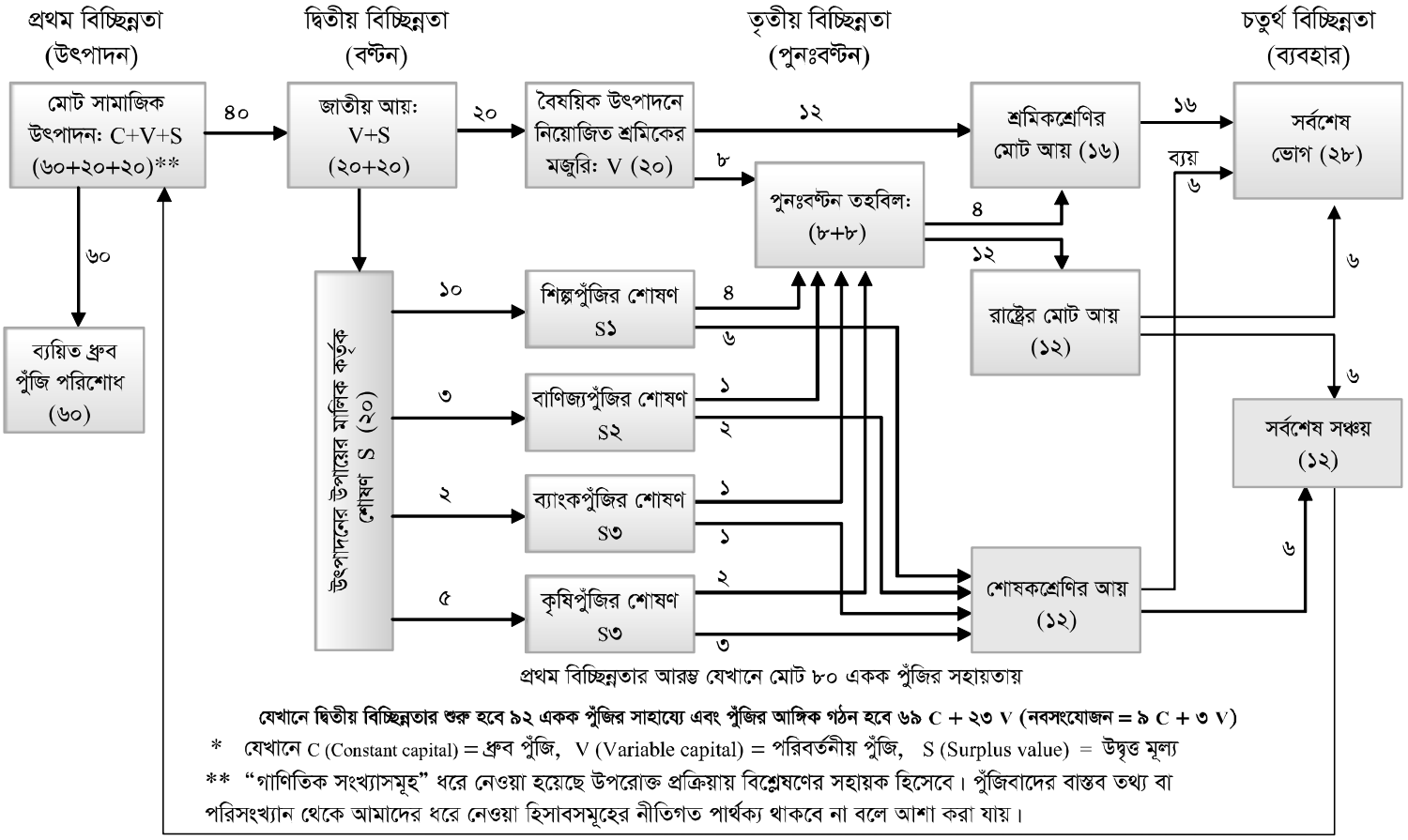

প্রথম বিচ্ছিন্নতার আরম্ভ যেখানে মোট ৮০ একক পুঁজির সহায়তায়

যেখানে দ্বিতীয় বিচ্ছিন্নতার শুরু হবে ৯২ একক পুঁজির সাহায্যে এবং পুঁজির আঙ্গিক গঠন হবে ৬৯ C + ২৩ V (নবসংযোজন = ৯ C + ৩ V)

* যেখানে C (Constant capital) = ধ্রুব পুঁজি, V (Variable capital) = পরিবর্তনীয় পুঁজি, S (Surplus value) = উদ্বৃত্ত মূল্য

** "গাণিতিক সংখ্যাসমূহ" ধরে নেওয়া হয়েছে উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় বিশ্লেষণের সহায়ক হিসেবে। পুঁজিবাদের বাস্তব তথ্য বা পরিসংখ্যান থেকে আমাদের ধরে নেওয়া হিসাবসমূহের নীতিগত পার্থক্য থাকবে না বলে আশা করা যায়।

শোষণের হারের প্রবণতারেখা হলো যথাক্রমে ৬০.২ + ৬.১৭t ও ২২৮.৬ + ১৩.৯৬t (যখন t = সময়)। ফলশ্রুতিতে শোষণের মাত্রা এমনভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যে, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কারণে যতটুকু অতিরিক্ত উৎপাদন হয়েছে তাতে শ্রমিকের অংশটা উত্তরোত্তর হ্রাস পেয়েছে।[২৮]

মার্কসীয় অর্থনীতি চিন্তার বিপরীতে বুর্জোয়া অর্থনীতি চিন্তায় বলা হচ্ছে যে, বৈজ্ঞানিক কারিগরি বিপ্লবের যুগে মার্কসের আমলের মনুষ্যবিচ্ছিন্নতা লোপ পাচ্ছে, আর সেই সাথে আপনা-আপনি বিলুপ্তি ঘটছে মার্কস-বর্ণিত সামাজিক-অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের তত্ত্বটি। অথচ পুঁজিবাদী দেশের সরকারি তথ্য প্রমাণ করে যে, পুঁজিবাদে প্রযুক্তি ও কারিগরি উন্নতির সাথে সাথে সামাজিক-আপোসহীনতার সমগ্র পদ্ধতিটি শুধু হ্রাসই পায়নি, বরং বুর্জোয়া সমাজের শ্রেণিমেরুকরণ বৃদ্ধি পাচ্ছে– একদিকে ব্যাপকসংখ্যক খুদে পণ্য উৎপাদক অন্তরীকৃত হচ্ছে, অন্যদিকে– উৎপাদন ও পুঁজি কেন্দ্রীভূত ও ঘনীভূত হচ্ছে গুটিকয়েক ধনগোষ্ঠীর হাতে। ("মালিকানা" ও "আয়ের ক্ষেত্রে বিপ্লব" তত্ত্ব সমালোচনায় এ মর্মে কিছু বাস্তব পরিসংখ্যান পরিবেশন করা হয়েছে)। উন্নত পুঁজিবাদী দেশে সরকারি তথ্যসমূহ, বিশেষত কর্মরত জনসংখ্যায় মজুরিশ্রমিকের অংশসম্পর্কিত সারণি ৩-এর তথ্যাবলী উপরোক্ত প্রক্রিয়ার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য যথেষ্ট। উল্লেখ্য, উন্নত দেশে জনসংখ্যার বৃদ্ধি হয়েছে যখন ২ গুণ (১৫৫ মিলিয়ন থেকে ৩১২ মিলিয়নে), তখন মেহনতি মানুষের সংখ্যা বেড়েছে ৩ গুণ (৮২ মিলিয়ন থেকে ২৫১ মিলিয়নে); আর মেহনতি মানুষের সংখ্যায় মজুরিশ্রমিকদের অনুপাত ৫৩ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৫ শতাংশে। সেইসাথে একাধারে বৃদ্ধি পেয়েছে উৎপাদনশীলতা, আর অন্যদিকে শোষণের মাত্রা (সারণি ২)। সুতরাং উৎপাদনপ্রক্রিয়ার শেষ ফল সহজবোধ্য।

[২৮] Perlo Victor, *The Unstable Economy,* (রুশ ভাষায়) পৃ. ২২৬-২২৯।

সারণি ১: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আয়, রপ্তানি, খুচরা মূল্য ও ধর্মঘটের গতিবিধি, ১৯৬৩-১৯৬৯

সাল	গতিবিধি (১৯৬২ = ১০০)			ধর্মঘটির সংখ্যা (হাজারে)
	জাতীয় আয়	রপ্তানি	ভোগ্যপণ্যের খুচরা মূল্য	
১৯৬৩	১০৪	১০৮	১০১.২	৯৪১
১৯৬৪	১১০	১২৩	১০২.৫	১৬৪০
১৯৬৫	১১৬	১২৭	১০৪.৩	১৫৫০
১৯৬৬	১২৪	১৪০	১০৭.৩	১৯৬০
১৯৬৭	১২৭	১৪৬	১১০.৩	২৮৭০
১৯৬৮	১৩৩	১৬০	১১৫.০	২৬৪৯
১৯৬৯	১৩৮	১৭৫	১২১.২	২৪৮১

উৎস: *Economic Report of the President,* 1972, January. পৃ. ২০৫, ২৪৮; Statistical Year Book, 1971, U. N., N. Y., 1972, পৃ. ৩৯০; *Statistical Abstract of the United States*, 1966,. ২৪৭; এবং 1968, পৃ. ২৪২; এবং 1971, পৃ. ২৩৭।

সারণি ২: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে শ্রমের উৎপাদনশীলতা ও উদ্বৃত্ত মূল্যের হার, ১৮৯৯-১৯৮০

	১৮৯৯	১৯০৯	১৯১৯	১৯২৯	১৯৩৯	১৯৪৭	১৯৫৫	১৯৬৫	১৯৭০	১৯৮০
উৎপাদনশীলতা (ঘণ্টাপ্রতি উৎপাদন) (১৯৬৭ = ১০০)	১৭.১	১৯.৪	২২.১	৩৮.২	৪৮.৯	৫৪.৮	৭৩.৭	৯৮.৩	১০৭.৭	১২০
উদ্বৃত্ত মূল্যের হার বা শোষণের মাত্রা	১৪৫	১৫৫	১৪৬	১৮১	১৮০	১৮২	২৩৯	৩০৯	৩৬৮	৩৮১

উৎস: নিম্নলিখিত উৎসসমূহের সহায়তায় লেখক কর্তৃক হিসাবকৃত: *The Economic Almanac. 1944-45, পৃ. ১৫৭; 1962, D. 91; Statistical Abstract of the United States* 1972, পৃ. ২৩২, ২৩৪, 634 এবং 1984, পৃ. ৬৪৮-৬৭০; S. L. Vygodsky, *Contemporary Capitalism (Experiences in Theoretical Analysis*) (রুশ ভাষায়), (Moscow, 1975), পৃ. ২৪২।

সারণি ৩: উন্নত পুঁজিবাদী দেশের কর্মরত জনসংখ্যায় মজুরিশ্রমিকের গতি-প্রকৃতি, ১৯০০-১৯৮০

	১৯০০	১৯৫০	১৯৬০	১৯৬৫	১৯৭০	১৯৭৩	১৯৮০
কর্মরত মানুষের সংখ্যা (মিলিয়নে)	১৫৫						৩১২
মেহনতি মানুষের সংখ্যা (মিলিয়নে)	৮২	১৬৩	১৯০	২১০	২২৫	২৩৫	২৫১
মজুরিশ্রমিকের সংখ্যা (মিলিয়নে)	৪৩	১১২	১৩৯	১৬০	১৭৬	১৮৮	২১৩
মেহনতি মানুষের সংখ্যায় মজুরি-শ্রমশক্তির অংশ (শতাংশ)	৫৩	৬৯	৭৩	৭৬	৭৮	৮০	৮৫

উৎস: *World Economy and International Relations* (রুশ ভাষায়); Moscow, 1970, No. 7, পৃ. ১৫২, ১৫৪ এবং 1975, No. 2, পৃ. ১৪৭; N. Betorussov, *An Analysis of Labor-Force Statistics,* (রুশ ভাষায়), *(Moscow, 1982), পৃ.* ৭৬।

আসলে বুর্জোয়া সমাজবিকাশের দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়াটিই এমন যে, মোট সামাজিক উৎপাদের (GNP) সম্প্রসারিত পুনরুৎপাদনের সাথে সাথে সরাসরি অথবা অসরাসরিভাবে পুঁজিবাদের শ্রেণি অসঙ্গতিটিও সম্প্রসারিত হারে পুনরুৎপাদিত হচ্ছে। আমেরিকান অর্থনীতির বাণিজ্যচক্রের অপেক্ষাকৃত উত্তম সময়ের তথ্য দিয়েও এ সত্যটি প্রমাণ করা সম্ভব। সারণি ১ থেকে দেখা যায় যে, ১৯৬২-৬৯ সময়কালে মোট সামাজিক উৎপাদন ও রপ্তানি ক্রমাগত হারে বৃদ্ধি পেয়েছে (বলা যেতে পারে Steady Growth পর্ব, যথাক্রমে ১.৩৮ ও ১.৭৫ গুণ) অথচ একই সময়ে ভোগ্যদ্রব্যের খুচরামূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে (১.২১ গুণ), সেই সাথে বৃদ্ধি পেয়েছে ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা (সাড়ে ৯ লক্ষ থেকে প্রায় ২৫ লক্ষ)।

কেন? আমাদের হিসাব অনুযায়ী, ১৯৬২-৬৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ভোগ্যপণ্যের খুচরা মূল্যের সাথে ধর্মঘটির উঁচু মাত্রার সহসম্পর্ক লক্ষণীয় (০.৭৯) এবং রিগ্রেশন রেখাটি হলো (− ৭৭৩.৩৬ + ৯.৪২ খ) অর্থাৎ ১ একক মূল্যবৃদ্ধির ফলে ৯.৪২ একক ধর্মঘটি বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ বিভিন্ন শিল্পসেক্টরে অর্থমজুরির প্রবৃদ্ধির হারের তুলনায় নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির হারটি ছিল উচ্চমাত্রার! আর তাই ধর্মঘটের বিভিন্ন কারণের অর্ধেকটাই হলো মজুরিসংক্রান্ত (অন্যান্য কারণ: চাকরিচ্যুতকরণ, ট্রেড ইউনিয়ন প্রশ্নাবলী, শ্রমিকের একাত্মতাবোধ, শ্রমসময়, শ্রমের পরিবেশ ইত্যাদি– দেখুন সারণি ৪)।

সারণি ৪: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ধর্মঘটের প্রধান কারণসমূহ (শতকরা হিসাবে)

সাল	মজুরি	শ্রমসময়	চাকরিচ্যুতকরণ	শ্রমের শর্ত	ট্রেড ইউনিয়ন	ধর্মঘটে একাত্মতা	অন্যান্য
১৯৬১	৪৫.৫	২.২	১২.৮	৩০.০	৫.১	১.৪	৩.০
১৯৬৬	৪৫.৬	১.৩	১৭.৬	২৮.৭	৫.৯	০.৮	০.২
১৯৭১	৫১.৮	১.০	২২.৯	১৬.২	৬.৩	১.৭	০.১

উৎস: *Problems of Peace and Socialism, 1973, No-4, c.93. (রুশ ভাষায়)।*

বুর্জোয়া সমাজে শ্রেণিমেরুকরণের অন্য দিকটি হলো– উৎপাদন ও সঞ্চালনের উপায়সমূহ অধিকতর হারে বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজির মালিকানাধীনে ঘনীভূত হওয়া। যুক্তরাষ্ট্রে ১৯০৯ সালে যখন বৃহৎ কোম্পানিসমূহের মাত্র ১.১ শতাংশের মালিকানাধীনে ছিল ৪৩.৮ শতাংশ শিল্পোৎপাদন, ১৯৭০ সালে তখন উল্লিখিত কোম্পানিসমূহের ০.০৫ শতাংশের (যাদের সম্পদের পরিমাণ কমপক্ষে ১ বিলিয়ন ডলার ও অধিক) মালিকানায় ছিল সমগ্র দেশের ৪৮ শতাংশ সম্পদ এবং ৫৩ শতাংশ মুনাফা।[২৯] ইদানীং-এর পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, ১৯৭৬ সালে আমেরিকার সর্বোচ্চ ধনী ১ শতাংশের মালিকানায় ছিল মোট ব্যক্তিগত সম্পদের (Personal Wealth) ১৮ শতাংশ, অর্থাৎ সর্বমোট ১,০৩২ বিলিয়ন ডলার (১৯৬২ সালের পরিসংখ্যানে যেটার পরিমাণ ছিল ৫৪৮ বিলিয়ন ডলার)[৩০]। যুক্তরাষ্ট্রের প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে পুঁজি ঘনীভবনের পরিমাণ ১৯৭০ সালে ১৯০৯ সালের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে ২২ গুণেরও বেশি।[৩১] এই শিল্পে সর্বোচ্চ পুঁজিসংবলিত মালিকদের অবস্থানে যথেষ্ট পরিবর্তন লক্ষণীয়। যেমন ১০ মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত পুঁজির মালিকেরা ১৯৬০ সালে এই শিল্পগ্রুপের মোট পুঁজির ১৯ শতাংশ এবং মোট নিট মুনাফার ১২ শতাংশের মালিক ছিল; অথচ ১৯৭০ সালে সূচকসমূহ যথাক্রমে ১৩ শতাংশ এবং ৯ শতাংশ। অন্যদিকে ১০০ মিলিয়ন ও তার বেশি ডলার পুঁজির মালিকেরা ১৯৬০ সালে এই শিল্পগ্রুপের মোট পুঁজির ২৭ শতাংশ এবং নিট মুনাফার ৩৮ শতাংশের মালিক; অথচ ১৯৭০ সালে উল্লিখিত সূচকসমূহের মান হলো যথাক্রমে ৪৮ শতাংশ ও ৫৩ শতাংশ (দেখুন সারণি ৫)। আবার কর্পোরেশনের

[২৯] S.L. Vygodsky, Contemporary Capitalism, (Moscow, 1975) (রুশ ভাষায়), পৃ. ১২।

[৩০] *Statistical Abstract of the United State*s, 1984, পৃ. ৪৮১।

[৩১] S. L. Vygodsky, Contemporary Capitalism, (Moscow (রুশ ভাষায়), 1975), পৃ. ৩৬।

মুনাফাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেমন হিসাব কষে দেখা গেছে, ১৯২৪-২৮, ১৯৫৬-৬০, ১৯৬৬-৭০, ১৯৭৪-৭৫, ১৯৭৬-৮০ সালে বাৎসরিক গড় নিট মুনাফা (ট্যাক্স বাদ দেওয়ার পর) যথাক্রমে ৮, ২৪, ২৫, ৪৫, ৪৩ ও ১৩৭ বিলিয়ন ডলার।[৩২] এতদুপরি একচেটিয়া পুঁজির মালিকেরা অন্যদের তুলনায় অধিক হারে মুনাফা লুটছেন, অর্থাৎ প্রথমোক্তরা শেষোক্তদের তুলনায় শ্রমশক্তিকে অধিক হারে শোষণ করছেন (দেখুন সারণি ৬)।

সারণি ৫: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প-কর্পোরেশনের সংখ্যা, পুঁজি ও নিট মুনাফা: ১৯৬০, ১৯৭০*

	শ্রেণিবিভাগ (মূলধনের পরিমাণ)		
	সর্বমোট	১০ মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত	১০০ মিলিয়ন ডলার এবং তদূর্ধ্ব
১৯৬০			
১. কর্পোরেশনের সংখ্যা	১৫৫,৯৭০	১৫৪,০০০	২৮
মোট সংখ্যার শতাংশ	১০০	৯৮.৭	০,০০৮
২. মোট পুঁজি (মিলিয়ন ডলার)	২৫১,৩১৪	৪৬৬,০৯	৬৯০১১
মোট পুঁজির শতাংশ	১০০	১৯	২৭
৩. মোট নিট মুনাফা* (মিলিয়ন ডলার)	৪২২০	৪৯৭	১৫৯৮
মোট নিট মুনাফার শতাংশ	১০০	১২	৩৮
১৯৭০			
১. কর্পোরেশনের সংখ্যা	২০২,৭১০	২০০,০০০	১০২
মোট পুঁজির শতাংশ	১০০	৯৮.৬	০,০৫
২. মোট পুঁজি (মিলিয়ন ডলার)	৫৫৪,০৪৬	৬৯৩,৭৫	২৬৭,৭৩৩
মোট পুঁজির শতাংশ	১০০	১৩	৪৮
৩. মোট নিট মুনাফা (মিলিয়ন ডলার)	৬,৮৯৮	৬১২	৩৬৪৫
মোট নিট মুনাফার শতাংশ	১০০	৯	৫৩

উৎস: *Statistical Abstract of the United States*, 1971, পৃ. ৪৬৭।

* after deduction of tax and interest paid

[৩২] *Statistical Abstract of the United States*, 1934, পৃ. ১৭২ এবং 1984, পৃ. ৫৪৮; Economic Report of the President 1974, February, পৃ. ৩৩৫।

সারণি ৬: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে একচেটিয়া ও অ-একচেটিয়া পুঁজির মুনাফার হার, ১৯৪৮-১৯৭০

কোম্পানি আয়তন (শেয়ারপুঁজির মাপকাঠিতে)	১৯৪৮	১৮৫৮	১৯৬০	১৯৭০
১ মিলিয়ন আয়তন পর্যন্ত	২৮.০	১৬.৬	১১.৭	১০.৪
১০০ মিলিয়ন থেকে তদূর্ধ্বে	২৬.৮	২৭.৩	২১.৯	২৪.৩

উৎস: "*Economic Report of the President*, 1971", Quarterly Financial Report for Manufacturing Corporations" for the coresponding dates.

বুর্জোয়া সমাজে বৈজ্ঞানিক-কারিগরি প্রগতির সাথে সাথে ক্ষুদ্র ও মাঝারি পুঁজিপতিরা উৎপাদনের উপায়ের মালিকানা থেকে অধিক হারে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। সরকারি উৎসের ভিত্তিতে প্রস্তুত ছক ৬-এর তথ্যাবলী তা-ই প্রমাণ করে। যুক্তরাষ্ট্রে শিল্প ও বাণিজ্য কোম্পানিগুলোর বাৎসরিক দেউলিয়াত্বের সংখ্যা গড়ে ১০ হাজারের অধিক। আর অর্থনৈতিক সংকটকালে এই সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। শুধু সংখ্যা বা পরিমাণগত দিক থেকেই নয়, আকারের দিক থেকেও দেউলিয়াত্ব ক্রমবর্ধমান। ১৯৪৬-৫০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে শিল্প ও বাণিজ্য কোম্পানিগুলোর বাৎসরিক গড় দেউলিয়াত্ব ছিল ২১৩ মিলিয়ন ডলার, ১৯৬৬ সালে তার পরিমাণ ১,৩২৪ মিলিয়ন ডলার, আর ১৯৭৫-এ ১,৯৯০ মিলিয়ন ডলার।[৩৩] এমতাবস্থায় "মালিকানা ও আয়ের ক্ষেত্রে বিপ্লবের ফলে পশ্চিমা সমাজ বিরাট একটি মধ্যশ্রেণিতে রূপান্তরিত হচ্ছে" –তত্ত্বটি নিছক বুর্জোয়া তত্ত্বমাত্র, যার মূল উদ্দেশ্য পুঁজিবাদের সহজাত ধর্মোদ্ভূত মনুষ্যবিচ্ছিন্নতাকে অস্বীকার করা অর্থাৎ তত্ত্বগতভাবে সেটাকেই মিথ্যা প্রমাণ করা, যা পুঁজিবাদী দেশে সরকারি পরিসংখ্যানুযায়ী সত্য বলে স্বীকৃত। এটা অর্বাচীন অর্থনৈতিক চিন্তা (vulgar economic thinking) ছাড়া আর কি?

মার্কসীয় অর্থনীতি বহুকাল আগেই বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে প্রমাণ করেছে যে, পুঁজিবাদে কারিগরি উন্নতি পুঁজিপতির সস্তা মূল্যে শিশু ও মহিলা শ্রমশক্তি ক্রয়ের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। সেইসাথে সৃষ্টি হয় "অতিরিক্ত মানুষ", আপেক্ষিক জনসংখ্যাধিক্য– বেকারত্ব ও অধিক উৎপাদনজনিত সংকট। অর্থনৈতিক সংকট ও শিল্পোৎপাদনে স্থিরাবস্থা আরো অধিক হারে খুদে পণ্য উৎপাদকদের মালিকানাচ্যুত করে, আরো অধিক মাত্রায় মজুরিশ্রমকে পুঁজির ওপর নির্ভর করে তোলে, আরো

[৩৩] *Statistical Abstract of the United State*s, 1972, পৃ. ৪৮৫, 1977, পৃ. ২৯৫-২৯৮।

ছক ৬: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিল্প ও বাণিজ্য কোম্পানিসমূহের বাৎসরিক দেউলিয়াত্বের সংখ্যা (হাজারে), ১৯৫০-১৯৮০

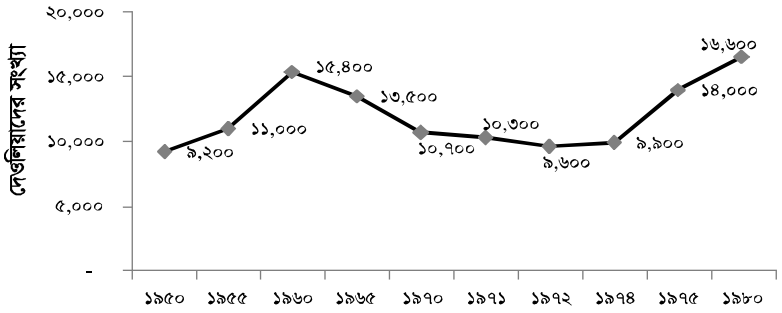

উৎস: Statistical Abstract of the United States, ১৯৭২; পৃ ৪৮৫; ১৯৭৩, ১৯৭৬, পৃ. ৪০২; Survey of Current Business, July ১৯৭৫, পৃ. ৫-৭।

* ভিগোদস্কি পদ্ধতিতে লেখক কর্তৃক হিসাবকৃত।

দ্রুতগতিতে শ্রমজীবী মানুষের আপেক্ষিক ও সামগ্রিক দারিদ্র্য বৃদ্ধি করে। আধুনিক বুর্জোয়া অর্থনীতি চিন্তার অন্যতম ধারক জোয়ান রবিনসনও মার্কসবাদের উপরোক্ত চিন্তাকে সমর্থন করেছেন এবং আমেরিকান অর্থনীতি সমিতির বাৎসরিক সম্মেলনে (১৯৭১) বলেছেন, "অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আপেক্ষিক দারিদ্র্য দূরীকরণেই শুধু অক্ষম নয়, বরং সামগ্রিক দারিদ্র্য বৃদ্ধির দিকে ধাবমান। ... ... ক্রমাগত অধিকসংখ্যক পরিবার নিচের দিকে নামছে। জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির সাথে সামগ্রিক দারিদ্র্যও বৃদ্ধি পাচ্ছে।"[৩৪] বাস্তব তথ্য রবিনসনকে সমর্থন দেয়। সারণি ৭-এ প্রদত্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আমেরিকায় ১৯৭২ সালে যখন ২৪.৫ মিলিয়ন মানুষ অথবা জনসংখ্যার ১১.৯ শতাংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করত, তখন ১৯৮২ সালে তাদের সংখ্যা ৩৪.৪ মিলিয়ন অথবা জনসংখ্যার ১৫ শতাংশ। আবার সাদাদের তুলনায় কালোদের (অর্থাৎ ভদ্র ভাষায় কৃষ্ণাঙ্গদের) মধ্যে দারিদ্র্যের আপেক্ষিক হার প্রায় তিনগুণ বেশি (১৯৮২ সালে মোট কৃষ্ণাঙ্গ জনসংখ্যার প্রায় ৩৬ শতাংশ)। সেইসাথে ১৬ বৎসরের নিম্নে ও ৪৫ বৎসরের উর্ধ্বে যাদের বয়স সেসব "অতিরিক্ত মানুষ"ই হলো দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থানরতদের ৬০ শতাংশ। এটির সাথে জনসংখ্যা পিরামিডের বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই।

[৩৪] *The American Economic Review*, May 1972, পৃ. ৭।

সারণি ৭: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দারিদ্র্যসীমা ও ১২৫ শতাংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থানরত জনসংখ্যা, ১৯৭২-১৯৮২

সাল	দারিদ্র্যসীমার নিচের জনসংখ্যা (মিলিয়ন)			দারিদ্র্যসীমার নিচের শতাংশ			দারিদ্র্যসীমার ১২৫ শতাংশ নিচের সংখ্যা		দারিদ্র্যসীমার ১২৫ শতাংশ নিচে অবস্থানরত পরিবারের (৪ জনের) গড় আয় (ডলার)
	সব বর্ণের	শ্বেতাঙ্গ	কৃষ্ণাঙ্গ	সব বর্ণের	শ্বেতাঙ্গ	কৃষ্ণাঙ্গ	মোট জনসংখ্যার শতাংশ	শ্বেতাঙ্গ	
১৯৭২	২৪.৫	১৬.২	৭.৭	১১.৯	৯.০	৩৩.৩	৩৪.৭	১৬.৮	৫,৫০০
১৯৭৩	২৩.০	১৫.১	৭.৪	১১.১	৮.৪	৩১.৪	৩২.৮	১৫.৮	৫,৬৭৫
১৯৭৪	২৩.৪	১৫.৭	৭.২	১১.২	৮.৬	৩০.৩	৩৩.৭	১৬.১	৬,২৯৮
১৯৭৫	২৫.৯	১৭.৮	৭.৫	১২.৩	৯.৭	৩১.৩	৩৭.২	১৭.৬	৬,৮৭৫
১৯৭৬	২৫.০	১৬.৭	৭.৬	১১.৮	৯.১	৩১.১	৩৫.৫	১৬.৭	৭,২৬৯
১৯৭৭	২৪.৭	১৬.৪	৭.৭	১১.৬	৮.৯	৩১.৩	৩৫.৭	১৬.৭	৭,৭৩৯
১৯৭৮	২৪.৫	১৬.৩	৭.৬	১১.৪	৮.৭	৩০.৬	৩৪.২	১৫.৮	৮,৩২৮
১৯৭৯	২৬.১	১৭.২	৮.১	১১.৭	৯.০	৩১.০	৩৬.৬	১৬.৪	৯,২৬৮
১৯৮০	২৯.৩	১৯.৭	৮.৬	১৩.০	১০.২	৩২.৫	৪০.৭	১৮.১	১০,৫১৮
১৯৮১	৩১.৮	২১.৬	৯.২	১৪.০	১১.১	৩৪.২	৪৩.৭	১৯.৩	১১,৬০৯
১৯৮২	৩৪.৪	২৩.৫	৯.৭	১৫.০	১২.০	৩৫.৬	৪৬.৫	২০.৩	১২,৩২৮

উৎস: *Statistical Abstract of the United States*, পৃ. ৪৭১।

বৈজ্ঞানিক-কারিগরি বিকাশের সাথে সাথে জৈবিক গঠনে পরিবর্তনশীল পুঁজির তুলনায় ধ্রুব পুঁজির (অর্থাৎ constant capital-এর) পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর অর্থ, "যে পুঁজিকে সম্প্রসারিত করছে মজুরি-শ্রম সেই পুঁজিই ক্রমবর্ধমান হারে মজুরিশ্রমিককে কারখানার বাইরে খেদিয়ে দিচ্ছে।" সৃষ্টি হচ্ছে চরম বিচ্ছিন্নতা। এই চরম বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি পুঁজিপতির ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভর নয়, এটা পুঁজির স্বাভাবিক ধর্ম– আরো, আরো, আরো মুনাফা থেকেই এর উৎপত্তি। এই চরম বিচ্ছিন্নতা– যার গতি-প্রকৃতি দেখানো হয়েছে ৮ নম্বর সারণিতে (অবশ্য প্রকৃত ঝোঁক সম্ভবত আরো বেশি বেদনাদায়ক; কারণ, সারণি তৈরি হয়েছে শুধু সরকারি তথ্যের ভিত্তিতে)– শুধু পুঁজি কর্তৃক শ্রমকে পদদলিত করার মাধ্যমই নয়, সেইসাথে বর্ণশোষণেরও অন্যতম মাধ্যম। উদাহরণস্বরূপ যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৮২ সালে মোট শ্রমশক্তির ৯.৭ শতাংশ এবং কৃষ্ণাঙ্গ মেহনতিদের ১৮ শতাংশ ছিল বেকারত্বের অভিশাপে অভিশপ্ত।[৩৫]

সারণি ৮: কয়েকটি উন্নত পুঁজিবাদী দেশে বেকারত্বের গতি-প্রকৃতি (উপরের সংখ্যা হাজারে, নিচের সংখ্যা শ্রমশক্তির শতাংশে)

সাল	যুক্তরাষ্ট্র	যুক্তরাজ্য	ফ্রান্স	পশ্চিম জার্মানি	জাপান
১৯৭৩	৪৩০৪	৬১৯	৩৯.৪	২৭৪	৬৮০
	৪.৯	২.৭	২.৮	১.২	১.৩
১৯৭৪	৫০৭৬	৬১৫	৪৯৮	৫৮৩	৭৩০
	৫.৬	২.৬	৩.০	২.৬	১.৪
১৯৭৫	৭৮৩০	৯৭৮	৮৪০	১০৭৪	১১০০
	৮.৬	৪.১	৪.৩	৪.৭	১.৯
১৯৭৬	৭২৮৮	১৩৫৯	৯৩৪	১০৬০	১০৮০
	৭.৭	৫.৭	৪.৭	০.৬	২.০
১৯৭৭	৬৮৫৫	১৪৮৪	১০৭২	১০৩০	১১০০
	৭.০	৬.২	৫.০	৪.৫	২.০
১৯৭৮	৬০৪৭	১৪৭৫	১১৬৭	৯৯৩	১২৪০
	৬.০	৬.১	৫.৪	৪.৩	২.২
১৯৭৯	৫৯৬৩	১৩৯০	১৩৫০	৮৬৭	১১৭০
	৫.৮	৫.৭	৬.২	৩.৮	২.১
১৯৮০	৭৪৪৮	১৫৭০	১৪৫০	৮৯০	১১৪০
	৭.১	৬.৯	৬.৪	৩.৪	২.০

উৎস: *U. N. Monthly Buleltin of Statistics, XII,* 1980; Economic Report of the President, 1981, পৃ. ৩৫৪, Main Economic Indicators, III.

[৩৫] *Statistical Abstract of the United State*s, 1984, পৃ. ৪০৪।

পুঁজিবাদী বিচ্ছিন্নতা শুধু পুঁজিবাদী বিশ্বের আর্থসামাজিক ব্যবস্থাকেই গ্রাস করেনি, ততোধিক গ্রাস করছে আন্তর্জাতিক পুঁজির প্রান্ত (পেরিফেরি)– উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতিকেও। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) হিসাবানুযায়ী উন্নয়নশীল দেশে বেকারত্ব ক্রমবর্ধমান। সারণি ৯-এর তথ্যানুযায়ী ১৯৭৭ সালে উন্নয়নশীল দেশের ৫ শতাংশ কর্মক্ষম জনসংখ্যা অর্থাৎ ৪০ মিলিয়ন মানুষ পূর্ণ বেকার এবং অতিরিক্ত ৪০ শতাংশ অর্থাৎ ২৯০ মিলিয়ন মানুষ আংশিক বেকার। এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় এই বেকারদের ৮০ শতাংশ গ্রামে বসবাস করে। এই প্রক্রিয়াকে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা "স্থায়ী কৃষি জনসংখ্যাধিক" হিসেবে অভিহিত করে থাকে।

সারণি ৯: উন্নয়নশীল দেশে বেকারত্ব (মিলিয়ন মানুষ)

	১৯৭৫			১৯৭৭		
	পূর্ণ বেকার	আংশিক বেকার	মোট	পূর্ণ বেকার	আংশিক বেকার	মোট
মোট	৩৩	২৫০	২৮৩	৪০	২৯১	৩৩১
তন্মধ্যে এশিয়ায়	১৮	১৬৮	১৮৬	২০	১৮৯	২৪৯
আফ্রিকায়	১০	৫৩	৬৩	১২	৬৩	৭৫
ল্যাটিন আমেরিকায়	৫	২৮	৩৩	৮	৩৯	৪৭

উৎস: আইএলও

উন্নয়নশীল দেশের প্রতি উন্নত পুঁজিবাদী দেশের বিনিয়োগ আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পাবে। অনেকে এই প্রক্রিয়াকে উন্নয়নশীল দেশে বেকারত্ব হ্রাসকল্পে বিনিয়োগ হিসেবে অভিহিত করে থাকেন।[৩৬] আসলে বক্তব্যটি সঠিক নয়। উন্নত পুঁজিবাদী দেশ উন্নয়নশীল দেশে বিনিয়োগ করবে ততক্ষণ, যতক্ষণ বিনিয়োজিত পুঁজি মুনাফা প্রাপ্তিকে গ্যারান্টি দেবে এবং মুনাফার হারটি চড়া হবে। উদাহরণস্বরূপ সারণি ১০-এ দেখা যায় যে, ১৯৫১-৭০ সালে উন্নয়নশীল দেশে বিনিয়োজিত পুঁজি আমেরিকার পুঁজিপতির নিজ দেশসহ গড় বিনিয়োগের চেয়ে অধিক হারে মুনাফা প্রাপ্তির গ্যারান্টি দিয়েছে। উন্নত দেশের তুলনায় উন্নয়নশীল দেশে এই উচ্চমাত্রার বিনিয়োগ মুনাফা প্রাপ্তির প্রধান কারণগুলো হলো সম্ভবত উন্নয়নশীল দেশে পুঁজির স্বল্পতা, ভূমির তুলনামূলক স্বল্প মূল্য, স্বল্প মজুরি, কাঁচামালের স্বল্প মূল্য ইত্যাদি।

[৩৬] Lipermann, *Investement in the Less developed Nations,* (New York, 1983), পৃ. ৬৮।

সারণি ১০: বিশ্বে নিয়োজিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় বেসরকারি বিনিয়োগ ও মুনাফার সম্পর্ক, ১৯৫১-১৯৭০

	১৯৫১		১৯৬০		১৯৭০	
	মিলিয়ন ডলার	বিনিয়োগের তুলনায় মুনাফা (শতকরা)	মিলিয়ন ডলার	বিনিয়োগের তুলনায় মুনাফা (শতকরা)	মিলিয়ন ডলার	বিনিয়োগের তুলনায় মুনাফা (শতকরা)
সারা বিশ্ব						
ক. বিনিয়োগ	১১,৭৮৮		২৯,৮২৭		৭৮.১	
		১৯		১১.৯		১১.৪
খ. **মুনাফা**	২,২৩৬		৩,৫৪৬		৮.৭	
উন্নয়নশীল দেশ						
ক. বিনিয়োগ	৫,৭৫১		১১,৫৫৩		২১.৪	
		২৩.১		১৫.৭		১৭.৩
খ. মুনাফা	১,৩২৫		১,৮১৫		৩.৭	

উৎস: International Economy and International Relations (রুশ ভাষায়), Moscow, 1969, No. 2, পৃ. ১৫৩; 1972, No. 6, পৃ. ১৫৪।

"আধিপত্যের এক শতাব্দী পূর্ণ হতে না হতেই, বুর্জোয়া শ্রেণি যে উৎপাদিকা শক্তির সৃষ্টি করেছে, তা অতীতের সব যুগের সমষ্টিগত উৎপাদিকা শক্তির চেয়েও বিশাল ও অতিকায়।"[৩৭] নিঃসন্দেহে পুঁজিবাদ বৈজ্ঞানিক কারিগরি প্রগতিকে ত্বরান্বিত করেছে এবং করছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো কতটুকু ও কার স্বার্থে? মার্কস স্পষ্টভাবে বলেছেন, "মেহনতি মানুষ বাঁচতে পারে যতক্ষণ কাজ জোটে; আর কাজ জোটে শুধু ততক্ষণ, যতক্ষণ তাদের পরিশ্রমে পুঁজি বাড়তে থাকে।"[৩৮] (স্মরণ করুন– ৩০০ শতাংশ মুনাফা পেলে পুঁজি কী করে? নিঃসন্দেহে যুদ্ধাস্ত্র প্রস্তুতের দিকে ধাবিত হয়। এবং/অথবা পৃথিবীর তাবৎ সম্পদের ওপর একচ্ছত্র মালিকানা ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়)।

সারণি ৮-এ সন্নিবেশিত তথ্য থেকে কি পরিষ্কার নয় যে, পুঁজিবাদে "নিকৃষ্ট মানের মানুষের" সংখ্যা ব্যাপক আকৃতি ধারণ করছে এবং সে (পুঁজিবাদ) বৈজ্ঞানিক-কারিগরি বিপ্লবের আধুনিক অবদানসমূহের উৎপাদনে প্রয়োগ পুঁজিবাদী অর্থনীতির

[৩৭] মার্কস ও এঙ্গেলস, "কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার", পৃ ৩৮।
[৩৮] মার্কস ও এঙ্গেলস, "কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার", পৃ ৩৯।

সংকট-প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করছে এবং ফলশ্রুতিতে মেহনতি মানুষের দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমগ্র ব্যাপারটা আবারও মার্কস-এঙ্গেলসের ভবিষ্যৎ চিন্তার সত্যতা প্রমাণ করছে যে, "যে অস্ত্রে বুর্জোয়া শ্রেণি সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধূলিস্মাৎ করেছিল সেই অস্ত্র আজ তাদেরই বিরুদ্ধে উদ্যত।"[৩৯]

বুর্জোয়া সমাজের শ্রেণিদ্বন্দ্বের প্রকটতা, শ্রমিকশ্রেণির অবস্থার দ্রুতাবনতি শ্রমিকশ্রেণিকে অধিকতর বিপ্লবী করে তুলেছে; অধিকতর হারে পুঁজির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম করতে বাধ্য করেছে। এমনকি বুর্জোয়া পরিসংখ্যান তথ্য-উপাত্তও প্রমাণ করে যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে উন্নত পুঁজিবাদী দেশসমূহে ধর্মঘট ও ধর্মঘটির সংখ্যা ও ধর্মঘটে অপচয়কৃত শ্রমদিন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে (দেখুন সারণি ১১)। ধর্মঘটের সংখ্যা, তার কারণ, গুণ ও সারার্থ (বিশ্লেষণ করুন, সারণি ২, ৩, ৪, ৮, ৯-এর তথ্যাদি)– এসব সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া "উচ্ছেদকারীর উচ্ছেদের" (expropriation of the expropriators) পূর্বলক্ষণ নয় কি?

সারণি ১১: প্রধান পুঁজিবাদী দেশসমূহে ধর্মঘট (উল্লিখিত বছরসমূহের গড়)

	১৯৬৫-৬৮	১৯৬৮-৭৩	১৯৭৩-৭৯
ধর্মঘটের সংখ্যা			
যুক্তরাষ্ট্র	৪,৪৭১	৫,৩৮২	৫,২৫১
যুক্তরাজ্য	২,২২৩	২,৯১৭	২,৪০৭
ফ্রান্স	১,৬৭৩	৩,৬৯০	৩,৭২৪
জাপান	১,৪৪৭	২,৪৭৯	২,৯১০
ধর্মঘটে অপচয়কৃত শ্রমদিন (হাজারে)			
যুক্তরাষ্ট্র	২,০৫৩	৩,১৪৬	২,০৪৭
যুক্তরাজ্য	১,৬৪৭	২,০৪৫	১,৬১১
ফ্রান্স	২,২৮৯	২,১৬১	২,৮৭৬
জাপান	১,৩২৬	৩,২০৫	৩,৫৪৯
ধর্মঘটে অপচয়কৃত শ্রমদিন (হাজারে)			
যুক্তরাষ্ট্র	৩২,৫৭৩	৫১,৭৮৮	৩৭,৩৩১
যুক্তরাজ্য	৩,৩৩৮	১৫,৪৪৫	১২,১১৮
ফ্রান্স	১,৭৫২	৩,২০৫	৩,৫৪৯
জাপান	৩,৭৫১	৪,৬৬৬	৪,৭৬১

উৎস: লেখককর্তৃক হিসাবকৃত। হিসাবের ভিত্তি "Economic Conditions of Capitialist and Developing Countries", appended in *World Economy and International Relations,* for the corresponding years.

[৩৯] মার্কস ও এঙ্গেলস, "কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার", পৃ ৩৯।

মার্কস "পুঁজি" গ্রন্থে পুঁজিবাদে মনুষ্যবিচ্ছিন্নতার কারণ-পরিণামসম্পর্ক বিশ্লেষণ করে তত্ত্বগতভাবে সেই বিপ্লবী উপসংহারে উপনীত হলেন– যা পরবর্তী সময়ে ঐতিহাসিক সত্যে পরিণত হয়েছে। মার্কস "পুঁজি সঞ্চয়ন প্রক্রিয়া" বিশ্লেষণ করে বললেন, "একচেটিয়া পুঁজি সেই উৎপাদন পদ্ধতির শৃঙ্খলে পরিণত হচ্ছে, যে তার জন্মদাতা এবং যার ভেতরে সে বিকাশ লাভ করছে। উৎপাদনের উপায়ের কেন্দ্রীভবন ও শ্রমের সামাজিকীকরণ সেই বিন্দুতে উপনীত হয়, যখন তারা পুঁজিবাদী আবরণের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ হয়ে ওঠে, তখন তার বিস্ফোরণ ঘটে। পুঁজিবাদী ব্যক্তিমালিকানার মৃত্যুঘণ্টা ধ্বনিত হয়। উচ্ছেদকর্তা উচ্ছেদিত হয়।"[৪০]

ঙ. উপসংহার

পুঁজিবাদ তার সর্বোচ্চ স্তর সাম্রাজ্যবাদে উত্তরণের প্রাথমিক পর্যায়ে, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বিশ্ব পুঁজিবাদী শ্রমবিভাগের একচ্ছত্রতা দূরীকরণ এবং উত্তরোত্তর তার শক্তি হ্রাস (সারণি ১০ ও ১১-এর তথ্যাবলী দেখুন); দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক শ্রমবিভাগের উদ্ভব ও উত্তরোত্তর তার শক্তি বৃদ্ধি এবং উন্নয়নশীল দেশের ব্যাপকাংশের উপনিবেশমুক্তি ও জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের উত্তরোত্তর অধিকতর বিপ্লবী শক্তিতে রূপান্তর (যার সংশ্লেষিত প্রতিচ্ছবি দেখানো হয়েছে ১২ নম্বর সারণিতে)– সভ্যতার বিকাশে এগুলো শ্রেণিবিভক্ত সমাজে "উচ্ছেদকর্তার উচ্ছেদের" এবং তার শ্রেণীহীন সমাজে উত্তরণের সবচেয়ে সুস্পষ্ট সংশ্লেষিত বহিঃপ্রকাশ নয় কি? সুতরাং সভ্যতার অতীত ও বর্তমান ইতিহাস এবং সেই সাথে ভবিষ্যতের প্রবণতা শ্রেণিবিভক্ত সমাজের শ্রেণিহীন সমাজে উত্তরণের অবশ্যম্ভাবিতার মার্কসীয় তত্ত্বকে অকাট্য প্রতিপন্ন করে।

বৈজ্ঞানিক-কারিগরি প্রগতির প্রভাববলয়ে বিকাশমান আধুনিক পুঁজিবাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বসমূহের বিকাশসম্পর্কিত ব্যাপক তথ্য প্রমাণ করে যে,

১. পুঁজিবাদী বিশ্বের সাধারণ সংকটের সাথে সাথে বুর্জোয়া অর্থনীতি চিন্তার সব ধারাই আজ চরম দেউলিয়াগ্রস্ত।
২. পুঁজিবাদের আওতাধীনে বৈজ্ঞানিক-কারিগরি বিপ্লবের অবদানসমূহ প্রয়োগ করে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার দ্বন্দ্বসমূহ দূরীকরণ অসম্ভব।

[৪০] K. Marx, *Capital*, vol. 1, part VIII.

সারণি ১২: পৃথিবীর সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশের গতি-প্রকৃতি (সমগ্র পৃথিবীর শতাংশ), ১৯১৭-১৯৮২

	সাল	উন্নত পুঁজিবাদ দেশ	সমাজতান্ত্রিক দেশ	উন্নয়নশীল দেশ
	১৯১৭	৮৪*	১৬.০	-
	১৯৪০	৮৩.৫*	১৬.৫	-
আয়তন	১৯৫০	২৪	২৫.৯	৫০.১
	১৯৭৮	২৪	২৬.২	৪৮.৯
	১৯৮২	২২	২৭.০	৫১.০
	১৯১৭	৯২.৩*	৭.৭	-
	১৯৪০	৯২.২*	৭.৮	-
জনসংখ্যা	১৯৫০	২২.৪	৩৫.৪	৪২.৬
	১৯৭৮	১৮.০	৩৩.১	৪৯.৮
	১৯৮২	১৭.০	৩২.০	৫১.০
	১৯১৭	৯৭**	২.৯	-
	১৯৪০	৯০**	১০.০	-
শিল্পোৎপাদন	১৯৫০	৭৩.৭	২০.০	৬.৩
	১৯৭৮	৫০.৮	৪২.০	৭.২
	১৯৮২	৪৯.৫	৪২.৫	৮.০

উৎস: National Economy of USSR in 1978 (রুশ ভাষায়), Moscow 1979; USSR Statistics, 1979 (রুশ ভাষায়)।

* সমগ্র পুঁজিবাদী বিশ্ব

৩. পুঁজিবাদের সহজাত দ্বন্দ্বসমূহ নিরসনে বৈজ্ঞানিক-কারিগরি বিপ্লব নয়, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবই একমাত্র পথ।

সামাজিক বাস্তবতা প্রমাণ করে যে, মার্কসীয় অর্থনীতি চিন্তা-পদ্ধতি শুধু চিরায়ত পথে বিকাশমান অর্থনীতির জন্যই প্রযোজ্য নয়, অচিরায়ত পথে বিকাশমান অর্থনীতির জন্যও তা সমভাবে প্রযোজ্য। অর্থশাস্ত্র চিন্তার ইতিহাসে মার্কসীয় অর্থনীতি চিন্তা হলো সবচেয়ে ব্যাপক, পরিপূর্ণ, সুশৃঙ্খল, সুসংবদ্ধ, যুক্তিযুক্ত, একীভবনকৃত আশাবাদী পদ্ধতিগত বিজ্ঞান।

প্রবন্ধ ২

ইতিহাসের পদ্ধতিতাত্ত্বিক প্রশ্ন প্রসঙ্গে — একটি মার্কসীয় অবতারণা

প্রসঙ্গকথা: *এ প্রবন্ধের রচনাকাল ১৯৮৫-৮৬ এবং প্রকাশকাল ১৯৮৭ সাল। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল* ***ইতিহাস পরিষৎ পত্রিকায়*** *(একবিংশ বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা, ১৩৯৪, পৃ.৬২-৮২)। প্রবন্ধটি একই শিরোনামে বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষৎ আয়োজিত পঞ্চদশ জাতীয় ইতিহাস সম্মেলনে (২৮ জানুয়ারি ১৯৮৭) উত্থাপিত এবং সেখানে আলোচনার আলোকে পরিমার্জিত ও পুনর্লিখিত। ইতিহাস পরিষৎ পত্রিকার সম্পাদকদ্বয় (প্রয়াত) অধ্যাপক সালাউদ্দিন আহমদ ও অধ্যাপক অজয় রায় মূল প্রবন্ধটি সম্পাদনা করে চিরকৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ করেছেন। সম্পাদকদ্বয় ইংরেজি 'Methodology of History' কথাটি রূপান্তর করেছেন "ইতিহাসের পদ্ধতিতত্ত্ব" হিসেবে। এ প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু মূলত "Marxian Historiography" — ইতিহাস রচনার মার্কসীয় পদ্ধতিতত্ত্ব। যে পদ্ধতিতত্ত্বে অন্যতম অনুষঙ্গ হলো আর্থসামাজিক ব্যবস্থা ও উৎপাদন পদ্ধতির বিষয়াদি। প্রকাশিত মূল প্রবন্ধ হুবহু একই রেখে এ প্রবন্ধে দুটো পরিবর্তন করা হয়েছে: (১) বিভিন্ন অনুচ্ছেদের জন্য শিরোনাম দেওয়া হয়েছে, (২) বড় সাইজের প্যারাগ্রাফ পাঠের সুবিধার্থে একাধিক প্যারাগ্রাফে আনা হয়েছে।*

ভূমিকা

আমাদের দেশে ইতিহাসের পদ্ধতিতাত্ত্বিক বিষয়াদি (অর্থাৎ 'Methodology of History') এখন পর্যন্ত স্বল্পালোচিত ক্ষেত্র হিসেবেই বিরাজ করছে। অথচ পদ্ধতিতত্ত্বের মতো বিষয়কে যথাযথ গুরুত্ব না দেওয়া পর্যন্ত, ইতিহাসশাস্ত্র যে তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সুদৃঢ় করতে পারে না এ কথা বলাই বাহুল্য। অন্যদিকে আমাদের দেশে ইতিহাস গবেষণায় পদ্ধতিতাত্ত্বিক উপাচার যতটুকু প্রয়োগ করা হয় তার

অধিকাংশই পশ্চিমী বুর্জোয়া দর্শনাশ্রয়ী ও বিতর্কিত। আর সে ক্ষেত্রে ইতিহাস গবেষণায় প্রযোজ্য মার্কসীয় পদ্ধতিতত্ত্বের প্রয়োগ অত্যন্ত সীমিত, অথবা নেই বললেই চলে। সুতরাং উপস্থাপিত প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য হলো ইতিহাসশাস্ত্রে প্রয়োগকৃত অমার্কসীয় পদ্ধতিতত্ত্বের সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করার পাশাপাশি মার্কসীয় পদ্ধতিতত্ত্বের "গুরুত্বপূর্ণ" বিষয়াদি অবতারণা করা। এখানে "গুরত্বপূর্ণ" বিষয় বলতে এমন সব উপাদানকে বোঝানো হচ্ছে, যেগুলোর অনুপস্থিতিতে মার্কসীয় পদ্ধতিতত্ত্বের অস্তিত্ব থাকে না, এবং সেইসাথে মার্কসীয় পদ্ধতিতত্ত্বের তুলনামূলক অধিকতর বিতর্কিত বিষয়াদিও অমূল্যায়িত থেকে যায় (উল্লেখ্য, পদ্ধতিতাত্ত্বিক বিভিন্ন প্রশ্নে মার্কসবাদী ঐতিহাসিকদের মধ্যেও বিতর্ক বিদ্যমান)।

ইতিহাসের পদ্ধতিতাত্ত্বিক বিষয়াদির প্রতি গভীর মনোযোগ ছাড়া ইতিহাসতত্ত্বের পর্যায়ানুক্রমিক বিকাশ সম্ভব নয়। একাধারে ইতিহাস বিজ্ঞানের অভ্যন্তরীণ চাহিদা, অন্যদিকে সমাজের বাহ্যিক মনোযোগ ও গবেষণা উল্লিখিত দিকটির চাহিদা উত্তররোত্তর বৃদ্ধি করছে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গত কয়েক দশকে ঐতিহাসিকেরা যে বিপুল পরিমাণ নবতর ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করেছেন তার যথাযোগ্য সারসংকলন ও সাধারণীকরণ এখনো সম্ভব হয়নি বললেই চলে। আর এই বিপুল ও বহুমাত্রিক তথ্যাবলীর উপস্থিতিই তার বিজ্ঞানভিত্তিক শ্রেণিবদ্ধকরণ, ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার কাল-বিভাজন, সমাজবিকাশের সাধারণ গতিসূত্রের বিভিন্ন রূপ ও নমুনা নির্ধারণ, জনগণের সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন রূপ উদ্‌ঘাটন ইত্যাদি বিষয়ের গবেষণা অনিবার্য করে তোলে। উপরন্তু, আধুনিক যুগে সচেতন জনসাধারণের কাছেও ইতিহাস চাহিদা ক্রমবর্ধমান। কারণ "বিকাশের পথ নির্ধারণের" বিষয়টি প্রথমসারির সামাজিক প্রশ্ন। আর এ প্রশ্নোত্তরে সচেতন সামাজিক জীবমাত্রই অতিক্রান্ত পথ নিয়ে অভিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জানতে চাইবেন সভ্যতার ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার কথা, জানতে চাইবেন বর্তমানকে অতীতের প্রিজমিক-বিশ্লিষ্ট আলোকে এবং এসবের ভিত্তিতেই ভবিষ্যৎ বিকাশের ঝোঁক বা প্রবণতা সম্পর্কে পূর্ব অভিজ্ঞতা পেতে চাইবেন। অথচ মার্কসবাদী ইতিহাস ধারণার বিপরীতে অমার্কসবাদী ধারণাসমূহ সচেতন জনগোষ্ঠীর এসব চাহিদা পূরণে সক্ষম নয় (যা পরবর্তীকালে দেখানো হয়েছে)।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আর্থসামাজিক প্রক্রিয়ার "বর্ণনামূলক" প্রকাশ বুর্জোয়া ইতিহাসশাস্ত্রে এখনো নিয়ামক ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রে সামাজিক প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক প্রকাশের বিপরীতে

বিশ্লেষণাত্মক প্রকাশ নির্ধারক হয়ে উঠেছে। সেইসাথে সামাজিক বিজ্ঞানের ঐসব শাখা-প্রশাখা অধিক মাত্রায় যৌক্তিক পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এমতাবস্থায় ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক ও যৌক্তিক মূল্য বৃদ্ধির জন্য ঐতিহাসিককে ইতিহাস-প্রক্রিয়ার বর্ণনামূলক প্রকাশের তুলনায় বিশ্লেষণকে, অধিকতর গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে এমনতর প্রয়োজনীয় সাধারণীকরণের (এবং সংশ্লেষণের) দিকে এগোতে হবে যাতে করে আর্থসামাজিক বিকাশের মূর্ত (objective) সূত্রাদি উদ্‌ঘাটিত হতে পারে।

ঐতিহাসিক বিকাশ সূত্রায়ন: মার্কসীয় ও অমার্কসীয় ধারণা

ইতিহাসের মার্কসীয় দ্বন্দ্বাত্মক-বস্তুবাদী ধারণার বিপরীতে ইতিহাস চিন্তার অমার্কসীয় ধারা এ কথা প্রমাণে সচেষ্ট যে, ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার বহুমুখীনতা ও বহুমাত্রিকতা উল্লেখিত প্রক্রিয়ার একত্বের ধারণার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আর তাই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার অভ্যন্তরীণ গতিধর্মের কারণেই ইতিহাসকে কোনো সিস্টেমে বাঁধা সম্ভব নয়। অর্থাৎ এ যুক্তিতে মার্কসবাদীদের আর্থসামাজিক ব্যবস্থা বা রূপায়ণের ধারণা, যা অনুযায়ী সভ্যতার ইতিহাস হলো আর্থসামাজিক ব্যবস্থা ও তার রূপান্তরের ইতিহাস– বাস্তবসম্মত নয়। এ যুক্তিতেই অমার্কসবাদী ইতিহাস গবেষক ইতিহাসের গতিকে বক্রাকৃত বিকাশ, ঘটনার আকস্মিক মোড় পরিবর্তন ইত্যাদি নামে অভিহিত করে সাধারণ বিকাশতত্ত্বের বিপরীতে জাতিগত ঐতিহাসিক বিকাশের বিশেষত্ব এবং বিশ্ব-ঐতিহাসিক বিকাশের বিপরীতে অঞ্চলগত ঐতিহাসিক বিকাশের কথা উল্লেখ করে থাকেন।

ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বিরুদ্ধে অমার্কসীয় ইতিহাস চিন্তা নয়া-কান্টবাদ, নয়া-ধনাত্মকবাদী এগনোস্টিসিজম, অর্থনৈতিক বস্তুবাদ (বিশেষ করে প্রযুক্তিবাদ), যুদ্ধংদেহী অধ্যাত্মবাদিতা, উপাদানতত্ত্বের জগাখিঁচুড়িবাদ, নেমিরিজম, ক্লিওমেট্রিকস ও ইতিহাসের ধর্মভিত্তিক দর্শনবাদ ইত্যাদির ভিত্তিতে তথ্য বিস্ফোরণ, মডেলকরণ, সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, ক্রিয়াবাদ ও আনুবীক্ষণিক সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতির প্রয়োগ করে থাকেন।

ইদানীং ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে মতাদর্শগত সংগ্রামের অন্যতম ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে– পরিবৃত্তি-কালপর্বের ইতিহাস। কারণ এক্ষেত্রে দুটি পৃথক ঐতিহাসিক বিকাশকালের মধ্যে সীমারেখা টানতে হয়। যেমন প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ ও আধুনিক যুগের মধ্যে সীমারেখা টানার মাপকাঠি কী হবে? অথবা, দাস, সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদের মধ্যে কোন মানদণ্ড ব্যবহার করে "ঐতিহাসিক যুগ" নির্ধারণ করা যুক্তিসঙ্গত? অথবা ইদানীং যে বিষয়ে অথনীতির ইতিহাস রচনায় বহুল বিতর্ক চলছে

যে, পশ্চিমা ইউরোপে কোন শতকে পুঁজিবাদের অভ্যুদয় ঘটেছে এবং কেন (এ প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন ঐতিহাসিকের ক্ষেত্রে বিভিন্ন এবং তা যথেষ্ট যুক্তিভিত্তিক)? এসবই হলো ইতিহাসতাত্ত্বিক অভিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর অন্যতম, আর তাই মৌলিক পদ্ধতিতাত্ত্বিক বিষয়াদি।

অমার্কসবাদী ঐতিহাসিকেরা ঐতিহাসিক বিকাশের মূর্ত রূপ স্বীকার করেন না। তারা স্বীকার করেন না যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার কার্য-কারণ সম্পর্ক উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব, ঐতিহাসিক বিকাশসূত্রও তারা অস্বীকার করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা ঐতিহাসিক ঘটনা ও তথ্যের সাধারণীকরণ করেন না, কারণ সেক্ষেত্রে শেষপর্যন্ত বৈপ্লবিক উপসংহার অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। যৌক্তিক ইতিহাসবাদ শ্রেণিবিভক্ত সমাজের ইতিহাস বিশ্লেষণে তাকে একটি সাময়িক ও উত্তরণক্ষম কাঠামো হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু বুর্জোয়া সামাজিক বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের সব ক্ষেত্রেই শ্রেণিবিভক্ত সমাজকে (পুঁজিবাদের ক্ষেত্রে তা সর্বাধিক মাত্রায় সত্য) উত্তরণহীণ, অনড় আর্থসামাজিক কাঠামো হিসাবে গণ্য করেন।

"ইতিহাসের বিষয়বস্তু" প্রশ্নটি মার্কসবাদী-অমার্কসবাদীদের মধ্যে মতপার্থক্যের অন্যতম ক্ষেত্র। তবে সংজ্ঞাগত বিতর্কে না গিয়ে বলা যায়, ইতিহাসশাস্ত্র অবশ্যই সমাজবিকাশকে অনুশীলন করে। আর উৎপাদিকা শক্তি এবং তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল উৎপাদনসম্পর্কই হলো শেষ বিচারে ঐ বিকাশের নিয়ামক। অর্থাৎ ইতিহাসশাস্ত্র সেই সমাজবিকাশকে অধ্যয়ন করে, যার প্রধান বিকাশবাহন হলো নির্দিষ্ট উৎপাদন পদ্ধতি (বিস্তারিত দেখুন বারকাত ২, পৃ. ৬৭-৭১; মাহমুদ ৯, পৃ. ১৮-৬৩)। উল্লেখ্য, উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদনসম্পর্ক যদিও ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ভিত্তি ও প্রাথমিক কারণ, তথাপি এ দুটি উপাদানই সমাজ ইতিহাসের সমগ্র গুঢ় অর্থের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় না। এ প্রশ্নে মার্কসবাদীদের ধারণা অত্যন্ত সুস্পষ্ট, আর তা হলো "ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা অনুসারে বাস্তব জীবনের উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনই হচ্ছে ইতিহাসে শেষপর্যন্ত নির্ধারক বস্তু। অর্থনৈতিক অবস্থা হলো ভিত্তি; কিন্তু উপরিকাঠামোর বিভিন্ন বস্তু, যেমন— শ্রেণিসংগ্রামের বিভিন্ন রাজনৈতিক রূপ এবং তার ফলাফল: সাফল্যমণ্ডিত সংগ্রামের পর বিজয়ী শ্রেণিকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সংবিধান ইত্যাদি, বিচারব্যবস্থা, এমনকি এসব ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডে যোগদানকারীদের মস্তিষ্কে এসব বাস্তব সংগ্রামের প্রতিফলন, রাজনৈতিক, আইনগত, দার্শনিক তথ্যাবলী, ধর্মীয় মতামত এবং ক্রমে সেগুলোর আপ্তবাক্যে পরিণতি— এসবও ঐতিহাসিক সংগ্রামগুলোর গতিকে প্রভাবিত করে এবং বহুক্ষেত্রে তাদের রূপ নির্ধারণে প্রধান হয়ে ওঠে। এদের সবার একটি পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া রয়েছে,

যেখানে অসংখ্য আকস্মিকতার মধ্যে অর্থনৈতিক আন্দোলন শেষপর্যন্ত আবশ্যিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। অন্যথায়, পছন্দমতো ইতিহাসের যেকোনো আমল সম্পর্কে তত্ত্ব প্রয়োগ করা প্রথম ঘাতের সরল সমীকরণের সমাধানের চেয়েও সহজতর হতো" (দেখুন এঙ্গেলস ৬, পৃ. ১৭৫)। সুতরাং সমাজের অতীত বিকাশ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যেমন অথনৈতিক ভিত্তিকে প্রাধান্য দিতে হবে, তেমনি সামাজিক প্রক্রিয়ার রূপ ও আধেয় আন্তসম্পর্কের দ্বন্দ্বাবলীও উপেক্ষা করা যাবে না।

উপরিকাঠামোর বিভিন্ন মৌলাদি ঐতিহাসিক বিকাশ নির্ধারণে নিষ্ক্রিয় নয় (মার্কসবাদীদের সমালোচনার ক্ষেত্রে অনেকেই বিষয়টি গুরুত্বসহকারে উপস্থাপন করে থাকেন)। উপরিকাঠামোর ভূমিকা যেমন নির্ধারিত হয় ভিত্তিকাঠামোর বৈশিষ্ট্য দ্বারা, তেমনি উপরিকাঠামোও আর্থসামাজিক ঐতিহাসিক বিকাশে উল্টো ভূমিকা রাখতে সক্ষম। যেমন অর্থনৈতিক বিকাশে রাষ্ট্রশক্তি তিন ধরনের প্রভাব ফেলতে সক্ষম: "রাষ্ট্রশক্তি একই অভিমুখে যেতে পারে এবং সেক্ষেত্রে বিকাশ দ্রুততর হয়। রাষ্ট্রশক্তি অর্থনৈতিক বিকাশধারার বিপরীত দিকে যেতে পারে এবং সেক্ষেত্রে আজকাল প্রত্যেক বৃহৎ জাতির মধ্যে রাষ্ট্রশক্তি শেষপর্যন্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে; অথবা সেটা অর্থনৈতিক বিকাশের কয়েকটি পথ বন্ধ করে অন্য কয়েকটি পথে ঠেলে দিতে পারে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্থনৈতিক বিকাশের প্রচণ্ড ক্ষতি সাধন করতে পারে এবং বিপুল পরিমাণ শক্তি ও বৈষয়িক সম্পদের অপচয় ঘটাতে পারে" (দেখুন এঙ্গেলস, ৬, পৃ. ১৮০)। সুতরাং ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া বিকাশে অর্থনৈতিক উপরিকাঠামোর ভূমিকা প্রসঙ্গে মার্কসবাদী ধারণা আদৌ সরলরৈখিক নয়। অবশ্য এর অর্থ এইই নয় যে সমাজবিকাশের মার্কসীয় ধারণা ও বুর্জোয়া বহুত্ববাদী ধারণা সমার্থক।

বুর্জোয়া বহুত্ববাদী ধারণানুযায়ী ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার বিকাশে অন্যান্য উপাদানের মতোই অর্থনৈতিক উপাদানও সমশক্তিমান একটি উপাদানমাত্র। এ ধারণার বাহক ঐতিহাসিকেরা ইতিহাস বিশ্লেষণে বহু উপাদান থেকে স্বপ্রণোদিতভাবে সেই উপাদানকে বেছে নেন, যা তার মতে নিয়ামক ভূমিকা পালন করছে বলে মনে হয় এবং ফলশ্রুতিতে তিনি আধ্যাত্মবাদিতার আবর্তে ঘুরপাক খেতে থাকেন (দেখুন জি-ওয়াইজ ১৮, পৃ. ৩৭)। বহুত্ববাদী পদ্ধতি প্রয়োগে ঐতিহাসিক সাধারণীকরণ সম্ভব নয়, কারণ ঐতিহাসিক বিকাশ বিশ্লেষণে কোনো সুস্থিত মানদণ্ড ব্যবহার করা হয় না। অথচ ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে অদ্বৈতবাদী দ্বন্দ্বাত্মক বস্তুবাদী পদ্ধতি প্রয়োগ ছাড়া গবেষণালব্ধ বিষয়ের মূর্ত ভিত্তি সৃষ্টি সম্ভব নয়। প্রত্যক্ষবাদী প্রয়োগবাদী

ঐতিহাসিকেরা নির্দিষ্ট কালের ইতিহাসকে কোনো সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত করতে অপারগ, বিপরীতে ইতিহাস হলো বিছিন্ন ও "পুনরানুষ্ঠান অক্ষম" ঐতিহাসিক ক্রিয়াকর্মের সমাহার। শেষাবধি যা ঘটে তা হলো– "ঐতিহাসিকই ইতিহাসের স্রষ্টা" (সেক্ষেত্রে ইতিহাস– বিজ্ঞান নয়)। এই ধারায় ঐতিহাসিকেরা যখন বলেন যে "ইতিহাসশাস্ত্রের অবস্থান– বিজ্ঞান ও শিল্প-সংস্কৃতির মধ্যবর্তী কোনো একখানে", তখন উক্তিটি অবশ্যই আকস্মিক নয়; তা ইতিহাস রচনার উল্লিখিত দার্শনিক ভিত্তি থেকেই উদ্ভূত।

ইতিহাস গবেষণায় ঘটনার মূর্ত বিশ্লেষণের অভাবে প্রায়শ উল্লেখ করা হয় যে "অতীত ঘটনাবলীর হুবহু পুনরুৎপাদন" সম্ভব নয়। 'চরম সমালোচনা' আধুনিক বুর্জোয়া ইতিহাসে বহুল স্বীকৃত পদ্ধতি হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে (দেখুন নিসবেত, ১৪)। ইতিহাসের এই ধারায় ঐতিহাসিক ঘটনাবলী নিয়ে ছিদ্রান্বেষী সন্দেহ করা হয়ে থাকে। ঐতিহাসিক নিদর্শন (যেমন মূর্তি বা পুরানিদর্শন), ঘটনার সাল-তারিখ থেকে শুরু করে ঐতিহাসিক সব উৎসের বস্তুতান্ত্রিক মূল্যায়নের সম্ভাবনাকেও অস্বীকার করা হয়। আর তারই ভিত্তিতে বলা হয়ে থাকে যে, ঐতিহাসিক অভিজ্ঞানের সাধারণীকরণ সম্ভব নয়, সম্ভব নয় সামাজিক বিকাশ সূত্রবদ্ধকরণ। কারণ, অভিজ্ঞানটি শর্তসাপেক্ষ ও নিরঙ্কুশভাবে আপেক্ষিক। অন্যদিকে ঐতিহাসিক অভিজ্ঞানের "সীমাহীন আপেক্ষিকত্ব" শেষাবধি বুর্জোয়াদের শ্রেণিস্বার্থ রক্ষা করে। আর্থসামাজিক ব্যবস্থার মার্কসবাদী তত্ত্বের প্রতি বুর্জোয়া ঐতিহাসিকদের সম্পর্কই তার অন্যতম পরিচায়ক। মার্কসবাদী তত্ত্বানুযায়ী পুঁজিবাদ চিরন্তন নয়, নয় তা সভ্যতা ও কৃষ্টির চরমাবস্থা। বুর্জোয়া ইতিহাসতত্ত্ব সভ্যতার বিকাশকে আর্থসামাজিক ব্যবস্থার বিকাশ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার বিপরীতে বিভিন্ন ধরনের বিকল্প সৃষ্টি করেছে। যেমন ম্যাক্স ওয়েবারের "আইডিয়েল টাইপ", অথবা রস্টোর "প্রবৃদ্ধির স্তরায়ন" তত্ত্ব (দেখুন রস্টো ১৫)।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশের বিকল্প সূত্র অস্বীকার করা, বিকাশের বিশেষ বা অঞ্চলগত দিকটির নিরঙ্কুশায়ন ইত্যাদি প্রায়শ স্থূল জাতীয়তাবাদী ধারণার বাহকমাত্র, যা স্থূল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ইদানীংকালে ইতিহাসের "ইউরোপকেন্দ্রিক" আস্থাহীন ধারণাকে "এশিয়াকেন্দ্রিক" ধারণার দ্বারা প্রতিস্থাপন একই উদ্দেশ্যে ঘটছে (এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতির বুর্জোয়া বাহকদের উদ্দেশ্যও তাই; দেখুন বারকাত ৮, পৃ. ২, ১৪-১৫)।

গত দুই দশকে ইতিহাসের "ছদ্মবস্তুবাদী ধারণা" বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই ধারণামতে ঐতিহাসিক বিকাশ হলো সামাজিক উৎপাদনের প্রযুক্তিগত বিকাশ অথবা

বস্তুগত কৃষ্টির ক্রমবিকাশমাত্র (অর্থাৎ "বস্তুসম্পদের ইতিহাস"; দেখুন সেইডার ৩৮)। ইতিহাসের "ছদ্ম বস্তুবাদী" ধারণানুযায়ী "মানুষ ইতিহাসের সৃষ্টিকর্তা" প্রত্যয়টিকে হয় অস্বীকার করা হয়, অথবা এড়িয়ে চলা হয়। এভাবেই ইতিহাসকে তার সামাজিক সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে, সাধারণ বর্ণনামূলক রচনাকে তার উদ্দেশ্যে রূপান্তরিত করা হয়। এভাবেই পরিচালিত হচ্ছে ইতিহাসশাস্ত্রকে "মতাদর্শনিরপেক্ষ" (ideology neutral) করার সংগ্রাম।

সামাজিক বিকাশসূত্রের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী বুর্জোয়া ইতিহাসবিদদের কেউ কেউ ইদানীংকালে সমস্যাভিত্তিক সামষ্টিক গবেষণার বিপরীতে আঞ্চলিক, আংশিক, আনুবীক্ষণিক ইতিহাস রচনায় উদ্যোগী হয়েছেন (দেখুন গোবের্ট ১১)। উল্লেখ্য, আনুবীক্ষণিক স্তরের ইতিহাস গবেষণা মূল্যবান, যদি তা সভ্যতার সামাজিক ইতিহাস উদ্‌ঘাটনে উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। অন্যথায় "ইতিহাসের জন্য ইতিহাস" রচনা "শিল্পের জন্য শিল্প সৃষ্টির" সমার্থক।

সামাজিক প্রক্রিয়ার সংখ্যাভিত্তিক বিশ্লেষণ নিঃসন্দেহে শর্তাধীনে শাস্ত্রীয় মান উন্নত করে। কিন্তু পশ্চিমী ইতিহাসশাস্ত্রে পরিমাণগত বিশ্লেষণে নিয়োজিত "ক্লিওমেট্রিকস" শাস্ত্রীয় মানোন্নয়নের পরিচয়বাহী নয়। কারণ, "ক্লিওমেট্রিকস" সার্বজনীন "গণিতায়নের" মাধ্যমে যেকোনো ইতিহাসকে আধ্যাত্মবাদের কবল থেকে মুক্ত করার "মেকি পদ্ধতি"মাত্র। ইতিহাসশাস্ত্রে গাণিতিক পদ্ধতি ততটুকুই প্রযুক্ত হতে পারে ঐতিহাসিক উৎসের প্রকৃতি যতটুকু তা অনুমোদন করে। এই অনুমোদন বা সম্ভাবনা আদৌ অসীম নয় (দেখুন উইলি সম্পাদিত, ১৭)। ইতিহাসে গাণিতিক পদ্ধতির প্রয়োগ সামাজিক প্রক্রিয়ার পরিমাণগত বিধির অভিজ্ঞান ক্ষমতা দ্বারা নির্ধারিত।

বর্ণনা অবশ্যই ইতিহাস গবেষণার প্রাথমিক ও অতীব প্রয়োজনীয় অঙ্গ। কিন্তু এটাও সত্য যে সবচেয়ে সৎ উৎকৃষ্ট বর্ণনাও বর্ণিত ঘটনা বা প্রক্রিয়ার প্রকৃত তাৎপর্য, তার উৎপত্তি ইতিহাস বা তার অস্তিত্বের গুঢ় অর্থ নির্ণয়ে যথেষ্ট নাও হতে পারে। শুধু বিভিন্ন ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াকে পাশাপাশি রেখে তুলনা করা, তাদের মিল ও অমিল উদ্‌ঘাটন করা, তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য পৃথক করা এবং বিশেষ প্রক্রিয়ার পুনরানুবৃত্তি নির্ধারণ করেই বর্ণনা থেকে সাধারণীকৃত সংশ্লেষণে পৌঁছানো সম্ভব। এটিই ঐতিহাসিক বিকাশকে সূত্রায়নের পথ।

ইতিহাস রচনায় ভাবনার মৌল বিষয়াদি

যেকোনো ঐতিহাসিক তথ্য অপেক্ষাকৃত বৃহৎ সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার কাঠামোগত উপাদানমাত্র। উল্লেখিত ঐতিহাসিক তথ্যকে তত্ত্বগতভাবে যেমন বিকাশ-গতির অবস্থায়, তেমনি স্থির (static) অবস্থায়ও দেখা সম্ভব। ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার গতিময়তার সূত্র বিদ্যমান। মার্কস ও এঙ্গেলসের মতে, যদিও বাস্তব জীবনের উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনই হচ্ছে ইতিহাসে শেষপর্যন্ত নির্ধারক বস্তু, তথাপি "ইতিহাস এমনভাবেই সৃষ্টি হয় যাতে চূড়ান্ত ফলাফল সর্বদা বহু ব্যক্তিগত ইচ্ছার সংঘাত থেকে উদ্ভূত হয় এবং এই ইচ্ছার প্রত্যেকটি আবার জীবনের বেশ কতগুলো বিশেষ অবস্থার দ্বারা গঠিত। এভাবে অসংখ্য পরস্পর ছেদনকারী শক্তি রয়েছে, রয়েছে শক্তির অসংখ্য সামন্তরিক ক্ষেত্রের ধারা এবং এদেরই মধ্যে থেকে উদ্ভূত হয় একটি সাধারণ ফল ঐতিহাসিক ঘটনা। একে আবার এমন একক একটি শক্তির সঞ্জাত ফল বলেও ধরে নেওয়া যেতে পারে, যা সামগ্রিক হিসাবে অচেতন ও ইচ্ছাশক্তিহীনভাবে কাজ করে। কারণ, প্রত্যেক ব্যক্তি যা যা চায় অপর প্রত্যেক ব্যক্তি তাতে বাধা দেয় এবং ফলাফল দাঁড়ায় এমন কিছু, যা কেউই চায়নি। এভাবে অতীত ইতিহাস একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ারূপেই চলে এবং মূলত একই গতির নিয়মাবলীর অধীন। যদিও ব্যক্তিগত ইচ্ছা প্রত্যেক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির শারীরিক গঠন এবং বাইরের, শেষপর্যন্ত, অথনৈতিক অবস্থার দ্বারা (নিজের ব্যক্তিগত বা সাধারণভাবে সমাজের অবস্থা) প্রণোদিত হয় এবং নিজ নিজ ইপ্সিত বস্তু লাভ করতে পারে না বরং একটি যৌথ গড়ে, একটি সাধারণ লব্ধিতে পরিণত হয়। যার অর্থ এই নয় যে তাদের মূল্য শূন্য। বরং লব্ধ ফলে প্রত্যেকটি ইচ্ছারই অবদান রয়েছে এবং সেই পরিমাণে সেগুলো তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত" (দেখুন, এঙ্গেলস ৬, পৃ. ১৭৬)।

পরবর্তীকালে এঙ্গেলস উল্লিখিত ধারণার বিকাশ সাধন করে উল্লেখ করেছেন যে, প্রকৃতির অন্ধ ও অসচেতন শক্তির বিপরীতে "সমাজের ইতিহাস হলো মানুষের ইতিহাস। যে মানুষ চেতনাসম্পন্ন। তার কর্মকাণ্ড চিন্তাপ্রবণ অথবা আবেগী। সে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যার্জনে সচেষ্ট। এখানে কোনো কিছুই সচেতন ইচ্ছা এবং কাঙ্খিত লক্ষ্যের বাইরে নয়। ... ইতিহাসের গতি তার অভ্যন্তরীণ সাধারণ সূত্রের আওতাভুক্ত" (দেখুন, এঙ্গেলস ৩২, পৃ. ৩০৬)। আর মার্কসের মতে, "ইতিহাস কোনো বিশেষ ব্যক্তি নয় যে তার উদ্দেশ্য সাধনে মনুষ্যশক্তিকে ব্যবহার করে। ইতিহাস হলো নির্দিষ্ট লক্ষ্যার্জনে নিয়োজিত মানুষের কর্মকাণ্ড" (দেখুন, মার্কস ৩৩, পৃ. ১০২)। এই কর্মকাণ্ড যৌথ প্রকৃতির। আর এই দৃষ্টিতে ঐতিহাসিক ইতিহাস

প্রক্রিয়ার প্রকৃত সূত্রর উৎস উদ্‌ঘাটনে যদি সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করেন, (যা অসঙ্গতিতে ভরপুর) সেক্ষেত্রে তিনি আকস্মিকতার বেড়াজাল এড়িয়ে যেতে সক্ষম হবেন না। সুনিদিষ্ট ব্যক্তির কর্মকাণ্ডের বিশ্লেষণ অতীতের সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করে না। সব ঐতিহাসিককালে যেসব বৃহৎ ঘটনা ঘটেছে তা নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে নয়, বৃহৎ ব্যক্তিসমষ্টিকে অথবা সমগ্র দেশ, জাতিকে পরিবর্তিত করেছে। আর তাই সামাজিক বিকাশের ঐতিহাসিক সূত্র উদ্‌ঘাটনে নির্দিষ্ট ব্যক্তির কর্মকাণ্ডের চেয়ে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান ও অনুসন্ধান করতে হবে সেই সামগ্রিক প্রক্রিয়াকে, যা বৃহৎ জনসমষ্টি ও সমাজকে গতিশীল করে তুলেছিল।

ঐতিহাসিক তথ্য ও ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ প্রয়োজন– এ ধারণাটি প্রাচীনকাল থেকেই স্বীকৃত। যেমন গ্রিক ঐতিহাসিক ফুকিডাড মনে করতেন যে, ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার সুনির্দিষ্ট সূত্রবদ্ধকরণ সম্ভব; এবং খ্রী. পূ. দ্বিতীয় শতকের গ্রিক ঐতিহাসিক পলিবির মতে, ঐতিহাসিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি আকস্মিক নয় (দেখুন, কলিনউড ২০, পৃ. ২৭-৩৮; বিস্তারিত দেখুন, চেরেপনিন ২২)। আর আধুনিক যুগের ঐতিহাসিক কর্নডোরসে (জর্জ), কান্ট এবং পরে জন স্টুয়ার্ট মিল ও স্পেন্সার ইতিহাসশাস্ত্রকে সূক্ষ্ম বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীতকরণে সচেষ্ট হলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। তা বাস্তবায়িত হয়েছে শুধু তখনই, যখন মার্কস আবিষ্কার করলেন ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা, যেখানে সামাজিক অভিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হলো "মূর্ত বিকাশসূত্র" নামক প্রত্যয়টি। ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণার ভিত্তিতে সৃষ্টি হলো ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, অর্থাৎ সমাজ বিকাশের সাধারণ সূত্রাবলীসংক্রান্ত বিজ্ঞান। ঐতিহাসিক বস্তুবাদী ধারণানুযায়ী অর্থনৈতিক মৌলকাঠামো ও উপরিকাঠামোর আন্তঃসম্পর্ক, উৎপাদিকা শক্তির পরিবর্তনের সাথে সাথে সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন, সামাজিক পরিবেশের ওপর সামাজিক চেতনার নির্ভরতা ইত্যাদি সমাজের সমগ্র কাঠামোর সাথে সম্পর্কিত, আর তাই তারা সামাজিক বিকাশের সাধারণ সূত্রের আওতাভুক্ত। যেহেতু উল্লিখিত সূত্রসমূহ সব সামাজিক প্রক্রিয়া অনুসন্ধানের ভিত্তি, আর তাই ইতিহাসসহ সব সামাজিক বিজ্ঞানই ঐতিহাসিক বস্তুবাদে ভর করে।

সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মতো ইতিহাসও সমাজের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের বিশ্লেষণে ব্যাপৃত হয় না, তা সমগ্রের সুনির্দিষ্ট অংশ নিয়েই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তুলনায় ইতিহাসশাস্ত্র সামাজিক বিকাশের অপেক্ষাকৃত আংশিক সূত্রাবলী অনুসন্ধান করে। এসব সূত্রকেই "ঐতিহাসিক সূত্র" আখ্যায়িত করা যেতে পারে। এঙ্গেলসের মতে, "বাহ্যিক জীবনে আকস্মিকতার খেলা চলে।

কিন্তু এই আকস্মিকতা সর্বদাই অভ্যন্তরীণ, গোপন সূত্রাধীন। মূল কাজ হলো ঐ সূত্রাদি উদ্‌ঘাটন করা" (দেখুন, এঙ্গেলস ৩২, পৃ. ৩০৬। ঐসব সূত্রাদির বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছেন প্লেটনিকভ, দেখুন ৩১)।

সমাজ বিকাশের সাথে সাথে বিকাশের প্রধান বাহক– অর্থনৈতিক উপাদানের ভূমিকা সুস্পষ্ট দেখা যায়। এ দৃষ্টিতে দাস অথবা সামন্তবাদী সমাজের তুলনায় পুঁজিবাদী সমাজের মূর্ত বিকাশসূত্র উদ্‌ঘাটন অপেক্ষাকৃত সহজ। আর তাই বুর্জোয়া সভ্যতায় অর্থনৈতিক ভিত্তিতে গঠিত সামাজিক শ্রেণিসমূহের বিকাশসূত্র উদ্‌ঘাটন অপেক্ষাকৃত সহজ। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মার্কস-পূর্ববর্তী বুর্জোয়া সমাজবিজ্ঞানী, যেমন গিজো এফ, মিনিত্র এফ এবং টেরিও প্রমুখও শ্রেণি ও শ্রেণিসংগ্রামের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। এক্ষেত্রে মার্কস-এঙ্গেলস আরো অগ্রসর হয়ে সৃষ্টি করলেন ঐতিহাসিক বিকাশের অদ্বৈতবাদী নীতি (যা পরে বিকাশ সাধন করেন প্লেখানভ "ইতিহাসের অদ্বৈতবাদী নীতি" গ্রন্থে)। যেটা এককথায় হলো নিম্নরূপ: "অন্তত আধুনিক যুগের ইতিহাস গবেষণায় প্রমাণিত যে, ***সব ধরনের রাজনৈতিক সংগ্রাম হলো শ্রেণিসংগ্রাম এবং সব ধরনের শ্রেণিসংগ্রামই সংগ্রামরতদের মুক্তির সংগ্রাম*** শেষাবধি অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম" (দেখুন এঙ্গেলস ৩২, পৃ. ৩০৯-৩১০)। এটিই রাজনৈতিক জীবনের অর্থনৈতিক ভিত্তিসংক্রান্ত মার্কসবাদী ধারণার মূল কথা। অর্থাৎ মার্কসবাদী ধারণানুযায়ী রাষ্ট্র, রাজনীতি বা মতাদর্শগত সংগ্রাম– কোনোটির ইতিহাসকেই সংগ্রামরত সামাজিক শক্তি বা আর্থসামাজিক শ্রেণির অর্থনৈতিক স্বার্থের সাথে বিচ্ছিন্ন করে দেখা সম্ভব নয়। আবার সমাজের বিকাশমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আত্মিক পরিবর্তনসমূহও একটি থেকে অপরটিকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা অমার্কসীয়।

আধুনিক বুর্জোয়া ইতিহাসতত্ত্বের বাহকেরা বিকাশের উল্লিখিত উপাদানসমূহকে পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবেই দেখে থাকেন। রাজনৈতিক অথবা সামাজিক ইতিহাস পৃথকীকৃতভাবেই দেখা হয়, অথবা সেটাকে সামাজিক চেতনার সাথে কেউ কেউ সম্পৃক্ত করলেও অর্থনৈতিক বিকাশগত নিয়ামক মৌলকে বিশ্লেষণ-বহির্ভূত রাখা হয়। আবার অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে প্রায়শ দেখা যায় ঐ ইতিহাস সামাজিক-রাজনৈতিক প্রক্রিয়াবর্হিভূত। অন্যদিকে মতাদর্শের ইতিহাসকে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া থেকে বহু দূরে রাখা হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে এসবের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয় যে, ইতিহাসবিজ্ঞানে বাস্তব-ঐতিহাসিক তথ্য ও ঘটনাবলীর প্রাচুর্যের কারণে তা হয়ে গেছে অভ্যন্তরীণ অন্তরীকৃত ও বিশেষায়িত। এ যুক্তি সঠিক, কিন্তু প্রশ্ন অন্যত্র। প্রশ্ন হলো, ইতিহাসের সমগ্রতা ধারণা নিয়ে।

ইতিহাসের যেকোনো বিশেষায়িত ক্ষেত্র হলো সাধারণ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার সমগ্রতার অংশ, সমগ্রতার বিশেষ দিকমাত্র, তা আদৌ সমগ্রতা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। আবার সমগ্রতার বিশেষ কোনো অংশ বা দিকের পরমীকরণ প্রকৃত সত্যকে বিকৃত করতে বাধ্য। আর এসবের অর্থ এই নয় যে, শিল্প-সংস্কৃতির ইতিহাস রচয়িতার কাছে দাবি করা হচ্ছে রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনার। দাবিটি হলো এই যে শিল্প-সংস্কৃতির ইতিহাস রচয়িতা যেন ঐতিহাসিক সমগ্রতার অন্যান্য উপাদানকে এড়িয়ে না চলেন (বিশেষত অর্থনৈতিক উপাদানের প্রাধান্যের বিষয়টি)। অন্যথায় বিভিন্নতর আংশিক ইতিহাসের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে তার সাধারণীকরণের সম্ভাবনা বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং একক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া ধারণাটিরও সেক্ষেত্রে বিলুপ্তি ঘটতে পারে।

"পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক" হিসেবে মার্কসকে অভিহিত করে "সমাজ বিকাশের সূত্র" আবিষ্কারকেই এঙ্গেলস তাঁর প্রধান অবদান বলে উল্লেখ করেছেন। এঙ্গেলসের উক্তি অনুযায়ী 'ডারউইন যেমন জৈব প্রকৃতির বিকাশের নিয়ম আবিষ্কার করেছিলেন, তেমনি মার্কস আবিষ্কার করেছেন **মানুষের ইতিহাসের বিকাশের নিয়ম**, মতাদর্শের অতি নিচে এতদিন লুকিয়ে রাখা এই সহজ সত্য যে, রাজনীতি, বিজ্ঞান, কলা, ধর্ম ইত্যাদি চর্চা করতে পারার আগে মানুষের প্রথম চাই খাদ্য, পানীয়, আশ্রয়, পরিচ্ছদ; সুতরাং প্রাণ ধারণের আরও বাস্তব উপকরণের উৎপাদন এবং সেহেতু কোনো নির্দিষ্ট জাতির বা নির্দিষ্ট যুগের অর্থনৈতিক বিকাশের মাত্রাই হলো সেই ভিত্তি, যার ওপর গড়ে ওঠে সংশ্লিষ্ট জাতিটির রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, আইনের ধ্যান-ধারণা, শিল্পকলা, এমনকি তাদের ধর্মীয় ভাবধারাপর্যন্ত এবং সেই দিক থেকেই এগুলোর ব্যাখ্যা করতে হবে; এতদিন যা করা হয়েছে সেভাবে উল্টো দিক থেকে নয়" (দেখুন এঙ্গেলস ৭, পৃ.১৬৪)।

সাধারণ সমাজ বৈজ্ঞানিক বিকাশ-সূত্রের সাথে ঐতিহাসিক সূত্রের আন্তসম্পর্কের প্রশ্নটি মার্কসবাদীদের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সমাজবিকাশের সাধারণ সূত্রটি সবর্জনীন এবং তা হলো "জীবনীয় সামগ্রীর সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে, মানুষে-মানুষে অবশ্যম্ভাবীরূপেই নির্দিষ্ট কতগুলো সম্পর্ক স্থাপিত হয়, সেগুলো তাদের ইচ্ছানিরপেক্ষ, যথা তাদের বৈষয়িক উৎপাদিকা শক্তিসমূহের বিকাশে এক নির্দিষ্ট স্তরের উপযুক্ত উৎপাদনসম্পর্ক। উৎপাদনের এ সম্পর্কগুলোর সামগ্রিকতাই সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো, প্রকৃত বুনিয়াদ, যার ওপরে মাথা তুলে দাঁড়ায় এক আইনগত ও রাজনৈতিক সৌধ এবং বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট রূপের সামাজিক চৈতন্য যার অনুষঙ্গী।

বৈষয়িক জীবনের উৎপাদনব্যবস্থা সামাজিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিগত জীবনের সাধারণ প্রক্রিয়াকে নির্ধারিত করে। ... বিকাশের এক বিশেষ স্তরে বিদ্যমান উৎপাদনসম্পর্কের সাথে ... বৈষয়িক উৎপাদিকা শক্তিগুলির সংঘাত বাধে। এই সম্পর্ক উৎপাদিকা শক্তিগুলোর বিকাশের আঁধার থেকে পরিণত হয় তাদের শৃঙ্খলে। তখন শুরু হয় সমাজবিপ্লবের যুগ। অর্থনৈতিক বুনিয়াদের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ফলে, আগেই হোক অথবা পরেই হোক, সমগ্র বিশাল সৌধটির রূপান্তর ঘটে" (দেখুন মার্কস ৮, পৃ. ১৩)। সমাজবিকাশের সাধারণ সূত্রের বিপরীতে ঐতিহাসিক সূত্রের দায়িত্ব হলো সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক অবস্থায় উল্লিখিত সাধারণ সূত্রের ক্রিয়াপদ্ধতি উদ্‌ঘাটন করা। আর তা করা হয়ে থাকে যেভাবে তা হলো– "একজন ব্যক্তি নিজের সম্পর্কে কী চিন্তা করে, তা দিয়ে যেমন সেই ব্যক্তির বিচার করা যায় না, বরং এই চৈতন্যের ব্যাখ্যা করতে হবে বৈষয়িক জীবনের দ্বন্দ্ব থেকে, সামাজিক উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদনসম্পর্কের মধ্যে বিদ্যমান বিরোধ থেকে। কোনো সামাজিক ব্যবস্থাই তার পক্ষে যা যথেষ্ট এমন সমস্ত উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ঘটার আগে ধ্বংস হয় না এবং উৎপাদনের নতুন নতুন উন্নততর সম্পর্ক পুরোনো সমাজের কাঠামোর মধ্যে তাদের অস্তিত্বের বৈষয়িক অবস্থাগুলো পরিপক্ব হওয়ার আগে পুরোনো সম্পর্কগুলোর স্থান গ্রহণ করে না" (দেখুন মার্কস ৮, পৃ. ১৩-১৪)। সোভিয়েত ঐতিহাসিক ফিদোসিয়েভ ও ফ্রান্সেভ-এর মতে, "সামাজিক জীবনে সংঘটিত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত প্রক্রিয়াসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের মাধ্যমেই গবেষক ঐতিহাসিক গতির বিশেষ দিকটি উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম হন। সাধারণ সমাজ বৈজ্ঞানিক সূত্রটি হলো সেই ভিত্তি, যা ঐতিহাসিক বিকাশে অর্থনীতি, রাজনীতি ও মতাদর্শের ভূমিকা নির্দেশ করে। তবে ইতিহাসশাস্ত্রের কাজ হলো সুনির্দিষ্ট বাস্তব ক্ষেত্রে উল্লিখিত পরস্পরসম্পর্কিত প্রক্রিয়াসমূহের গতিময়তা বিশ্লেষণ করা" (দেখুন, ফিদোসিয়েভ ও ফ্রান্সেভ ৩০, পৃ. ১৬)।

ঐতিহাসিক বিকাশে "সাধারণ" ও "বিশেষের" দ্বন্দ্ব– গবেষণার মৌলিক প্রশ্ন। বাস্তব ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় "সাধারণ" "বিশেষের" মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। আর তাই গবেষণার ক্ষেত্রে প্রচুর তথ্য থেকে সেসব ঐতিহাসিক তথ্য বেছে নেওয়া হয়, যেগুলো "সাধারণ" অথবা প্রাকৃতিক সূত্রের আওতাধীন। উল্লেখ্য, ইতিহাসবিদ সাধারণ সমাজ বৈজ্ঞানিক সূত্রের ব্যবহারে অতীতের সব বিষয়ের সন্তোষজনক বিশ্লেষণ দিতে সক্ষম নন। তিনি বাস্তব ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর অভিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কত বেশি উপরতলা থেকে নিচের দিকে ধাবিত হন, তথ্যের সাধারণীকরণ ও তাত্ত্বিক মননের ক্ষেত্রে তার স্বকীয়তার মাত্রা তত বেশি বৃদ্ধি পায়। তাই ইতিহাস বিশেষজ্ঞকে গবেষণার প্রাথমিক পর্যায়েই ঐতিহাসিক

প্রাসঙ্গিক তথ্যাদির যাচাইকরণ, সূক্ষ্মতা নির্ণয় ও শ্রেণিবদ্ধকরণের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। সেইসাথে ঐতিহাসিককে ইতিহাসতত্ত্বীয় ঐতিহ্যে সুসজ্জিত থাকতে হয়। ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় পুনরাবৃত্ত তথ্য ও ঘটনাবলীর সঞ্চয়ন ও বিশ্লেষণের মাধ্যমেই ঐতিহাসিক বিকাশ শুধু উদ্‌ঘাটিত হয়। উল্লিখিত পুনরানুষ্ঠান যান্ত্রিক নয়, পুনরানুষ্ঠিত ঘটনাদ্বয় অভিন্ন নয়। ঐতিহাসিক তথ্য ও ঘটনার তুলনামূলক বিচারে অভিজ্ঞানকে আনুভূমিক ও উল্লম্বিক উভয় দিকেই সমৃদ্ধ করে। উল্লেখ্য, তুলনামূলক-ইতিহাস গবেষণা ঘটনার পরীক্ষামূলক বৈশিষ্ট্য উদ্‌ঘাটনেই সীমিত নয়, তা চিন্তাকে মূর্তে উত্তরণের পদ্ধতিও। তার "সাধারণ", "বিশেষ" ও "একক"-এর দ্বান্দ্বিক সংযোগ "আংশিক" ঘটনায় ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার স্থানগত অথবা সময়গত বৈশিষ্ট্য এবং "সাধারণ"-এর মাধ্যমে শেষাবধি তার মূর্ত গুণগত প্রকৃতি প্রতিফলিত হয় (এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত দেখা যেতে পারে ২৯, পৃ. ১-১৪২)। "সাধারণ", "বিশেষ" ও "এককের" দ্বান্দ্বিক যোগসূত্রের কারণেই ইতিহাসশাস্ত্র আকস্মিক ঘটনাবলীও বিশ্লেষণ করে, কারণ তা বাস্তব ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার অসঙ্গতিপূর্ণ বিকাশপ্রবণতার অংশ।

ইতিহাসে "বিকল্প" বিকাশের প্রশ্নটি তাত্ত্বিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কক্ষেত্র হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে। মার্কসবাদী ইতিহাস ধারণাবিরোধীদের অনেকেই উল্লিখিত "বিকল্প ধারণাটি" ইতিহাস বিকাশের সাধারণ সূত্রের অস্তিত্বহীনতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে থাকেন (দেখুন জুকভ ২৩, পৃ. ২২)। তাদের মতে "বিকল্প" বিকাশপ্রক্রিয়া প্রমাণ করে যে, ইতিহাস বিকাশে "আকস্মিকতা" নিয়ামক শক্তি। মূল কথা হলো, ইতিহাসে "বিকল্প" বিকাশের ধারণার পাশাপাশি আরও একটি ধারণার সংযোজন করতে হবে, তা হলো বিকাশের "বহুপদী পরিবর্তন" ধারণা। সেইসাথে মনে রাখতে হবে যে সভ্যতার বিকাশ সরলরৈখিক প্রক্রিয়া নয়, তা বহু ধরনের বক্র রেখার সমাহার। 'বিকল্প' ধারণায় যা বলা হয়ে থাকে, তা তত বেশি পরিদৃষ্ট হয় গবেষক যত বেশি সামাজিক বিকাশপ্রক্রিয়ার তলদেশে আনুবীক্ষণিক প্রক্রিয়ার দিকে ধাবিত হন। অন্যদিকে গবেষণাধীন ইতিহাসপ্রক্রিয়া যত বেশি সামষ্টিক রূপ ধারণ করে তা তত বেশি আকস্মিকতামুক্ত এবং তত বেশি সাধারণ বিকাশসূত্রের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। সুতরাং ইতিহাসের "বিকল্প" বিকাশপ্রক্রিয়ার ক্রিয়াক্ষেত্র সীমিত ও তা শর্তনির্ভর প্রকৃতির।

বিজ্ঞান হিসেবে ইতিহাসের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে সমাজ বিকাশের গতির সেই ক্ষেত্রে, যা আর্থসামাজিক ব্যবস্থার তত্ত্বের সাথে সরাসরিভাবে যুক্ত। এই ক্ষেত্রটিতেই অতীতসম্পর্কিত বস্তুবাদী ও ভাববাদী ধারণার বৈপরিত্য প্রতিফলিত হয়। সভ্যতার

ইতিহাসে আর্থসামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে যে রূপগত বহুত্ব পরিদৃষ্ট হয় মার্কসবাদবিরোধী ঐতিহাসিকেরা তারই ভিত্তিতে সমাজ বিকাশের ইচ্ছানিরপেক্ষ বিকাশসূত্র অস্বীকার করে থাকেন। অথচ বাস্তব জগতে ঘটনা ও প্রপঞ্চের অ-পুনরানুষ্ঠান অথবা স্বাতন্ত্র্য সামাজিক বিকাশের বিশেষত্ব নয়। প্রকৃতিতেও প্রাকৃতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অ-পুনরানুষ্ঠান আছে, আছে প্রপঞ্চের বহুধর্মীতা ও রূপ বা ধরনের বহুত্ব, অথচ তারা ইচ্ছানিরপেক্ষ সূত্রাধীনে বিকাশমান (বিস্তারিত দেখুন দিয়াকোভ ২৮, পৃ. ৬৬-৬৭)। মার্কসবাদবিরোধী ঐতিহাসিকেরা আর্থসামাজিক ব্যবস্থা বা রূপায়ণ তত্ত্বের বিশ্লেষণে ইতিহাসসংক্রান্ত মার্কসবাদী ধারণাকে অর্থনৈতিক নির্ণেয়বাদের সাথে গুলিয়ে ফেলেন। প্রকৃতপক্ষে মার্কসীয় নিমিত্তবাদ মানুষের সচেতন উৎপাদনশীল কার্মকাণ্ড-বহির্ভূত স্বয়ংক্রিয় বিকাশসূত্র রূপে স্বীকৃত নয়, ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণায় ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া সরলরৈখিক বা একপেশে নয়, তার সাথে ঐতিহাসিক নিয়তিবাদের কোনো সম্পর্ক নেই। ইতিহাসের বিকাশসূত্র মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছানির্ভর নয়। এই সূত্র শুধু সামাজিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমেই প্রতিফলিত হয়। আর ঐ কর্মকাণ্ড ঐতিহাসিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করতে পারে, কখনো তার গতিকে মন্থর করতে পারে অথবা সাময়িকভাবে বিকাশের প্রধান প্রবণতাবিরোধী হতে পারে (দেখুন, এঙ্গেলস ৬, পৃ. ১৮০)। উল্লিখিত গতি স্বয়ংক্রিয় নয়। এ প্রশ্নে স্থূল যান্ত্রিকতাবাদের বিপরীতে মার্কসীয় ধারণানুযায়ী উৎপাদিকা শক্তির বিকাশে সমাজব্যবস্থা নিষ্ক্রিয় থাকে না; সমগ্র সমাজকাঠামোর সক্রিয়তা এবং তার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মাধ্যমেই ইচ্ছানিরপেক্ষ বিকাশ ঝোঁকটি আত্মপ্রকাশ করে এবং এক্ষেত্রে নির্ধারক ভূমিকা পালন করে ইতিহাসের সত্যিকার সৃষ্টিকর্তা– জনগণ। যেহেতু মানুষ তার অস্তিত্বের বস্তুগত শর্ত চয়নে স্বাধীন নয়, তাই তার ইতিহাস সৃষ্টির নিমিত্ত কর্মকাণ্ড যতই ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও স্বার্থপ্রণোদিত হোক না কেন তা ইচ্ছানিরপেক্ষ, মূর্ত অবস্থা দ্বারাই নির্ধারিত হয়।

ইতিহাসের গতি নির্ধারণকারী শক্তিসমূহ কী কী? এ প্রশ্নেও মার্কসবাদী ও অমার্কসবাদী ইতিহাসবিদদের মধ্যে বিস্তৃত বিতর্ক বিদ্যমান। এমনকি মার্কবাদীদের নিজেদের মধ্যেও এ প্রশ্নে ঐকমত্য নেই। মার্কসবাদী ঐতিহাসিকেরা এ প্রশ্নে বিভিন্ন সামাজিক প্রপঞ্চের উল্লেখ করে থাকেন। এসব প্রপঞ্চীয় ক্ষেত্রের মধ্যে আছে আর্থসামাজিক দ্বন্দ্ব; উৎপাদিকা শক্তি; উৎপাদন ও বিনিময়ব্যবস্থা; শ্রমবিভাগ; জনগোষ্ঠী; শ্রেণি ও জনগণের দীর্ঘস্থায়ী ক্রিয়াকলাপ; শ্রেণিসংগ্রাম; বিপ্লব; জনগণের চাহিদা ও স্বার্থ; আদর্শ ইচ্ছা ইত্যাদি (বিস্তারিত দেখুন, ইরেমিন ৩১, পৃ. ২২৫-২৩৬)।

ইতিহাসের গতি নির্ধারণকারী শক্তিসমূহ নিয়ে বিস্তৃত বিতর্কে না গিয়ে যা বলা উচিত তা হলো এই যে– প্রথমত, মূর্ত ও বিমূর্তের দ্বান্দ্বিক ঐক্যই ইতিহাস-প্রক্রিয়ার ভিত্তি। দ্বিতীয়ত, সমাজ বিকাশের মূর্ত সূত্রের সাথে ইতিহাসের স্রষ্টা জনগণের সচেতন কর্মকাণ্ডের আন্তঃসম্পর্কটি "স্বাধীনতা ও প্রয়োজনীয়তা" সমস্যার সাথেও সম্পর্কিত। লেনিনের মতে, (নারদনিকদের সমালোচনায় উক্তি) "ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকাকে বিনষ্ট করে না" (দেখুন, লেনিন ২৬, পৃ. ১৫৯)। নির্দিষ্ট কাল ও স্থানে প্রগতিশীল সামাজিক শক্তি, যেমন শ্রেণি, সংগঠন এবং ব্যক্তি অর্থাৎ বিকাশের ইচ্ছানিরপেক্ষ সূত্রটি প্রগতিবাহী সামাজিক শক্তির সক্রিয় কর্মকাণ্ডের মাধ্যমেই প্রতিফলিত হয়। এই সক্রিয় কর্মকাণ্ড চলতে থাকে নতুনের সাথে পুরাতনের কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এবং তা বিভিন্ন ক্ষেত্রে (স্থান ও কালভেদে) বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। কখনো তা সরাসরি অর্থনৈতিক লড়াইয়ের রূপ পরিগ্রহ করে, আবার কখনো তা রাজনৈতিক, দার্শনিক, ধর্মীয় রূপের মাধ্যমে প্রকৃত সত্যের "ছদ্মবেশ" ধারণ করে। অপেক্ষাকৃত উচ্চতর আর্থসামাজিক ব্যবস্থার দিকে ধাবমান দেশে উল্লিখিত লড়াইসমূহের রূপ বিভিন্ন স্থান ও কালে যা-ই হোক না কেন; ঐতিহাসিক বিকাশ অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, বিপরীতধর্মী সামাজিক শক্তির লড়াই কখনো একধাপে তার যৌক্তিক পরিণতিতে উপনীত হয় না। বিকাশের প্রবণতাসূত্রের বিপরীতে ইচ্ছানিরপেক্ষভাবেই প্রবণতাবিরোধী সূত্রও বিদ্যমান, যা ঐতিহাসিকভাবে অতীত শক্তির জড়ত্বের বাহক (যে শক্তি স্বেচ্ছায় পুরাতনকে নতুন কর্তৃক প্রতিস্থাপিত হতে দেয় না।)। অন্যদিকে সভ্যতার ইতিহাস, বিশেষত এ শতাব্দীতে পুনর্জন্মগ্রহণকারী (কারণ আদিতে সভ্যতা ছিল আদিম সাম্যবাদের আওতাভুক্ত) ও দ্রুত বিকাশমান সাম্যবাদী আর্থসামাজিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব মার্কসীয় ইতিহাস ধারণার মৌলিক ভিত্তিকে সত্য প্রমাণের মাধ্যমে জগতের ভবিষ্যৎ বিকাশে ঐতিহাসিক আশাবাদ প্রদর্শনের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিকে সুসংহত করেছে।

ইতিহাসের বস্তুবাদী মার্কসীয় ধারণার ভিত্তিমূল হলো আর্থসামাজিক ব্যবস্থার তত্ত্ব। আর্থসামাজিক ব্যবস্থার ধারণানুযায়ী নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক যুগ বিচারের প্রধান মানদণ্ড হলো ঐ যুগের অর্থনৈতিক বিকাশ স্তর নির্ণয় করা। সুনির্দিষ্ট আর্থসামাজিক ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় বিষয় হলো সুনির্দিষ্ট মাত্রায় বিকশিত (ও অবিরাম বিকাশমান) উৎপাদিকা শক্তির সাথে সাযুজ্যপূর্ণ নির্ধারক উৎপাদনসম্পর্কের সমন্বয়ে গঠিত উৎপাদন পদ্ধতি; আর আর্থসামাজিক ব্যবস্থা ধারণাটি শুধু উৎপাদন পদ্ধতিই নয়, সেই সাথে উপরিকাঠামোর সব উপাদানের দ্বান্দ্বিক সমাহার। সুতরাং শ্রেণিবৈপরীত্য, রাজনৈতিক মতাদর্শ ও সংগঠন, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মতাদর্শ ও প্রতিষ্ঠান– এ সবকিছুই

আর্থসামাজিক ব্যবস্থার ধারণার আওতাভুক্ত। আর তাই ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে আর্থসামাজিক ব্যবস্থার বিকাশের অর্থ শুধু উৎপাদন পদ্ধতির বিকাশই নয়। অন্যদিকে সমাজকাঠামোর অপেক্ষাকৃত উচ্চতর ব্যবস্থায় (Formation অর্থে) উত্তরণ উৎপাদন পদ্ধতিতে পরিবর্তনের ফলেই ঘটে। আবার ঐতিহাসিক তথ্য এ সত্যও উদ্‌ঘাটন করে যে, কখনো কখনো কোনো কোনো অঞ্চলে যুদ্ধবিগ্রহ ও বিদেশি আগ্রাসনের ফলে আর্থসামাজিক ব্যবস্থার সাময়িক মৃত্যু ঘটেছে। ইতিহাসে এ ঘটনা তখনই ঘটেছে, যখন বিজয়ীরা অপেক্ষাকৃত নিচু স্তরের পশ্চাৎপদ আর্থসামাজিক ব্যবস্থার বাহক। ফলশ্রুতিতে পরাজিতদের দেশে প্রগতির বিপরীতে সাময়িক বিপর্যয় ও প্রত্যাবৃত্তি ঘটে। ঐতিহাসিক বিকাশে যুদ্ধবিগ্রহ, বিদেশি আগ্রাসনসহ বহিঃউপাদানের ভূমিকা বহুবিধ এবং সে সম্পর্কে মার্কস সুস্পষ্টভাবেই (উদাহরণসহ) বলেছেন যে, "বিজয়ী বিদেশি পরাজিতদের দেশে তিন ধরনের প্রভাব বিস্তারে সক্ষম। বিজয়ীরা পরাজিতদের ওপর নিজেদের উৎপাদন পদ্ধতি চাপিয়ে দিতে সক্ষম (যেমন ব্রিটিশরা আয়ারল্যান্ডে ও ভারতে পুঁজিবাদ আমদানি করে) অথবা তারা (বিজয়ীরা) পরাজিতদের বিদ্যমান পশ্চাৎপদ উৎপাদন পদ্ধতিকে অপরবর্তিত রাখে এবং তাদের (পরাজিতদের) কর, ট্যাক্স ইত্যাদি প্রদান করে বিজয়ীদের সন্তুষ্ট রাখে (যেমন তুর্কি ও রোমান বিজয়ীদের ইতিহাস), অথবা বিজয়ীরা পরাজিতদের দেশে দুই দেশে বিরাজমান উৎপাদন পদ্ধতির একটি সংশ্লেষিত রূপ সৃষ্টি করে (যেমন অংশত জার্মানিক বিজয়ীদের ইতিহাস)" (দেখুন, মার্কস, ৩৪, পৃ. ৭২৩-৭২৪)।

ঐতিহাসিকদের অনেকেই মনে করেন যে, "যেহেতু বাস্তব ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া বহুমুখী ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার রূপও অতিমাত্রায় ভিন্ন তাই আর্থসামাজিক ব্যবস্থার পঞ্চস্তরীয় তত্ত্ব (অর্থাৎ আদিম সাম্যবাদ, দাসব্যবস্থা, সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ, সাম্যবাদ) আদৌ সন্তোষজনক তত্ত্ব নয়। এক্ষেত্রে ঐতিহাসিকেরা যা উল্লেখ করে থাকেন তা হলো– বহু ধরনের সামন্তবাদ, বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রূপের দাসব্যবস্থা ইত্যাদি (দেখুন, হরোউইচ ১২)। আবার প্রাচ্যবিশারদ ঐতিহাসিকদের অনেকেই "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি"-ভিত্তিক আর্থসামাজিক ব্যবস্থাকে প্রাচ্যের বিশেষত্ব হিসেবে উল্লেখ করেন। যদিও মার্কস ও এঙ্গেলস ১৮৭০-১৮৯৪ কালপর্বে এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি প্রকল্পটি ভ্রান্ত প্রমাণিত করেন, তথাপি মার্কসবাদী-অমার্কসবাদী নির্বিশেষে অনেকেই তাদের মত প্রমাণের জন্য মার্কসের শুরুর দিকের লেখা পুস্তক-প্রবন্ধ উদ্ধৃত করে থাকেন (এ বিষয়ে বিস্তৃত দেখুন, বারকাত ৪, পৃ. ১-২৭)। তদুপরি প্রাক্-পুঁজিবাদী চীনের (কারণ এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতির সমার্থক

সামাজিক বিজ্ঞানীরা চীনকেই প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসাবে গণ্য করেন) গত তিন হাজার বছরের ইতিহাসের প্রধান উপাদানসমূহ বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, সেখানে ঐতিহাসিক বিকাশের কোনো স্তরেই এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতিস্থ উপাদানসমূহ নিয়ামক ভূমিকা পালন করেনি এবং প্রাক্-পুঁজিবাদী চীনের ইতিহাস হলো দাস ও তৎপরবর্তী সামন্তযুগের ইতিহাস (বিস্তারিত দেখুন, বারকাত ৫, পৃ. ১১১-১৪০)। মার্কসবাদী আর্থসামাজিক বিকাশের পঞ্চস্তরীয় তত্ত্বের বিপরীতে বেশকিছু ইতিহাসবিদ মনে করেন যে, দাস ও সামন্তবাদী উৎপাদনসম্পর্ক ভিন্ন প্রকৃতির নয় বিধায় উভয়ে মিলে একটি "একক প্রাক্-পুঁজিবাদী" আর্থসামজিক ব্যবস্থার জন্ম দেয় (দেখুন বারকাত ৩, পৃ. ৬৩-৬৪)। উল্লেখ্য, সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক তথ্যাবলী উল্লিখিত ধারণার সাথে আদৌ সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আরো উল্লেখ্য, "দাস উৎপাদন পদ্ধতির" ধারণাটি প্রায়শ অবমূল্যায়িত হয়ে তাকে, অন্যদিকে "সামন্ত উৎপাদন পদ্ধতির" প্রশ্নে তা অতিমূল্যায়িত হয় (দেখুন, নিকিফোরভ ১৯, পৃ. ৩৫৩)। যেমন প্রাচীন গ্রিস রাজ্যের "হিলোতেস" সম্পর্ক (যার গ্রিক অনুবাদ "বন্দীত্বে আবদ্ধ") অথবা পুরাকালীন আধা দাসনির্ভরতাকে অনেকেই সামন্তবাদের বাহক হিসেবে মনে করেন। প্রকৃত বিচারে 'হিলোতেস" অর্থাৎ প্রাচীন স্পার্তার ক্রীতদাস বা ভূমিদাস প্রথা দাসব্যবস্থার চেয়েও আদিম ব্যবস্থা (দেখুন, করোভকিন ১০, পৃ. ১৮২-১৮৮)। দাসব্যবস্থা হলো একমাত্র উৎপাদনব্যবস্থা, যেখানে প্রধান উৎপাদক– দাসকে উৎপাদনের উপায় হিসেবে গণ্য করা হয়। আর সামন্তবাদ হলো শ্রেণিবিভক্ত আর্থসামাজিক ব্যবস্থার সেই স্তর— একমাত্র যেখানে সরাসরি উৎপাদককে উৎপাদনের উপায় ও যন্ত্রাদি সরবরাহ করা হয়। শুধু তা-ই নয় দাস ও সামন্তযুগে অর্থ-পণ্যসম্পর্কের বিকাশ অভিন্ন ফল প্রসব করে। সামন্তযুগে প্রধান শোষিত উৎপাদকশ্রেণি– কৃষকের সম্পদের কারণে ব্যবকলন সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, এবং তারই ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ পুঁজিবাদী আর্থসামাজিক ব্যবস্থার উদ্ভবের পূর্বশর্ত সৃষ্টি হয়। সুতরাং দাস, সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদ শোষণভিত্তিক আর্থসামাজিক ব্যবস্থা হলেও তাদের মধ্যে "বিশেষ" পার্থক্য বিদ্যমান।

প্রাক্-পুঁজিবাদী সমাজের ইতিহাস লিখিত ইতিহাসের প্রধান বিষয়। উপরোল্লিখিত দাস ও সামন্তবাদী যুগের ইতিহাস-সমস্যাকে কেন্দ্র করে বলা সম্ভব যে– **প্রথমত,** দাস সমাজের পণ্যভিত্তিক খামার ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিকাশ ঘটানোর আগে উক্ত সমাজকে বহু পথ অতিক্রম করতে হয়েছে; আর দাস যুগের এই আদি পর্বে রাষ্ট্রীয় ও গোষ্ঠীভিত্তিক মালিকানা ও "হিলোতেস" ধরনের আদিম শোষণপদ্ধতি বিরাজমান ছিল। দাস যুগের সর্বস্তরেই বিদ্যমান বলপ্রয়োগে সম্পত্তি ও দেশ দখলের ব্যাপারটি

তার (দাস যুগের) আদি পর্বে অন্যান্য পর্বের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অধিকতর সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। ***আর শ্রেণিসমাজ ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপজাতি-গোষ্ঠীর সর্দার ও নেতাদের নিয়ামক শ্রেণিতে রূপান্তরের মাধ্যমে ঘটে থাকে।*** সুতরাং উল্লিখিত সব পরিবর্তনের শেষাবধি ভিত্তি অর্থনৈতিক কারণের মধ্যেই নিহিত। দ্বিতীয়ত, প্রাক্-পুঁজিবাদী দাস সমাজ থেকে সামন্তবাদী সমাজে উত্তরণপর্ব উদ্‌ঘাটনে ঐতিহাসিকদের অনেকেই মার্কসবাদী ধারণার যান্ত্রিক প্রয়োগ ঘটিয়ে থাকেন। যেমন ঐতিহাসিক জানেন যে, উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ স্তরের দৃষ্টিতে প্রত্যেক আর্থসামাজিক ব্যবস্থা তার পূর্ববর্তীর চেয়ে অগ্রগামী। তা জেনেই ঐতিহাসিক সামন্তবাদের শুরুতে দাস যুগ অথবা প্রাচীন যুগের শেষপর্যায়ের তুলনায় অধিকতর বিকশিত উৎপাদিকা শক্তি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন এবং শেষপর্যন্ত অকৃতকার্য হন। সরাসরি বলা উচিত যে, এ ধরনের অনুসন্ধান একটি পদ্ধতিতাত্ত্বিক ভ্রান্তি। কারণ, প্রত্যেক আর্থসামাজিক ব্যবস্থা সেই উৎপাদিকা শক্তি সৃষ্টি করে, যা উন্নত ব্যবস্থার দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু এই রূপান্তর বা উত্তরণ ঘটে ঐতিহাসিকভাবে দীর্ঘকালব্যাপী (যদি প্রাক্-পুঁজিবাদী ব্যবস্থা হয়) এবং রূপান্তরকালের সমাপ্তি ঘটে সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে, উৎপাদন ক্ষেত্রের পরিবর্তনের প্রভাবে পরিবর্তন হয় অর্থনৈতিক সম্পর্ক, যা পরে মানুষের চৈতন্যে প্রভাব বিস্তার করে এবং তারই প্রক্রিয়ায় মানুষ তার জীবনকে পুনর্গঠিত করতে উদ্বুদ্ধ হয়। আর অপেক্ষাকৃত ধীর গতিতে বিকাশমান প্রাক্-পুঁজিবাদী কাঠামোতে উল্লিখিত প্রক্রিয়ার জীবনকাল যে কয়েক শত বছর হয়ে থাকে, সেটা স্বাভাবিক। যেমন চীনের ক্ষেত্রে দাস যুগ হলো খ্রী. পূ. ১৫ শতক থেকে খ্রীষ্টাব্দ তৃতীয় শতক পর্যন্ত, আর সামন্ত যুগ– খ্রীষ্টাব্দ তৃতীয় শতক থেকে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত বিস্তৃত, অর্থাৎ শ্রেণিবিভক্ত প্রাক্-পুঁজিবাদী ইতিহাসের বয়সকাল প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর (বিস্তারিত বিশ্লেষণ দেখুন, বারকাত ৫, পৃ. ১-৩৫)।

কঠোর নির্মম শ্রেণিসংগ্রাম, বর্বর জনগোষ্ঠীর আক্রমণ, প্রাচীন উৎপাদন ও সংস্কৃতির সংকট ইত্যাদি হলো উল্লিখিত রূপান্তরে স্বাভাবিক অনুষঙ্গ। আর তাইই সামন্ত যুগের শুরুতে উৎপাদিকা শক্তি ও সংস্কৃতির বিকাশমাত্রা দাস যুগের শেষপর্বের তুলনায় স্বাভাবিকভাবেই অপেক্ষাকৃত নিচু স্তরের হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বিকাশের সাধারণ সমাজবিজ্ঞানীয় সূত্রটির বহিঃপ্রকাশ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যদি প্রাচীন যুগের উৎপাদিকা শক্তিকে আংশিকভাবে গ্রহণ না করে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করা হয়। যদি সামন্তবাদের সর্বোচ্চ বিকশিত উৎপাদিকা শক্তিকে প্রাচীন যুগের সর্বোচ্চ মাত্রায়

বিকশিত উৎপাদিকা শক্তির সাথে তুলনা করা হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে প্রথমটির মান দ্বিতীয়টি অপেক্ষায় অনেক উচ্চে অবস্থান করবে (প্রমাণস্বরূপ দেখুন, বার্নাল ১০)।

বিভিন্ন আর্থসামাজিক ব্যবস্থার অন্তর্গত বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলের সম্মুখ সংঘর্ষ, বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের চরিত্র নির্ধারিত হয় ঐসব দেশের আর্থসামাজিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমেই। যেমন সম্প্রসারণবাদী প্রবণতা অথবা নিজেদের শোষণপদ্ধতিকে বলপূর্বক অন্য দেশে প্রয়োগ ইত্যাদি শ্রেণিবিভক্ত সমাজব্যবস্থার অনুষঙ্গ। যেমন যুদ্ধবিগ্রহ, বিভিন্ন ধরনের বলপ্রয়োগ (অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরাসরি) ইত্যাদি হলো দাস সমাজের অস্তিত্বেরই পূর্বশর্ত। (বিপরীতধর্মী) শ্রেণিবিভক্ত সমাজের ইতিহাসের অধিকাংশই যুদ্ধের ইতিহাস। আর শান্তিপূর্ণ ক্ষুদ্র সময়টি যুদ্ধের শেষ নয়, তা শক্তির সাময়িক ভারসাম্যের লক্ষণ এবং পরবর্তী যুদ্ধে উত্তরণের প্রস্তুতি পর্বমাত্র (কংক্রিট ইতিহাস স্মরণ করুন)। যুদ্ধবিগ্রহ, বলপ্রয়োগ নিঃসন্দেহে শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শোষকদের স্বার্থ বহন করে এবং শেষাবধি তা অর্থনৈতিক স্বার্থেরই পরিচয়ক।

বিশ্ব ইতিহাসপ্রক্রিয়া বিশ্লেষণে "আর্থসামাজিক ব্যবস্থা" ধারণার অন্ধযান্ত্রিক অনুসরণ কাম্য নয়। কারণ, প্রকৃতিতেও যখন "রাসায়নিকভাবে নির্মল" প্রক্রিয়া অনুপস্থিত, তখন সমাজের ক্ষেত্রে সেটা ততোধিক সত্য...। নির্মল আর্থসামাজিক ব্যবস্থা বলে কিছু নেই। মনে রাখতে হবে যে, বিশ্ব ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার প্রধান চরিত্র হলো সামাজিক বিকাশ বা গতির সাধারণ সূত্র ক্রিয়ার ক্ষেত্রে অসমতা ও অসমকালীনত্ব। বহু ধরনের ইচ্ছানির্ভর ও ইচ্ছানিরপেক্ষ শক্তির কারণেই তা ঘটে। যেমন সভ্যতার প্রাথমিক স্তরের বিকাশে প্রাকৃতিক শক্তির ভূমিকা মুখ্য, অর্থাৎ এ সময় বিকাশপ্রক্রিয়ায় প্রাকৃতিক-ভৌগলিক পরিবেশ অতিমাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সময়ের সাথে সাথে মানুষ অধিকতর হারে প্রকৃতির শক্তি সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে তাকে বশ করতে শিখেছে।

বিশ্ব ঐতিহাসিক পরিসরে বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুগে একই জনগোষ্ঠী বিকাশের প্রধান বাহক ছিল না। লক্ষণীয় যে, যে জনগোষ্ঠী সমসাময়িক যুগে সর্বোচ্চ মাত্রায় বিকশিত উৎপাদিকা শক্তির বাহকের ভূমিকা পালন করেছে বিকাশের প্রধান ভূমিকাও তাদের হাতেই ন্যস্ত ছিল। ইতিহাসের দৃষ্টিতে এমন কোনো জনগণ বা দেশের অস্তিত্ব নেই, যারা নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রগতির বাহক। ইতিহাসে জন্মসূত্রে পশ্চাৎপদ অথবা জন্মসূত্রে অগ্রগামী জনগণ বা অঞ্চল বলতে কিছু নেই, থাকতে পারে না। সভ্যতার ইতিহাসে প্রগতির অগ্নিপ্রজ্জ্বালনকারী বহু দেশ ও জাতি আজ পশ্চাৎপদ। এর অর্থ এই নয় যে,

এই পশ্চাৎপদতা "চিরন্তন" অথবা অপূরণযোগ্য। আবার আধুনিক ইতিহাসে এমনও অনেক দেশ ও জাতির নমুনা আছে, যারা আজ অগ্রসর; কিন্তু অতীতে পশ্চাৎপদ ছিল, সেই সাথে তাদের অগ্রসরতার মাত্রাও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন। যেমন আধুনিককালে হল্যান্ড, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের ইতিহাস। আবার এটাও সত্য নয় (যা অনেকেই সত্য বলে থাকেন) যে, অপেক্ষাকৃত বৃহৎ দেশ ও জাতিই অধিকাংশ ক্ষেত্রে সভ্যতার প্রধানতম বাহক। যেমন সামন্তবাদের অবক্ষয়ের ইতিহাসে প্রমাণিত যে, অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল আর্থসামাজিক সম্পর্ক অপেক্ষাকৃত বৃহৎ দেশে জন্মগ্রহণ করেনি, তা করেছে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দেশ– হল্যান্ডে। কিন্তু হল্যান্ডের বিপ্লব ইউরোপীয় ভূখণ্ডে বুর্জোয়া সামাজিক সম্পর্ককে জয় করতে পারেনি। এটি সম্ভব হয়েছে শুধু বৃটেন ও ফ্রান্সে (শিল্পবিপ্লবের ফলে)। আবার অন্যদিকে, এককালীন বৃহৎ সামন্তবাদী দেশ পরবর্তী সময়ে দুর্বলতম কাঠামোতে রূপান্তরিত হয়েছে, যেমন স্পেনের সামন্তবাদ অথবা অটোমান সাম্রাজ্য।

"সর্বজনীনতা" প্রায়শ "বিশেষের" মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। আর তাই, যখন বিশ্ব ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া সরলরৈখিক নয়, তখন প্রক্রিয়া-অভ্যন্তর "বিশেষ" প্রপঞ্চসমূহ বিশ্লেষণ করতে হবে। আবার যেহেতু অপেক্ষাকৃত "নির্মল" বা "সুস্পষ্ট" উপাদান বিকাশপ্রক্রিয়ার প্রধান প্রবণতা নির্দেশ করে, সুতরাং সেটিকেই ঐতিহাসিক বিকাশসূত্র উদ্‌ঘাটনের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিতে হবে। কারণ, শেষাবধি শেষোক্তটি নির্দিষ্ট দেশে বা অঞ্চলে আর্থসামাজিক ব্যবস্থার প্রধান পরিচায়ক। শ্রেণিবিভক্ত সমাজের ইতিহাসে স্ফটিকী বিশুদ্ধ আর্থসামাজিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব নেই, থাকতেও পারে না। আর তাই দাসব্যবস্থার অভ্যন্তরেই দেখা যায় আদিম অথবা সামন্ত যুগের উপাদান, অথবা সামন্তবাদে দাস যুগ অথবা পুঁজিবাদের উপাদানসমূহ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে; আর পুঁজিবাদে–সামন্ত ও দাস যুগের উপাদান। তাই সঙ্গত কারণেই যেকোনো ঐতিহাসিক যুগের ইতিহাসও পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠে ঐ যুগের দৃষ্টিতে আর্থসামাজিক ব্যবস্থার প্রধান দিকটির সাথে সাথে অ-প্রধান দিকসমূহ যা ঐ যুগের দৃষ্টিতে অ-প্রধান আর্থসামাজিক ব্যবস্থার অস্তিত্বেরই প্রতিফলনমাত্র। সুতরাং নির্দিষ্ট শ্রেণিবিভক্ত সমাজের ইতিহাসপ্রক্রিয়াও সুনির্দিষ্ট আর্থসামাজিক ব্যবস্থার নির্ভেজাল– একশত ভাগ বিশুদ্ধ প্রতিফলন নয়। অতীত সামাজিক বাস্তবতার একশত ভাগ বিশুদ্ধ প্রতিফলন ঘটানোর দায়িত্ব শুধু ইতিহাস নয়, কোনো সামাজিক বিজ্ঞানের কোনো শাখারই নয়।

সমাজ সমগ্রাতিক ইতিহাস– বস্তুত আর্থসামাজিক ব্যবস্থার ইতিহাস। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে একই আর্থসামাজিক ব্যবস্থা বিভিন্ন রূপে বিকশিত হলেও সারার্থের বিচারে ভিন্নতা নেই। প্রত্যেক আর্থসামাজিক ব্যবস্থারই সাধারণ কিছু নির্দেশক আছে। আবার কোনো আর্থসামাজিক ব্যবস্থাই নির্ভেজাল "বিশুদ্ধ" নয়। বিভিন্ন সময় ও স্থানভেদে একই আর্থসামাজিক ব্যবস্থার 'রূপগত ভিন্নতা' ঐতিহাসিকভাবেই প্রমাণিত সত্য। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিভিন্ন সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশগত কারণে উৎপাদনের উপায়ের ওপর সর্বসাধারণের মালিকানাভিত্তিক শ্রেণি ও শ্রেণিবৈপরিত্যহীন আদিম সাম্যবাদী ব্যবস্থা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপে বিকশিত হয়েছে এবং কোনো কোনো অঞ্চল উক্ত ব্যবস্থা থেকে পরবর্তী স্তর– দাসব্যবস্থায় উত্তীর্ণ হয়েছে, কেউ কেউ আবার দাসব্যবস্থা না মাড়িয়েই সরাসরি সামন্তবাদে গমন করেছে। পুরাকালীন প্রাচ্যের দাসভিত্তিক স্বৈরতন্ত্র এবং গ্রিক ও রোমের চিরায়ত দাসব্যবস্থা যে একই দাসব্যবস্থার ভিন্ন ভিন্ন রূপ তা তাদের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্যের কারণেই অবিশ্বাস্য মনে হয়। সামন্তবাদের ইতিহাস আরো বিচিত্র। বিভিন্ন মহাদেশে সামন্তবাদের জন্ম ও বিকাশে রূপগত ভিন্নতা তো সহজেই লক্ষ করা যায়। এমনকি যদি শুধু পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশের ঐতিহাসিক উদাহরণ সংগ্রহ করা যায়, তাহলেও সে ভিন্নতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফ্রান্স, জার্মান, স্পেন, ইতালি ও বৃটেনে সামন্তবাদী সমাজকাঠামো আদৌ অনুরূপ ছিল না। এমনকি সামন্তবাদী বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যকে অনেকেই সামন্তবাদী বলে মেনে নিতে চান না, বিপরীতে তাকে এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতির অন্তর্গত বিবেচনা করা হয় (দেখুন, মমজান ১৩, পৃ. ৬১-৬২)। একই সামন্তবাদী কাঠামোর বিভিন্ন পরিবর্তের কারণ কী? আসলে সামন্তবাদী আর্থসামাজিক ব্যবস্থা সরাসরি আদিম সাম্যবাদী ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত নাকি দাসব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত সেটাই বহুপদী পরিবর্তীর অন্যতম কারণ। ঐতিহাসিক বিকাশের অপেক্ষাকৃত উচ্চতর– পুঁজিবাদী স্তরেও উল্লিখিত রূপগত বহুপদী পরিবর্তীর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। যেমন ইংল্যান্ডে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটেছিল সামন্তপ্রভু "নয়া জেনট্রিদের" সহায়তায়, আর ১৬৮৮-৮৯ সালের বিপ্লবে সদ্য জন্মগ্রহণকারী বুর্জোয়াদের সাথে সামন্তপ্রভুদের জোটবদ্ধতা ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা। পরবর্তী সময়ে পুঁজিবাদের বিকাশ যদিও সামন্তবাদী উৎপাদনসম্পর্কে ও সামন্ত প্রতিষ্ঠানিক কাঠামোসমূহের গুরুত্ব হ্রাস করে; কিন্তু সামন্তবাদের প্রতিভূ হিসেবে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র ও হাউস অব লর্ডস বহাল থেকে যায়। অন্যদিকে বৃটেনের তুলনায় ফ্রান্সে পুঁজিবাদের উন্মেষ ঘটে বুর্জোয়াদের সাথে সামন্ত রাজতন্ত্রের সম্মুখসংঘর্ষে (অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে)। আর বৃটেন ও ফ্রান্সের তুলনায়

যুক্তরাষ্ট্রে পুঁজিবাদের উন্মেষ ঘটে সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপে—সামন্তবাদের অনুপস্থিতিতে। উল্লেখ্য, শুধু অর্থনৈতিক ভিত্তির প্রশ্নেই নয় উপরিকাঠামোগতভাবেও একই আর্থসামাজিক ব্যবস্থার আওতায় বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলের মধ্যে রূপগত ভিন্নতা লক্ষণীয়। একই পুঁজিবাদী আর্থসামাজিক ব্যবস্থার আওতায় বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশে বিভিন্ন রকমের রাষ্ট্রপরিচালনা পদ্ধতি বিরাজমান। যেমন কোথাও তা রাজতন্ত্র, কোথাও সাংবিধানিক রাজতন্ত্র, কোথাও আবার বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, আবার কোথায়ও ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা। আবার বুর্জোয়া মতাদর্শগত উপরিকাঠামোর ক্ষেত্রে উল্লিখিত বহুপদী পরিবর্তীর বিস্তৃতি অন্য সবকিছুর তুলনায় অধিক মাত্রায়।

বিভিন্ন আর্থসামাজিক ব্যবস্থার জন্ম-বিকাশ-বিলুপ্তির ইতিহাস বিভিন্ন। এদিক থেকে প্রথম শ্রেণিভিত্তিক সমাজব্যবস্থা— দাসব্যবস্থার জন্ম-ইতিহাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সাধারণভাবে "সামাজিক বিপ্লব" বলতে যা বোঝানো হয়ে থাকে দাস যুগের জন্ম ইতিহাসে তার অস্তিত্ব কতটুকু? দীর্ঘ ও যন্ত্রণাদায়ক প্রক্রিয়ায় প্রথম শ্রেণিবিভক্ত সমাজ— দাস সমাজ জন্মগ্রহণ করেছে। আদিম সমাজের ভাঙ্গন ও সামাজিক উচ্চশ্রেণি কর্তৃক ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে পদানত করে যে দাস সমাজ আবির্ভূত হয়েছে, সেখানে "বিপ্লবীদের" ভূমিকা কী— এ ধরনের প্রশ্নে মার্কসবাদী ঐতিহাসিকদের মধ্যেও বিতর্ক রয়েছে। আদিম সমাজের দাস সমাজে রূপান্তরে "সামাজিক বিপ্লবের" ভূমিকা যা-ই হোক না কেন, উল্লিখিত রূপান্তরের ফলেই ভেঙে পড়েছে লক্ষ-কোটি বছরের অনড় অবস্থা। তা সামাজিক প্রগতির ক্ষেত্রে বিরাট অগ্রযাত্রা, কারণ তা সর্বোপরি মনুষ্যশ্রম প্রয়োগের ক্ষেত্র বিস্তৃত করে উৎপাদিকা শক্তির অগ্রযাত্রা ত্বরান্বিত করেছে। ঠিক এ প্রসঙ্গটিকেই সুস্পষ্ট করে এঙ্গেলসের ভাষ্য হলো, "শুধু দাস সমাজই কৃষি ও শিল্পের শ্রমবিভাজনের বিস্তৃতি সম্ভব করে প্রাচীন সভ্যতার গ্রিক সভ্যতার সংস্কৃতি বিকাশের শর্ত সৃষ্টি করেছে। দাসব্যবস্থা ছাড়া গ্রিক রাষ্ট্র, গ্রিক কৃষ্টি ও গ্রিক বিজ্ঞানের অস্তিত্ব নেই। দাসব্যবস্থা ছাড়া রোমক সাম্রাজ্য কল্পনা করা সম্ভব নয়। আর গ্রিক ও রোম কর্তৃক সৃষ্ট ভিত্তি ছাড়া আধুনিক ইউরোপের অস্তিত্ব নেই" (দেখুন, এঙ্গেলস ৩৫, পৃ. ১৮৫-১৮৬)।

একটি শ্রেণিবিভক্ত আর্থসামাজিক ব্যবস্থা থেকে অন্য একটিতে উত্তরণ নিঃসন্দেহে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর ক্ষয়ক্ষতি ও দুঃখ-দুর্দশার সাথে সম্পৃক্ত। দাস সমাজের উৎপত্তি ও বিকাশ— মানুষ শিকারের একটি ব্যাপক সংগঠিত পদ্ধতি ছাড়া কল্পনাতীত। দাস যুগের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম যন্ত্রণাদায়ক শোষণপদ্ধতিভিত্তিক সামন্তবাদী ব্যবস্থার সমগ্র যুগটিই শ্রেণিসংগ্রামের যুগ এবং সরাসরি উৎপাদকদের যেকোনো বিদ্রোহ

কঠোর হস্তে দমনের যুগ। পুঁজির প্রাথমিক সঞ্চয়নের যুগ– আমানবিক শোষণের যুগ (যার ঐতিহাসিক বর্ণনা পাওয়া যাবে মার্কসের 'পুঁজি' গ্রন্থের, প্রথম খণ্ডের, ২৪তম অধ্যায়ে)। সামাজিক প্রগতির তৎকালীন বাহক পুঁজিবাদ– ছড়িয়ে পড়েছিল সারা বিশ্বে এবং নাম না জানা অগণিত মানুষের হাড়গোড়ের বিনিময়ে নির্মাণ করেছে দানবিক উৎপাদিকা শক্তি (ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের ইতিহাসও তার সাক্ষ্য, দেখুন, বারকাত ২, পৃ. ৮৮)।

ঐতিহাসিক যা উদ্‌ঘাটন করেন তা হলো সুনির্দিষ্ট সমাজের বিকাশগতি ও গতিসূচক উপাদানসমূহ। সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা-প্রশাখার তুলনায় ঐতিহাসিকের বিশ্লেষণাধীন কালপর্ব অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ এবং তা তত দূর বিস্তৃত, যত দূর বিস্তৃত হলে উল্লিখিত গতির জন্ম থেকে শুরু করে গতিকে সূত্রবদ্ধকরণ সম্ভব, আর এই গতিসূত্রবদ্ধকরণের ক্ষেত্রে প্রায়শ যৌক্তিকভাবেই একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়ে থাকে, তা হলো বিভিন্ন ঐতিহাসিক কালের পার্থক্য সূচনাকারী ধারণা "ঐতিহাসিক যুগ"।

"ঐতিহাসিক যুগ" ধারণাটির পদ্ধতিগত মূল্য প্রধানত সেখানেই যে, তা ঐতিহাসিক কালবিভাজনের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। আজকের যুগের অধিকাংশ মার্কসবাদী ঐতিহাসিকদের মতে, আর্থসামাজিক ব্যবস্থা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন প্রকৃতির, একটি আর্থসামাজিক ব্যবস্থার অন্যটিতে রূপান্তরের ধরন ও বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন এবং পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোনো সময়কালের উল্লেখ করা প্রায় অসম্ভব, যখন সারা বিশ্বে একই আর্থসামাজিক ব্যবস্থা বিরাজমান ইত্যাদি। "ঐতিহাসিক যুগ" বিচারের মার্কসীয় পদ্ধতিটি নিঃসন্দেহে লেনিনের অবদান। লেনিনের মতে, "বৃহৎ ঐতিহাসিক যুগে অংশের গতি কখনো বা সম্মুখে, কখনো বা পেছনে, সেই গতি– গতির গড় নমুনা ও গড় হারের সাথে পার্থক্যযুক্ত। নির্দিষ্ট যুগে আংশিক ঐতিহাসিক গতি কত দ্রুত ও কত সাফল্যের সাথে বিকশিত হচ্ছে, তা আমরা জানতে পারব না। তবে আমরা অবশ্যই জানতে পারি এবং জানি যে, নির্দিষ্ট যুগের প্রধান বাহক, কোন শ্রেণি ঐ যুগের কেন্দ্রে অবস্থান করছে– বিভিন্ন দেশের খণ্ডিত ইতিহাসের বিপরীতে নির্ধারণ করতে হবে বিভিন্ন "যুগের" পার্থক্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। নির্দিষ্ট যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে জ্ঞানার্জনই যেকোনো দেশের সুগভীর বৈশিষ্ট্য উদ্‌ঘাটনে সহায়ক হতে পারে" (দেখুন, লেনিন, ২৭, পৃ.১৪১-১৪২)। সুতরাং "ঐতিহাসিক যুগ"-সংক্রান্ত লেনিনীয় ধারণা শ্রেণিদৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন এবং "যুগের" সীমারেখা আন্তর্জাতিক। "ঐতিহাসিক যুগ"-সংক্রান্ত লেনিনীয় ধারণার সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে লেনিন কর্তৃক প্রথম বিশ্বযুদ্ধ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে। লেনিনের মতে,

১৯১৪-১৮ সালের বিশ্বযুদ্ধ হলো "দুই গ্রুপ বৃহৎ শক্তি কর্তৃক সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতি চালু রাখার ফলাফল। সাম্রাজ্যবাদী যুগের সব সম্পর্ক থেকে তা উদ্ভূত ও জীবনীশক্তিপ্রাপ্ত। ঐ একই যুগ আবার জাতিগত নির্যাতনবিরোধী রাজনীতি ও বুর্জোয়াবিরোধী সর্বহারা রাজনীতির জন্মদান করে এবং তাতে শক্তি সঞ্চার করে। আর সেখান থেকেই প্রথমত, বৈপ্লবিক গণ-অভ্যুত্থান ও গণযুদ্ধ; দ্বিতীয়ত, বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সর্বহারার যুদ্ধ ও বিদ্রোহ; তৃতীয়ত, উভয়বিধ বিপ্লবী যুদ্ধের ঐক্য ইত্যাদি– সম্ভব ও অনিবার্য হয়ে ওঠে" (দেখুন, লেনিন ২৮ পৃ. ১৩৪-১৩৫)।

আদিম, দাস, সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদ– সভ্যতার বিকাশের পাঁচটি বৃহৎ পর্ব। সেই সাথে এগুলোই ইতিহাসশাস্ত্রের গবেষণার বিষয়বস্তু। উল্লিখিত আর্থসামাজিক ব্যবস্থাসমূহের একটিতে অন্যটির বৈপ্লবিক রূপান্তরই বিকাশের সাধারণ সমাজবিজ্ঞানীয় গতিধারা। বাস্তব ইতিহাস গবেষণার অভিজ্ঞতা তার সাক্ষ্য বহন করে। "কোনো সামাজিক ব্যবস্থাই তার পক্ষে যা যথেষ্ট এমন সমস্ত উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ঘটার আগে ধ্বংস হয় না এবং উৎপাদনের নতুন নতুন উন্নততর সম্পর্ক পুরোনো সম্পর্কগুলোর স্থান দখল করে না" (দেখুন ৮, পৃ. ১৩-১৪)। এক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে সুনির্দিষ্ট অঞ্চলের ইতিহাসের কথা নয়, বলা হচ্ছে বিশ্ব ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার কথা। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা উচিত যে, যদিও দাস সমাজব্যবস্থা প্রথম শ্রেণিবিভক্ত সমাজব্যবস্থা, তথাপি সব দেশ ও জনগোষ্ঠীকে এই ব্যবস্থার আওতায় জীবনধারণ করতে হয়নি। ইতিহাসে সাক্ষ্য আছে, অনেক ক্ষেত্রেই দাস সমাজ থেকে নয়, পুরাকালীন গোষ্ঠী-উপজাতিভিত্তিক শ্রেণিহীন সমাজের সরাসরি উত্তরণ ঘটেছে সামন্তবাদে। এসব উদাহরণ আর্থসামাজিক ব্যবস্থার ক্রমান্বয়ে একটি অপরটিতে রূপান্তরের ঐতিহাসিক সূত্রের সাথে আদৌ অসঙ্গতিপূর্ণ নয় (অনেকেই উল্টোটা মনে করেন)। সম্ভবত, যতক্ষণ পর্যন্ত বিশ্ব ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় দাস আর্থসামাজিক ব্যবস্থার জীবনীশক্তিহীনতা প্রমাণিত না হয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সামন্তবাদী সম্পর্কেরও উদ্ভব ঘটেনি এবং ঘটতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে জার্মান উপজাতিদের সামন্তবাদে গমনের ইতিহাস। দাসভিত্তিক রোমান সাম্রাজ্যের পতনে জার্মান উপজাতিদের যথেষ্ট ভূমিকা সত্ত্বেও বিশ্বপরিসরে দাসব্যবস্থার জীবনীশক্তি নিঃশেষিত হওয়ার কারণেই জার্মানরা দাসব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে বিকশিত না হয়েই সরাসরি সামন্তবাদে অনুপ্রবেশ করে। সুতরাং পশ্চাৎপদ তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের কেউ কেউ যে সাম্রাজ্যবাদের অবক্ষয় ও সমাজতন্ত্রের জয়ের বর্তমান ঐতিহাসিক যুগে পুঁজিবাদের সব যন্ত্রণা এড়িয়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণে সক্ষম, সেটি তাত্ত্বিক ও বাস্তব ঐতিহাসিক উদাহরণ উভয় দৃষ্টিতেই প্রমাণিত সত্য।

অমার্কসীয় ও মার্কসীয় ইতিহাস চিন্তা: মর্মার্থটা দাঁড়াল কী?

মার্কসীয় ইতিহাস চিন্তার বিপরীতে অমার্কসীয় ইতিহাস চিন্তার বিভিন্ন ধারা-উপধারানুযায়ী

১. নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানের ইতিহাস সমসাময়িক আর্থসামাজিক ব্যবস্থার জটিল প্রক্রিয়ার প্রতিফলন নয় অর্থাৎ অমার্কসীয় ইতিহাস চিন্তায় ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার সমগ্রকের ধারণা (holistic concept) স্বীকৃত নয়। ইতিহাস হলো বিচ্ছিন্ন ও পুনরানুষ্ঠান অক্ষম ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডের সমাহার। মাইক্রো-প্রক্রিয়ার ইতিহাসকে ঐতিহাসিক সমগ্রক থেকে বিচ্ছিন্ন ও যোগাযোগহীন প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সেক্ষেত্রে শেষপর্যন্ত যা ঘটে, তা হলো– "ঐতিহাসিকই ইতিহাসের স্রষ্টা", যা আদৌ বস্তুতান্ত্রিক বা বিজ্ঞানসম্মত নয়;

২. ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া আকস্মিকতায় পরিপূর্ণ, তাই তাকে সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়। ইতিহাসকে তার সামাজিক সত্তা "সচেতন মানুষের কার্মকাণ্ড" থেকে বিচ্ছিন্ন করে চিন্তা করা হয়;

৩. যেহেতু "অতীত ঘটনার হুবহু পুনরুৎপাদন সম্ভব নয়" অথবা ঐতিহাসিক অভিজ্ঞান "নিরঙ্কুশভাবে আপেক্ষিক", তাই ইতিহাস রচনার উৎস সম্পর্কে ছিদ্রান্বেষী সন্দেহ প্রকাশ করা হয়;

৪. ঐতিহাসিক তথ্য, ঘটনা ও প্রক্রিয়ার প্রধান প্রকাশবাহন– "সাধারণ বর্ণনা"। সুতরাং উক্ত প্রক্রিয়ার সাধারণীকরণ সম্ভব নয়, আর তাই ঐতিহাসিক বিকাশের মূর্ত স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব নয়;

৫. যেহেতু শ্রেণিবিভক্ত সমাজকাঠামো, বিশেষত পুঁজিবাদ– অনড় ও উত্তরণহীন সমাজকাঠামো, তাই তার ইতিহাসও অনুরূপ—অনড় ও উত্তরণহীন; এবং

৬. ঐতিহাসিক বিকাশের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কাঠামো ও উপরিকাঠামো (বা তার সুনির্দিষ্ট উপাদান) হয় সমশক্তিমান উপাদানমাত্র অথবা শেষোক্তটি প্রথমটির চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী দিকনির্দেশক।

অমার্কসীয় ইতিহাস চিন্তার বিপরীতে মার্কসীয় ইতিহাস চিন্তায়:

১. নির্দিষ্ট কালে নির্দিষ্ট স্থানের ইতিহাস হলো সুনির্দিষ্ট আর্থসামাজিক ব্যবস্থার ইতিহাস; যার উত্থান, বিকাশ ও পতন সুনির্দিষ্ট সূত্রাধীনেই

ঘটে থাকে এবং সূত্রটির দ্বান্দ্বিক যোগসূত্র হলো এই যে, তা একাধারে মূর্ত (objective) এবং অন্যদিকে ইতিহাসের প্রকৃত সামাজিক সত্তা হলো "সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যার্জনে নিয়োজিত মানুষের যৌথ প্রকৃতির কর্মকাণ্ড"। আর এই ইতিহাস বিশ্লেষণের পদ্ধতিতাত্ত্বিক ভিত্তি হলো ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, অর্থাৎ সমাজবিকাশের সাধারণ সূত্রাবলীসংক্রান্ত বিজ্ঞান, যা অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট উৎপাদনসম্পর্ক ও উৎপাদিকা শক্তির দ্বান্দ্বিক ঐক্য ও সংঘাতই সুনির্দিষ্ট সমাজ ইতিহাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য;

২. বাস্তব জীবনের উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনই ইতিহাসে শেষপর্যন্ত নিয়ামক শক্তি। অর্থাৎ রাষ্ট্র, রাজনীতি ও মতাদর্শগত সংগ্রামের ইতিহাসকে সংগ্রামরত সামাজিক শক্তি বা আর্থসামাজিক শ্রেণির অর্থনৈতিক স্বার্থের সাথে বিচ্ছিন্ন করে দেখা সম্ভব নয়। এই বিচ্ছিন্নতা আংশিক ইতিহাসের সাধারণীকরণ সম্ভাবনা বিলুপ্ত করে ইতিহাস বিকাশের সূত্র সৃষ্টিকে অসম্ভব করে তোলে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট জাতির বা নির্দিষ্ট যুগের অর্থনৈতিক বিকাশের সূত্র সৃষ্টিকে অসম্ভব করে তোলে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট জাতির বা নির্দিষ্ট যুগের অর্থনৈতিক বিকাশমাত্রাই হলো সেই প্রাথমিক ভিত্তি, যার ওপর গড়ে ওঠে সংশ্লিষ্ট জাতিটির রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, আইনের ধ্যান-ধারণা, শিল্পকলা; এমনকি তাদের ধর্মীয় ভাবধারা। যেহেতু মানুষ তার অস্তিত্বের বস্তুগত শর্ত চয়নে স্বাধীন নয়, তাই তার ইতিহাস সৃষ্টির নিমিত্তে কর্মকাণ্ড যতই ব্যক্তি-ইচ্ছা ও স্বার্থপ্রণোদিত হোক না কেন তা ইচ্ছানিরপেক্ষ, মূর্ত অবস্থা দ্বারাই নির্ধারিত হয়;

৩. উপরিকাঠামোর বিভিন্ন মৌল– ঐতিহাসিক বিকাশ নির্ধারণে নিষ্ক্রিয় নয়, তা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন কালে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার রূপ নির্ণয়ে প্রধান ভূমিকা রাখতে সক্ষম;

৪. ঐতিহাসিক বিকাশের ইচ্ছানিরপেক্ষ সূত্রটি প্রগতিবাহক সামাজিক শক্তির সক্রিয় কর্মকাণ্ডের মাধ্যমেই প্রতিফলিত হয়। এই সক্রিয় কর্মকাণ্ড চলতে থাকে নতুনের সাথে পুরাতনের কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এবং তা স্থান ও কালভেদে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। আবার বিকাশের প্রবণতা সূত্রের

বিপরীতে ইচ্ছানিরপেক্ষভাবেই প্রবণতাবিরোধী সূত্রও বিদ্যমান, যা ঐতিহাসিকভাবে অতীত শক্তির জড়ত্বের বাহক; যে শক্তি স্বেচ্ছায় পুরাতনকে নতুন কর্তৃক প্রতিস্থাপিত হতে বাধা প্রদান করে;

৫. বাস্তব ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় "সাধারণ" ও "সার্বজনীন" সর্বদায় "বিশেষের" মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। আর তাই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া বিশ্লেষণে "বিশেষ" প্রপঞ্চসমূহ বিশ্লেষিত হয়। আবার অপেক্ষাকৃত "নির্মল"/"বিশুদ্ধ" উপাদান যেহেতু বিকাশপ্রক্রিয়ার প্রধান প্রবণতা নির্দেশ করে সেহেতু সেটিকেই ঐতিহাসিক বিকাশসূত্র উদ্‌ঘাটনে প্রাধান্য দেওয়া হয়; এবং

৬. ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া সরলরৈখিক বা একপেশে নয়। আর সামাজিক গতির সাধারণ সূত্র ক্রিয়ার ক্ষেত্রে অসমতা ও অসমকালীনত্বই বিশ্ব ইতিহাসপ্রক্রিয়ার প্রধান চরিত্র। সভ্যতা বিকাশের পাঁচটি বৃহৎ পব– আদিম, দাস, সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদী আর্থসামাজিক ব্যবস্থার অন্তর্গত ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া অনুসন্ধানই ইতিহাসশাস্ত্রের বিষয়বস্তু। ঐতিহাসিকভাবেই প্রমাণিত যে, কোনো সমাজব্যবস্থাই তার পক্ষে যা যথেষ্ট এমন সমস্ত উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ঘটার আগে ধ্বংস হয় না এবং উৎপাদনের উন্নততর সম্পর্ক পুরোনো সমাজের কাঠামোর মধ্যে তাদের অস্তিত্বের বৈষয়িক অবস্থাগুলো পরিপক্ব হওয়ার আগে পুরোনো সম্পর্কগুলোর স্থান দখল করে না। একটি আর্থসামাজিক ব্যবস্থার পরবর্তী ব্যবস্থায় উত্তরণ অথবা সরাসরি তৎপরবর্তী যেকোনো ব্যবস্থায় গমনের সম্ভাবনাও ঐতিহাসিকভাবেই প্রমাণিত।

প্রবন্ধে ব্যবহৃত পরিভাষা

অদ্বৈতবাদী— monistic
অধিকাঠামা বা উপরিকাঠামো — super structure
অধ্যাত্মবাদিতা— subjectivism
আনুবীক্ষণিক সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতি—microsociological method
আর্থসামাজিক ব্যবস্থা বা রূপায়ণ— socio-economic formation
ইতিহাসতত্ত্ব— historiography

ইতিহাসের পদ্ধতিতত্ত্ব— methodology of history
উৎপাদন পদ্ধতি— mode of production
উৎপাদিকা শক্তি বা বল— productive force
ঐতিহাসিক বস্তুবাদ— historical materialism
ঐতিহাসিক যুগ— historical epoch
কালবিভাজন, কালপর্বায়ন } periodization
ক্রিয়াবাদ— functionalisms
ঘটনা— event
চরম সমালোচনা/অতি সমালোচনা— hyper criticism
ছদ্ম বস্তুবাদ— pseudomaterialism
নির্ণেয়বাদ—determinism
নিমিত্তবাদ— fatalism
পরমীকরণ— absolutization
পরিবৃত্তি-কালপর্ব— transitional period
প্রত্যক্ষবাদী প্রয়োগবাদ— positivistic empiricism
প্রপঞ্চ, প্রতিভাস } phenomenon
বহুত্ববাদ— pluralism
বহুপদী পরিবর্তী— multiple variant
বিজ্ঞানভিত্তিক শ্রেণিবদ্ধকরণ— scientific classification
মতাদর্শের ইতিহাস— history of ideology
মূর্ত— objective
যৌক্তিক ইতিহাসবাদ— rational historicism
সমগ্রতা দৃষ্টিভঙ্গী, সমগ্রতিক দৃষ্টিভঙ্গী } holistic view
সম্পদের কারণে ব্যবকলন—differentiation due to wealth
সুস্থিত—stable
স্থূল যান্ত্রিকতাবাদ—vulgar mechanicism

তথ্যনির্দেশ

বাংলা ভাষায় রচিত, অনূদিত গ্রন্থ, প্রবন্ধঃ

১। করোভকিন, ফিওদর; পৃথিবীর ইতিহাস: প্রাচীন যুগ। মস্কো, প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৩।

২। বারকাত, আবুল; "বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতি: বিতর্ক, পদ্ধতিগত সমস্যা ও সমাধান"। *সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্র*, ঢাকা, জুলাই—সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪।

৩। বারকাত, আবুল; "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি—সোভিয়েত প্রাচ্য গবেষণার দুই পর্ব"। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, জুন ১৯৮৫।

৪। বারকাত, আবুল; "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে মার্কস ও এঙ্গেলসের ধারণার বিকাশ— একটি মূল্যায়ন", *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, অক্টোবর ১৯৮৬

৫। বারকাত, আবুল; প্রাক্-পুঁজিবাদী চীনে আর্থসামাজিক ব্যবস্থা ও এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭।

৬। মার্কস, ক, এবং ফ. এঙ্গেলস রচনা সংকলন, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম অংশ। মস্কো, প্রগতি প্রকাশন, ১৯৭২। (ই ব্লক সমীপে এঙ্গেলসের চিঠি, পৃ. ১৭৫-১৮০)।

৭। মার্কস, ক, এবং ফ. এঙ্গেলস রচনা সংকলন, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম অংশ। মস্কো, প্রগতি প্রকাশন, ১৯৭২। (কার্ল মার্কসের সমাধিপার্শ্বে এঙ্গেলসের বক্তৃতা)।

৮। মার্কস, ক; অর্থশাস্ত্র বিচার প্রসঙ্গে। মস্কো, প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৩।

৯। মাহমুদ, আবু; মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষা। ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫।

ইংরেজি ভাষায় রচিত গ্রন্থ, প্রবন্ধঃ

১০। Bernal, J.D. *Science in History,* Vol 1, Emergence of Science. London: Penguin Books, 1969.

১১। Goubert, P. *Local History,* Daedalus, Cambridge (Mass): 1971, Vol 100, N. 1.

১২। Horowitz, J. *Three Worlds of Development. The Theory and Practice of International Stratification.* L; N. Y: 1966.

১৩। Momjan, Kh., Landmarks in History. *The Marxist doctrine of Social-economic Formations.* Moscow: Progress, 1980.

১৪।	Nisbet, P. A.	*Social Change and History. Aspects of the Western Theory of Development.* N. Y: 1969.
১৫।	Rostow, W.	*The Stages of Economic Growth.* Cambridge, Mass; 1960.
১৬।	Topolski, J.	*Methodology of History.* Warsaw: 1966.
১৭।	Wiley, A (Ed).	*The New Economic History. Recent Papers in Methodology.* N. Y: 1970.
১৮।	Wise, G.	*American Historical Explanation.* Homewood: 1973.

রুশ ভাষায় রচিত গ্রন্থ, প্রবন্ধঃ

১৯।	ইলিচিয়েভ, ল, ফ; (Elichev, L. F);	সামাজিক বিজ্ঞানের পদ্ধতিতাত্ত্বিক সমস্যাবলী। মস্কো: নাউকা, ১৯৭৯। *(Methodologichieskie Problemi Obsectvennikh Nauk)*
২০।	কলিংউড, আর, জ, (Collingwood, R.G).	ইতিহাসের ধারণা। আত্মজীবনী। মস্কো: নাউকা, ১৯৮০ *(Edeia Estory: Avtobeografia).*
২১।	কোন, ই, স, (Kon, E. S);	দর্শন ও ইতিহাসের পদ্ধতিতত্ত্ব। মস্কো, ১৯৭৭। *(Filosophia-E-Methodologia Estori).*
২২।	চেরেপনিন, ল, ভ; (Cherepnin, L.V).	ঐতিহাসিক গবেষণার পদ্ধতিতাত্ত্বিক প্রশ্নসমূহ। মস্কো: নাউকা, ১৯৭৯। *(Voprosi Methodologi Estorichiskova Essledovania).*
২৩।	জুকভ ই, ম; বার্গ. ম, এ ও অন্যান্য; (Zukov, e.M; Barg. M.A. et. al;)	বিশ্ব ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার তাত্ত্বিক সমস্যাবলী। মস্কো: নাউকা, ১৯৭৯। *(Theoretichiskie Problemi Ceomirno-Estorichiskova Process).*
২৪।	দিয়াকোভ, ভ, আ; (Diakov, V. A.)	ইতিহাসের পদ্ধতিতত্ত্ব: অতীত ও বর্তমান। মস্কো: নাউকা, ১৯৭৪। *(Methodologia Estroi-vi-Proslom-e-Nastaiashem).*
২৫।	নিকিফোরভ, ভ, ন; (Nikiforov, V.N.)	প্রাচ্য ও বিশ্ব ইতিহাস। মস্কো: নাউকা, ১৯৭৭। *(Vostok-e-Cheomirnaaya Estoria).*
২৬।	লেনিন, ভ, ই;	রচনাসমগ্র, খণ্ড ১ (পঞ্চম রুশ সংস্করণ)।

২৭। লেনিন, ভ, ই; রচনাসমগ্র, খণ্ড ২৬ (পঞ্চম রুশ সংস্করণ)।

২৮। লেনিন, ভ, ই; রচনাসমগ্র, খণ্ড ৩০ (পঞ্চম রুশ সংস্করণ)।

২৯। লেনিনীয় ইতিহাসবাদ; (Leninski Estorism;) গবেষণার পদ্ধতিতত্ত্ব ও পদ্ধতি। কাজান ঃ কাজান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৬। *(Methodologia-e-Methodika Essledovania).*

৩০। ফিদোসিয়েভ প, ন; (Fidosive, P. N;) ফ্যানসিয়েভ, ইউ, প, "ইতিহাসের পদ্ধতিতাত্ত্বিক প্রশ্ন সম্পর্কে"। *ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান। (Fransiev, U. P., O Razrabotke Methodologichiskikh Voprosov Estori. Estoria-E- Sociologia).*

৩১। প্লেটনিকভ, ইউ, ক (প্রধান সম্পাদক) (Pletnikhov, U. K; Ed ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মার্কসীয় লেনিনীয় তত্ত্ব। মস্কো: নাউকা, ১৯৮১। *Marxistsko-Leninskaya theoria Estorichiskova Processa).*

৩২। মার্কস, ক ও ফ. এঙ্গেলস; মার্কস-এঙ্গেলস রচনাসমগ্র। খণ্ড ২১ (তৃতীয় রুশ সংস্করণ)।

৩৩। মার্কস, ক ও ফ. এঙ্গেলস; মার্কস-এঙ্গেলস রচনাসমগ্র। খণ্ড ২ (তৃতীয় রুশ সংস্করণ)।

৩৪। মার্কস, ক ও ফ. এঙ্গেলস; মার্কস-এঙ্গেলস রচনাসমগ্র। খণ্ড ১২ (তৃতীয় রুশ সংস্করণ)।

৩৫। মার্কস, ক ও ফ. এঙ্গেলস; মার্কস-এঙ্গেলস রচনাসমগ্র। খণ্ড ২০ (তৃতীয় রুশ সংস্করণ)।

৩৬। মমদ্‌জিয়ান, খ, ন (প্রধান সম্পাদক); (Mechelov, Kh. N; ed). মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিকৃতকারী আধুনিক বুর্জোয়া ও সংস্কারবাদীদের আলোচনা প্রসঙ্গ। মস্কো: মিস্‌ল, ১৯৭৮। *(Dealektia obsivo-e-osobinnavo vi Estorichiskom Processa).*

৩৭। মেচেদলভ, ম, প (প্রধান সম্পাদক); (Mechedlov, M. P; Ed.) মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিকৃতকারী আধুনিক বুর্জোয়া ও সংস্কারবাদীদের আলোচনা প্রসঙ্গে। মস্কো: পলিটইজদাট, ১৯৮০। *(Kritika Sovremennikh Bourgeiosnikh-e-Reformistskik Falsifikatorov Marxisma-Leninisma).*

৩৮। সেইডার, থ; (Scheider, Th). "নয়া-জার্মান ইতিহাসের প্রধান প্রশ্নসমূহ"। *ইতিহাস জার্নাল*। মস্কো, ১৯৬৯। *(Osnovniea Voprosi Novoi Nemeskol Estori).*

প্রবন্ধ ৩

এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে মার্কস ও এঙ্গেলসের ধারণার বিকাশ– একটি মূল্যায়ন

প্রসঙ্গকথা: *এ প্রবন্ধটির রচনাকাল ১৯৮৪-৮৬। আর প্রকাশকাল ১৯৮৬। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল* ***ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকায়*** *(ষড়্‌বিংশ সংখ্যা, কার্তিক ১৩৯৩/অক্টোবর ১৯৮৬, পৃ. ১-৩২)। প্রবন্ধটির প্রকাশকালীন সময়ে আমাদের দেশে উৎপাদন পদ্ধতি (mode of production) নিয়ে বেশ লেখালেখি-আলোচনা-বিতর্ক চলছিল। এসবের মধ্যে "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি"-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সংযোজনে বিতর্কটি বেশ জমে উঠেছিল। অ্যাকাডেমিক মহলে এ নিয়ে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতিশাস্ত্র, ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পণ্ডিত মহল। এ লেখাটি প্রকাশিত হওয়ার পরে এ নিয়ে* ***ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকায়*** *একধরনের পলেমিকস শুরু হয়, যেখানে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক (প্রয়াত) ড. রঙ্গলাল সেন এবং ইতিহাসের অধ্যাপক ড. মোফাখখারুল ইসলাম। অবশ্য এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি নিয়ে আমার প্রথম লেখা "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি– সোভিয়েত প্রাচ্য গবেষণার দুই পর্ব" প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮৫ সালে* ***ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকায়****। আজ থেকে ৩০ বছর আগে লেখা ও প্রকাশিত এ লেখাটির গুরুত্ব কী ছিল? প্রশ্নটির সহজ উত্তর দেওয়া কঠিন। তবে আমার যত দূর মনে পড়ে– ১৯৮০-এর দশকের শুরুর দিকে বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট অ্যাকাডেমিক ও অপেক্ষাকৃত সিরিয়াস রাজনৈতিক মহলে দেশের প্রধান উৎপাদন পদ্ধতির প্রকৃতি/বৈশিষ্ট্য নিয়ে 'সামন্তবাদ', 'আধাসামন্তবাদ', 'খুদে কৃষক উৎপাদন পদ্ধতি', 'আধাসামন্ত আধাপুঁজিবাদ', 'পুঁজিবাদ– এসব বিতর্ক চলছিল। আর এসব বিতর্কে নতুন মাত্রা সংযোজন এবং সংশ্লিষ্ট ভাবনাজগৎ ক্ষুরধার করার লক্ষ্যে মনে হয়েছিল "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি" নিয়ে লেখা জরুরি। বিষয়টির অবতারণা করেছিলাম এ কারণে যে, তখন কেউ কেউ নিজ মত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মার্কসের এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতির কথা*

বেশ জোর দিয়েই বলতেন– হয় মূল 'টেক্সটে' নয় পাদটীকায়। ওসব লেখাপত্তর পড়ে আমার ধারণা হয়েছিল যে তাদের অধিকাংশই জানতেন না যে 'এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি'র তত্ত্ব মার্কসের লেখায় পরিপুষ্ট ছিল না এবং মার্কস পরবর্তী সময়ে এ নিয়ে তেমন অগ্রসর হননি। এসবই ছিল ঐ সময়ের ঐ প্রবন্ধ রচনার অন্যতম কারণ।

ভূমিকা

আদিম, প্রাচীন এমনকি মধ্যযুগীয় প্রাচ্যের সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার (Socio-economic formation) মর্মার্থ উদ্‌ঘাটনের ক্ষেত্রে প্রাচ্যবিশারদদের অনেকেই মনে করে থাকেন যে, সেখানে (প্রাচ্যে) এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতির আধিপত্য বিরাজমান ছিল। তাঁদের মতে, এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতির অস্তিত্বই পাশ্চাত্যের তুলনায় প্রাচ্যীয় সমাজের বিকাশকে ভিন্ন ধারায় পরিচালিত করেছে। আর সেক্ষেত্রে– মার্কসের উদ্ধৃতি দিয়েই– নিম্নলিখিত উপাদানসমূহকেই এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছে–

ক. উৎপাদনের উপায় (বিশেষত ভূমি)-এর ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে রাষ্টীয় মালিকানা (Ager publicus) অথবা গোষ্ঠীমালিকানার প্রাধান্য;

খ. সেচ (বিশেষত বৃহদায়তন) ব্যবস্থার মালিকানা, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার সর্বময় কর্তা হচ্ছে রাষ্ট্র (Hydraulic Society);

গ. রাষ্ট্রব্যবস্থার চরিত্র– স্বৈরতান্ত্রিক (Oriental despotism);

ঘ. ভূমিভিত্তিক স্বনির্ভর গ্রামীণ গোষ্ঠীসমাজের প্রাধান্য (Self sustaining Village Community);

ঙ. ভূমিভিত্তিক গ্রামীণ গোষ্ঠীসমাজই স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সামাজিক-অর্থনৈতিক ভিত্তি;

চ. উৎপাদনের উপায়ের ওপর ব্যক্তিমালিকানার অনুপস্থিতি ও পণ্যোৎপাদন বিকাশের অভাবে অর্থনীতি প্রবৃদ্ধিহীন, স্থির (Stagnant economy); এবং

ছ. শহর-গ্রাম, কৃষি-শিল্প– এদের মাঝে সুস্পষ্ট বিভাজন অনুপস্থিত।

মার্কসবাদী প্রাচ্যবিশারদদের অনেকেই মনে করেন যে, এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতির তত্ত্বপিতা হলেন মার্কস ও এঙ্গেলস (দেখুন ৩, পৃ. ৫৬-৬৫)। আবার অমার্কসবাদী প্রাচ্যবিশারদদের অনেকেই মনে করেন যে, মার্কস ও এঙ্গেলস এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি ধারণাটির আমরণ সমর্থক ছিলেন। সেক্ষেত্রে বিশেষ আর্থসামাজিক ব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি" ধারণার সাথে ঐতিহাসিক বিকাশের পঞ্চস্তরীয় তত্ত্বের (অর্থাৎ আদিম সাম্যবাদ, দাস, সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ, সাম্যবাদী সমাজ) অসঙ্গতি লক্ষ করাটা স্বাভাবিক। আর এই অসঙ্গতিকে সমর্থন করেই ব্যানার্জী, মেনো, গ্যারোডি, গবলেট, গডেলিয়ের, গোল্ডনের, লিউইন, পেসিরকা, সুরে, কানাল, তোকেই, বেলস্‌কফ, শ্রাম প্রমুখ যা বলেছেন তার সারকথা হলো এই যে, আর্থসামাজিক বিকাশের পঞ্চস্তরভিত্তিক মার্কসীয় ছকটি "ইউরোপকেন্দ্রিক" (Eurocentric) অতএব তা অ-ইউরোপীয় আর্থসামাজিক বিকাশ বিশ্লেষণে প্রযোজ্য নয়। তৎপরিবর্তে এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতিভিত্তিক এশিয়াটিক আর্থসামাজিক ব্যবস্থার তত্ত্বটিই অ-ইউরোপীয় দেশসমূহের বিকাশধারা বিশ্লেষণে একমাত্র বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব (বিস্তারিত দেখুন, ১৪, পৃ. ৩২৪-৩৫২; ১২, পৃ. ৭-১০; ৩০; ৮; ২০; ২১; ৩২; ৮২; ৭০)। এমতাবস্থায় প্রায়শ অত্যন্ত যৌক্তিকভাবেই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়ে থাকে যে, উল্লেখিত পঞ্চস্তরের কোথায় এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতির স্থান? নাকি মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের প্রাচ্যগবেষণার নিম্নস্তরে, প্রাথমিক পর্যায়ে এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতির ধারণাটি সমর্থন করতেন এবং পরবর্তী সময়ে গবেষণার উচ্চতর কোনো পর্যায়ে তা বর্জন করেছিলেন?

প্রবন্ধের লক্ষ্য

উল্লিখিত জিজ্ঞাসা সামনে রেখেই এই প্রবন্ধে "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি" সম্পর্কে মার্কস ও এঙ্গেলসের ধারণা বিকাশের একটি মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে। মূল্যায়ন পদ্ধতির তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে যেসব পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে তা হলো: অভিজ্ঞানের দ্বন্দ্বাত্মক বস্তুবাদী পদ্ধতি (Materialistic dialectic theory of knowledge); বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ (Analysis and Syntheisis) এবং আরোহ ও অবরোহ (Induction and Deduction) পদ্ধতি। মূল্যায়নে ব্যবহৃত হয়েছে ১৮৪৪ থেকে ১৮৮১ সাল পর্যন্ত মার্কসের এবং ১৮৪৪ থেকে ১৮৮৮ সাল পর্যন্ত এঙ্গেলসের লেখা বিভিন্ন পুস্তক, প্রবন্ধ, পুস্তক সমালোচনা, নোট, চিঠিপত্র। মূল্যায়নে মার্কস ও এঙ্গেলসের প্রকাশিত-অপ্রকাশিত উভয় ধরনের দলিলই ব্যবহৃত হয়েছে। মার্কস-এঙ্গেলসের অপ্রকাশিত পুস্তক সমালোচনা, নোট, চিঠিপত্র সংগৃহীত হয়েছে

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ইনস্টিটিউটের আর্কাইভ থেকে। তদুপরি এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে মার্কস-এঙ্গেলসের ধারণার বিকাশকে কেন্দ্র করে দেশে-বিদেশে যে প্রচণ্ড বিতর্কিত সাহিত্যে সৃষ্টি হয়েছে তার প্রধান ধারাসমূহের মর্মবস্তুও এ প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে।

মার্কস ও এঙ্গেলসের ৫০ বছরের (১৮৪৪-৯৪) গবেষণাকর্ম থেকে প্রতীয়মান হয় যে তাঁরা উভয়েই শেষপর্যন্ত "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি" ধারণাটি শুধু বর্জনই করেননি, বিপরীতে সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিকাশের একটি বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব প্রদানে সক্ষম হন।

"এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি" তত্ত্ব নিয়ে মার্কস ও এঙ্গেলসের ধারণার বিকাশ নিয়ে প্রাচ্যসমাজ ও প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের বিকাশকে মোটামুটি তিনটি পর্বে বিভক্ত করে দেখানো সম্ভব। প্রথম পর্বের সময়কাল ১৮৫৩ সাল পর্যন্ত, যখন মার্কস ও এঙ্গেলস এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে সমসাময়িক প্রাচ্য গবেষণাসাহিত্যে যে ধারণা প্রায় সর্বজনস্বীকৃত ছিল (অর্থাৎ চিরাচরিত ধারণা) তার সমর্থক ছিলেন। দ্বিতীয় পর্বের সময়কাল ১৮৫৭-৬৭, যখন মার্কস ও এঙ্গেলস এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য (প্রবন্ধের ভূমিকায় 'ক' থেকে 'ছ' পর্যন্ত সাতটি বৈশিষ্ট্য দেখুন) প্রাচ্যসমাজের আদৌ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য কি না সে বিষয়ে সন্দিহান হন এবং শেষ পর্যন্ত "ভূমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার অনুপস্থিতি" (বৈশিষ্ট্য-'ক') ছাড়া অন্যান্য বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করেন। তৃতীয় পর্ব অর্থাৎ ১৮৭০-৮৮ সালে মার্কস ও এঙ্গেলস উভয়েই তাদের চিন্তাভাবনার বিকাশ এবং প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব ও জাতিতত্ত্ববিদ্যার নবতর আবিষ্কারের ভিত্তিতে এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি ধারণাটি সম্পূর্ণভাবে বর্জন করেন। সুতরাং এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি মার্কস ও এঙ্গেলসের ধারণা বিকাশের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বসমূহ যথাক্রমে "সমর্থন", "পরিবর্তন" ও "বর্জন" পর্ব হিসেবে আখ্যায়িত করা সম্ভব।

প্রথম পর্ব– সমর্থন পর্ব (১৮৫৩ সাল পর্যন্ত)

১৮৫৩ সালে মার্কস ও এঙ্গেলস যখন এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি নিয়ে গবেষণাকার্য শুরু করেন তখন এ বিষয়ে হাকস্তহাউজেন (ক্রোশীয় সরকারের কাউন্সিলার)-এর গবেষণাকর্ম (দেখুন ৭২) ও স্লাভিয়ান গোষ্ঠীসমাজের সামাজিক-অর্থনৈতিক সারসত্তা সম্পর্কে তাঁরা অবহিত ছিলেন। এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে ঊনবিংশ

শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত যা উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল তা হলো— ভারতের সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সর্বপ্রাচীন; ভারতই প্রাচীনতম সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি এবং প্রাচীন ইউরোপ ও প্রাচ্যীয় সমাজব্যবস্থা ভিন্নধর্মী। এসব ধারণার ভিত্তিতেই এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে মার্কসের ধারণাটি প্রাথমিক রূপ নেয়, যেখানে লক্ষণীয় বিষয়াদি এ রকম:

প্রথমত, প্রাচ্যসমাজ ইউরোপীয় সমাজ থেকে ভিন্নতর 'বিশেষ' সমাজ;

দ্বিতীয়ত; ঐ ভিন্নতর 'বিশেষ' সমাজের কোনো কোনো বৈশিষ্ট্য অন্যান্য প্রাচীন সমাজের (এমনকি ইউরোপীয়) অনুরূপ, এবং

তৃতীয়ত; আদিম সাম্যবাদী উৎপাদনসম্পর্কের অবশিষ্টাংশ উদ্‌ঘাটন করা জরুরি, কারণ এসব উৎপাদনসম্পর্কের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে সক্ষম যে আদিম সাম্যবাদী সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিমূলে উৎপাদনের উপায়ের ওপর কোনো ব্যক্তিমালিকানা ছিল না।

১৮৫৩-পূর্ববর্তী গবেষণাকর্মে মার্কস ও এঙ্গেলস বিশ্বের আর্থসামাজিক বিকাশ ইতিহাসে 'বিশেষ' এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতির তাৎপর্য ও স্থান সম্পর্কে কোনো কিছু উল্লেখ করেননি। 'জার্মান মতাদর্শ' (১৮৪৫) ও 'সাম্যবাদের নীতিসমূহ' গবেষণাকর্মে সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরম্পরা-ধরন সম্পর্কে যা উল্লেখ আছে তা হলো এ রকম: আদিম (উপজাতীয়) সাম্যবাদী → সমাজ → বর্ণসমাজ → সামন্তবাদী সমাজ। আর "দর্শনের দারিদ্র্য" (১৮৪৭) পুস্তকে একই বিষয়ে যা বলা হচ্ছে তা হলো: পিতৃতান্ত্রিক সমাজ → বর্ণসমাজ → সামন্তবাদী সমাজ (দেখুন ৬০, পৃ. ১৫৩)। উল্লেখ্য, আর্থসামাজিক ব্যবস্থার বিকাশসংক্রান্ত মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি ১৮৪৭ সালের আগে মূর্ত রূপ পরিগ্রহ করেনি। আর শ্রেণিসংগ্রামের উৎপত্তির ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে মার্কস ও এঙ্গেলস 'কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো'তে (১৮৪৮) উল্লেখ করলেন প্রাচীন রোম, সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদী কাঠামোতে শ্রেণিসমূহের কথা (দেখুন ৭, পৃ. ৩২-৪৬)। এক্ষেত্রে প্রাচ্যের শ্রেণিকাঠামো সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নেই।

মার্কস ও এঙ্গেলস প্রাচ্যের সমস্যা গবেষণায় আগ্রহী হন ১৮৫০-এর দিকে। এর পেছনেও বেশ কিছু কারণ ছিল। যেমন ১৮৪৮-৪৯ সালে ইউরোপে বিপ্লবের ব্যর্থতা, ব্যর্থ বিপ্লবের ফলে ইউরোপীয় পুঁজি কর্তৃক শোষিত দেশসমূহে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ভবিষ্যৎ সমস্যা ইত্যাদি। উপরন্তু তাইপিনদের আন্দোলন কেন্দ্র করে

মার্কস ভাবতেন যে, চীনে সামাজিক অভ্যুত্থান সমাসন্ন এবং তা ইউরোপের বিপ্লবী পরিবেশকে ধনাত্মকভাবে ত্বরান্বিত করতে সক্ষম (দেখুন ২৫, পৃ. ৯৩-৯৪)। ১৮৫৩ সালে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসা ও শাসনকালের মেয়াদ বৃদ্ধিসংক্রান্ত যে বিলটি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে উত্থাপিত হয় সেটিও মার্কস-এঙ্গেলসের প্রাচ্যবিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধকারকের কাজ করে।

চার্লস ফস্টারের পুস্তক 'আরবের ঐতিহাসিক ভূগোল' (লন্ডন, ১৮৪৪) পাঠ করার পর এঙ্গেলস প্রাচ্যসমাজের ইতিহাস; বিশেষত, আরবের বিকাশে বেদুঈন গোত্রের ভূমিকা প্রসঙ্গে মার্কসকে বিস্তারিত পত্র লিখলেন (দেখুন ২২, পৃ. ৭৩-৭৪)। প্রত্যুত্তরে বার্নিয়ার-প্রভাবিত মার্কস লিখলেন—"প্রাচ্যের ইতিহাস ধর্মের ইতিহাস" এবং বার্নিয়ারই সঠিক যে, **'ভূমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার অনুপস্থিতিই'** (গুরুত্ব আরোপ মার্কসের) প্রাচ্যের (তুরস্ক, পারস্য ও হিন্দুস্থান) সব ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার ভিত্তি। সেটিই প্রাচ্যের সব কিছু উদ্‌ঘাটনের প্রকৃত চাবিকাঠি" (দেখুন ২২, পৃ. ৭৫-৭৬)। প্রত্যুত্তরে এঙ্গেলস লিখলেন, "সমগ্র প্রাচ্যসমাজ অনুসন্ধানের প্রকৃত চাবিকাঠি আসলেও 'ভূমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার অনুপস্থিতি'। এর মধ্যেই নিহিত তার সমগ্র রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ইতিহাস। প্রাচ্যের জনগণ কেন ভূমির ওপর ব্যক্তিমালিকানা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলো না, কেনই বা এল না সামন্তবাদী মালিকানা পদ্ধতি?" (দেখুন ২২, পৃ. ৭৬)।

মার্কস ও এঙ্গেলস ১৮৫৩ সালে ইংল্যান্ডে অবস্থানকালে ভারত ও চীনের সামাজিক-অর্থনৈতিক ইতিহাস অধ্যয়ন করেন। এ সময়ে ভারত সম্পর্কে মার্কসের প্রাথমিক ধারণা হলো এই যে, "ভারতে রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন এশিয়াটিক স্বৈরতন্ত্র, যার অধীনে আছে অভ্যন্তর ও বহির্দেশ লুণ্ঠনের বিভাগ এবং পূর্তকর্ম বিভাগ, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ট্যাক্স সংগ্রাহক ও একটির পর একটি গৃহযুদ্ধ" (দেখুন ৪, পৃ. ৮-১২); এবং গৃহযুদ্ধ, অভিযান, বিপ্লব, দিগ্বিজয় ও দুর্ভিক্ষ— সমাজের মাত্র উপরিকাঠামোকেই স্পর্শ করেছে" (দেখুন ৪, পৃ. ৮) (অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে নয়: আবুল বারকাত); "রাজ্যের ভাঙাভাঙি ভাগ-বিভাগে... গ্রামের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি অপরিবর্তিতই থাকে" (দেখুন ৪, পৃ. ১১)। আর এই গ্রাম-গোষ্ঠী ব্যবস্থার মর্মার্থ সম্পর্কে মার্কসের ধারণা হলো এ রকম: "একদিকে সব প্রাচ্যবাসীর মতো হিন্দু কতৃর্ক তার কৃষি ও বাণিজ্যের প্রাথমিক শর্তস্বরূপ বড়ো বড়ো পূর্তকর্মের ভার কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর অর্পণ, এবং অন্যদিকে সারা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা এবং কৃষি ও শিল্পোদ্যোগের ঘরোয়া বন্ধনে তাদের ছোটো ছোটো কেন্দ্রে জোট বন্ধন—

এই দুইটি অবস্থায় প্রাচীনতম কাল থেকে একটা বিশেষ চরিত্রের সমাজব্যবস্থা – তথাকথিত 'গ্রামব্যবস্থার' সৃষ্টি করেছে, তাতে এইসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিটি সম্মিলন পেয়েছে স্বাধীন সংগঠন ও বিশিষ্ট জীবনধারা" (দেখুন ৪, পৃ. ১০)।

প্রাচ্যের সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য উদ্‌ঘাটনে এঙ্গেলসের মতে প্রাচ্যের প্রকৃতি ও জলবায়ুনির্ভর কৃষি উৎপাদন এবং এক্ষেত্রে সামাজিক সেচের গুরুত্বই প্রধান। এই প্রক্রিয়াকে অনেকেই "পরিবেশগত নির্ধারকতাবাদ" হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকেন। এঙ্গেলসের চিন্তানুযায়ী এ ধরনের সেচব্যবস্থায় কৃষি সমাজের যৌথ উদ্যোগ অনিবার্য (দেখুন ২২, পৃ. ৭৬-৭৭)। মার্কসও এ বিষয়ে অনুরূপ ধারণা পোষণ করতেন। তাঁর মতে, "আবহাওয়া ও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের জন্য, বিশেষ করে সাহারা থেকে শুরু করে আরব, পারস্য, ভারত ও তাতরিয়ার মধ্যে দিয়ে সমুন্নত এশীয় মালভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত বৃহৎ মরু অঞ্চলের অস্তিত্বের ফলে খাল ও জলাশয় দিয়ে কৃত্রিম সেচ ছিল প্রাচ্য কৃষির ভিত্তি।... সমস্ত এশীয় সরকারগুলির ওপরেই এসে বর্তায় একটি অর্থনৈতিক দায়িত্ব – পূর্তকর্ম সংগঠনের কাজ" (দেখুন ৪, পৃ. ৯)।

মার্কস মনে করতেন যে, ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এশীয় স্বৈরাচারের ওপর ইউরোপীয় স্বৈরাচারের পত্তন ঘটিয়েছে" (দেখুন ৪, পৃ. ৮০)। ভারতবর্ষ জুড়ে কৃষি ও হস্তচালিত শিল্পের যে ঐক্য ছিল কলোনি-শোষণ তাকে যতই উচ্ছেদ করুক না কেন মার্কসের মতে, "গ্রামীণ গোষ্ঠীসমাজ প্রাচ্যীয় স্বৈরতন্ত্রের অস্তিত্বের সুদৃঢ় ভিত্তি হিসাবেই কাজ করেছে" (দেখুন ৪, পৃ. ১২); "ভারতীয় অতীতের রাজনৈতিক চেহারা যতই পরিবর্তনশীল মনে হোক না কেন, সুদূর পুরাকাল থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত ভারতে সামাজিক অবস্থা অপরিবর্তিত ছিল" (দেখুন ৪, পৃ. ১০)। শুধু পুঁজিবাদী বৃটেনের ভারতে অনুপ্রবেশের ফলেই গ্রামসমাজ ধ্বংস হয় এবং এশিয়ায় "কখনো যদি কোনো সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত হয় সেটা ঐ ব্রিটিশ পুঁজিবাদের অনুপ্রবেশের ফলেই" (দেখুন ৪, পৃ. ১২)। মার্কসের মতে এটি ছিল "ইতিহাসের অচেতন অস্ত্র" (দেখুন ৪, পৃ. ১৩)। তদুপরি ১৮৫৩ সালে 'ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ ফলাফল' সম্পর্কে লিখতে গিয়ে মার্কস সুস্পষ্টভাবেই এশিয়াটিক সমাজের অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, "ভারতবর্ষে এক দ্বিবিধ কর্তব্য পালন করতে হবে ইংল্যান্ডকে; একটি ধ্বংসমূলক এবং অন্যটি উজ্জীবনমূলক– 'পুরাতন এশীয় সমাজের' ধ্বংস এবং 'এশিয়ায়' পাশ্চাত্য সমাজের বৈষয়িক ভিত্তির প্রতিষ্ঠা" (দেখুন ৪, পৃ. ১৪)।

১৮৫৩ সালে এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতিসংক্রান্ত ধারণাটি উত্থাপন করার ক্ষেত্রে মার্কস ও এঙ্গেলস তৎকালীন কোন ধরনের গবেষক ও গবেষণাকর্মের ওপর নির্ভর করেছিলেন? মার্কস ও এঙ্গেলস তরুণ বয়সেই "প্রাচ্যসমাজ– মনুষ্যসভ্যতার বিকাশের প্রথম স্তর"-সংক্রান্ত হেগেলীয় তত্ত্ব (দেখুন ১৫, পৃ. ১১১-১১২, ১১৫-১১৬, পৃ. ২০৩-২০৬, দার্শনিক স্লেগেলের 'এশীয় সমাজ' (দেখুন ৭১, পৃ. ১১০-১১৮) এবং ব্রিটিশ রাজনৈতিক-অর্থনীতিবিদ ম্যাক-কুল্লোখের (যার সমালোচনার মাধ্যমেই মার্কস রাজনৈতিক-অর্থনীতি চর্চা শুরু করেন) প্রাচ্যসমাজের 'বিশেষ' বৈশিষ্ট্যসংক্রান্ত ধারণাবলীর (দেখুন ২৬) সাথে পরিচিত ছিলেন। সেই সাথে ১৮৫৩ সালের এপ্রিল-মে মাসের দিকে মার্কস ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ভারত (১৬৯৮-১৮৪৪)- সংক্রান্ত "নীল বই" (Blue Book) পাঠ শুরু করেন। প্রাচ্যসমাজসংক্রান্ত বাস্তব ঐতিহাসিক তথ্যাদি তিনি প্রথম সংগ্রহ করেন হেরেনের গবেষণাকর্ম (দেখুন ৭৩) থেকে। এক্ষেত্রে মার্কসের মনোনিবেশের কেন্দ্রবিন্দু হলো: ভারতের আর্থসামাজিক বিকাশে গোষ্ঠীসমাজের ভূমিকা ও ভূ-মালিকানার সমস্যা। লক্ষণীয় যে, হেরেনের তুলনায় বার্নিয়ারের ভ্রমণকাহিনিকে (দেখুন ৫১) মার্কস অধিক গুরুত্ব প্রদান করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি (মার্কস্) কেম্পবেল, র‍্যাফশস, উইলক্স ও প্যাস্টনের প্রাচ্যসমাজসংক্রান্ত গবেষণাকর্ম অধ্যয়ন করেন (দেখুন ১০; ২৭; ২৮; ৩৩)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উইলক্স ব্যতীত অন্যরা একবাক্যে স্বীকার করতেন যে, ভূমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার অনুপস্থিতিই সনাতন প্রাচ্যসমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য। উল্লিখিত গবেষণাফলাফল অধ্যয়নের পর থেকে লক্ষণীয় যে, এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতির কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য "ভূমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার অনুপস্থিতি"-সংক্রান্ত ব্যাপারটি সুস্পষ্ট নয় বলে এ প্রশ্নে মার্কস সাবধানতা অবলম্বন করেন (দেখুন ২২, পৃ. ৮০)। এবং উপসংহারে পৌঁছান যে, "সম্ভবত ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে ভূমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত ছিল" (দেখুন ২২, পৃ. ৮০)। অবশ্য সমসাময়িককালে তিনি একইভাবে বিশ্বাস করতেন যে, গোষ্ঠীসমাজই মনুষ্যসভ্যতার বিকাশের প্রারম্ভ বিন্দু এবং ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলেই উৎপাদনের উপায়ের ওপর গোষ্ঠীমালিকানা অপ্রতিরোধ্যভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

উল্লেখ্য, মার্কস-এঙ্গেলসের মতে উৎপাদনের উপায়ের মালিকানার ধরনই এক সমাজব্যবস্থা থেকে অন্যকে পৃথক করার ভিত্তি। আর সামাজিক অর্থনীতির চরিত্র-বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের চরিত্রের ওপর। এ দৃষ্টিতে মার্কস-এঙ্গেলসের মতে, ১৮৫৩ সালের দিকে প্রাচ্যসমাজে মালিকানার বিশেষ দিকটি হলো: ভূমির ওপর ব্যক্তিমালিকানার অনুপস্থিতি, ভূমির প্রকৃত মালিক হলো

গোষ্ঠীসমাজ, আর সর্বোচ্চ আইনি মালিক হলো রাষ্ট্র (স্বৈরতান্ত্রিক)। উৎপাদনকার্যের বৈশিষ্ট্য হলো সামাজিক শ্রমের এমনতর রূপ, যখন সেচকার্যের পরিচালনার দায়ভার ন্যস্ত হয় ঐ রাষ্ট্রের ওপরই। সুতরাং উৎপাদনসম্পর্ক ও উৎপাদিকা শক্তি – উভয় দৃষ্টিতেই প্রাচ্যসমাজ পাশ্চাত্যের তুলনায় ভিন্নতর। আর পাশ্চাত্যসমাজে প্রাচীন, সামন্ত বা বুর্জোয়া– তিনটির যেকোনো একধরনের মালিকানা পদ্ধতির নির্ধারকতা (বিভিন্ন সময়ে) লক্ষণীয়। বিশুদ্ধ আদিম সাম্যবাদী মালিকানাব্যবস্থার অস্তিত্ব তখনো গবেষকেরা উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম হননি, আর এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতির অস্তিত্ব বলতে যা নির্দেশ করা হয়েছিল, তা হলো– ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতে বিরাজমান গোষ্ঠীমালিকানা ও গোষ্ঠীশ্রম সংগঠনের অবশিষ্টাংশের উপস্থিতি। কিন্তু এশিয়াটিক সমাজের শ্রেণিকাঠামোর প্রশ্নটি মার্কস-এঙ্গেলস উভয়েরই কাছে অস্পষ্ট ছিল, কিন্তু শোষকদের সামাজিক-অর্থনৈতিক ভিত্তি এবং তাদের বাস্তব অবস্থানের প্রশ্নটি তখনো উদ্‌ঘাটিত হয়নি (বলা হতো রাষ্ট্রের কর্মচারীরাই শোষক)। ১৮৫৩ সাল নাগাদ প্রাচ্যসমাজের আর্থসামাজিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে যে গবেষণাকার্য হয়, তাতে আদিম সাম্যবাদী সমাজ, স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও দাস শোষণকে সমার্থক মনে করা হতো, তাদের মধ্যে কোনো সুস্পষ্ট পার্থক্য তখনো লক্ষ করা যায়নি। ১৮৫৩ সাল পর্যন্ত মার্কস ও এঙ্গেলস এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি ধারণার পক্ষে স্বাধীনভাবে যথেষ্ট যুক্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হননি। তবে পরবর্তী গবেষণাধারায় প্রমাণ পাওয়া যায় যে উল্লিখিত সময়কালে তাঁরা উভয়েই এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ শুরু করেন এবং উভয়েই ভারতের গোষ্ঠীভিত্তিক সামাজিক সংগঠনকে আদিম সাম্যবাদী সমাজের উচ্ছিষ্টাংশ হিসেবেই দেখতে শুরু করেন।

দ্বিতীয় পর্ব– পরিবর্তন পর্ব (১৮৫৭-১৮৬৭)

১৮৫৭-১৮৬৭-পর্বে প্রাচ্যের আর্থসামাজিক ব্যবস্থা সম্পর্কে মার্কস বিশেষভাবে চিন্তাভাবনা শুরু করেন। সময়কালটা ছিল 'পুঁজি" গ্রন্থের প্রথম খণ্ড রচনার প্রক্রিয়ায় ১৮৫৭-৫৯ সালে। 'পুঁজি'র মূল গবেষণালক্ষ্য ছিল– পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি বিকাশের সূত্র উদ্‌ঘাটন করা। আর এ প্রক্রিয়ায় প্রাক্-পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থাসমূহের (যার গর্ভ থেকে পুঁজিবাদী উৎপাদনসম্পর্ক জন্ম নেয়) সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও বিকাশধারা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন অনিবার্য হয়ে পড়ে। মার্কস-এঙ্গেলসের চিন্তার বিকাশে দেখা যায় যে, এ প্রশ্নে তারা ১৮৫৩ সাল থেকে পরের চার বছর বিশেষ কোনো অবদান রাখতে সক্ষম হননি; তবে ইতিমধ্যে ইউরোপীয়

গ্রাম-গোষ্ঠীসমাজসংক্রান্ত হাকস্তহাউজেনের গবেষণাকর্ম (দেখুন, ৭২) সমাপ্ত হয়েছে এবং মাউরের-এর গবেষণা ফলাফল (দেখুন, ৫৩) প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। মার্কস সম্ভবত ১৮৬৮ সালের আগে মাউরের-এর গবেষণাকর্ম ভালোভাবে অধ্যয়ন করতে সক্ষম হননি।

উল্লেখ্য, ১৮৫৭-৫৯ সময়কালে মার্কসের গবেষণাকর্মের ফলাফল বিবৃত আছে তার পাণ্ডুলিপি 'প্রাক্-পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক রূপসমূহ' (১৮৫৭-৫৮; দেখুন ২৩; ৬১) এবং 'অর্থশাস্ত্র বিচার প্রসঙ্গে' (১৮৫৯; দেখুন ৬) পুস্তকের ভূমিকায়। এ দুটি গবেষণাকর্মে সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসংক্রান্ত চিরায়ত মার্কসীয় ধারণা সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করে।

যেহেতু 'প্রাক্-পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক রূপসমূহ' শিরোনামের মার্কসীয় পাণ্ডুলিপিটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ সালে, তাই এর আগে প্রাচ্যের সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে মার্কসীয় চিন্তাভাবনার পরিবর্তন গবেষকদের অনেকের কাছেই দীর্ঘদিন অজানা ছিল। তদুপরি পাণ্ডুলিপি প্রকাশের পর গবেষকেরা তাঁদের নিজস্ব ধারায় মার্কসের ব্যাখ্যা প্রদান শুরু করেন। যেমন– হবসবন্, সেনো্ ও তোকেই প্রমুখের মতে, মার্কসীয় 'পাণ্ডুলিপি' এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতিসংক্রান্ত প্রকল্পটির সত্যতাই প্রমাণ করে (দেখুন ২৩; ৭০; ৩২)। অন্যদিকে রেদের ও উলিয়ানভস্কির মতে, এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি বলতে মার্কস "এশীয় দেশসমূহের বিশেষ সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বোঝাননি।" এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি বলতে মার্কস বুঝিয়েছিলেন যে, "উৎপাদনের উপায়ের ওপর মালিকানা ও উৎপাদনসম্পর্কের প্রশ্নে ঐ দেশের বৈশিষ্ট্য হলো তারা বিকাশের ক্ষেত্রে দাস ও সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থার একটি অন্তবর্তীকালীন স্তরে প্রবাহিত হচ্ছে" (দেখুন ৬৪, পৃ. ২৬৭-২৬৯)। মিসুলিনের মতে, পাণ্ডুলিপিতে মার্কস "আদিম সমাজে তিন ধরনের মালিকানা লক্ষ করেছেন। এশিয়াটিক অথবা প্রাচ্যীয়, পুরাকালীন ও জার্মানিক। সুতরাং এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি এশিয়াটিক সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি নয়। এশিয়াটিক সমাজ– দাসসমাজ, তার স্বকীয়তা আছে; তবে সেটা সেরকমই কোনো সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নয়, যেমনটি জার্মানিক সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা" (দেখুন, ৪৬, পৃ. ৩)। আজর ভাসিলিয়েভ ও স্কুচেভস্কির মতে, মার্কসের পাণ্ডুলিপি থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, "সামাজিক, প্রাচীন ও এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি হলো– শ্রেণিহীন সমাজের শ্রেণিবিভক্ত সমাজের দিকে গমনের তিনটি সমান্তরাল ও সমশক্তিধর মডেল। এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি হলো প্রাক্-পুঁজিবাদী জগতে দাস

ও সামন্ত শোষণের যৌথপদ্ধতি" (বিস্তারিত দেখুন, ৩, পৃ. ৬৩-৬৫; ৫২,পৃ. ৮১-৮৭)। ইত্তলক, লেন্সম্যান ও ক্রিলভ-এর মতে, "পাণ্ডুলিপি আরও একবার প্রমাণ করল যে, মার্কস ও এঙ্গেলস কখনো এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি ধারণার সমর্থক ছিলেন না" (দেখুন, ৩৬, পৃ. ১৪৬; ৪৭, পৃ. ৩৭-৩৮)।

'অর্থশাস্ত্র বিচার প্রসঙ্গে' পুস্তকের ভূমিকায় মার্কস সর্বপ্রথম "সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা" প্রত্যয়টিকে সুস্পষ্টভাবে সূত্রবদ্ধ করেন এবং বলেন যে, "ব্যাপক রূপরেখায়, উৎপাদনের এশীয়, প্রাচীন, সামন্ততান্ত্রিক ও আধুনিক বুর্জোয়া প্রণালীকে অভিহিত করা হতে পারে সমাজের অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে প্রগতির সূচক এক-একটি যুগ বলে" (দেখুন ৬, পৃ. ১৪)। উল্লেখ্য, 'অর্থশাস্ত্র বিচার প্রসঙ্গে' পুস্তকে মার্কস 'প্রাক্-পুজিবাদী অর্থনৈতিক রূপসমূহ' (পাণ্ডুলিপি) রচনার প্রক্রিয়ায় যা উদ্ভাবন করেন তারই সাধারণীকরণ করেছেন (দেখুন ৬, পৃ. ৭)। সুতরাং পাণ্ডুলিপি রচনার সমসাময়িককালেও মার্কস এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি প্রকল্পটি সমর্থন করতেন (এমনকি মার্কসের 'পুঁজি' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড ও এঙ্গেলসের 'অ্যান্টি ডুরিং' গ্রন্থের কোথাও কোথাও তা প্রতিফলিত হয়)।

মার্কসের মতে, প্রাচ্যের গোষ্ঠীসমাজ হলো "সবচেয়ে আদিম সামাজিক রূপ, সমাজবিকাশের প্রারম্ভ রূপ। প্রাচ্যের গোষ্ঠীসমাজে শিল্প ও কৃষি, শহর ও গ্রামের বিভক্তি নেই। প্রাচীন সমাজে (গ্রিস ও রোম) শিল্প সেক্টরের কাজকে আত্মঘাতী মনে করা হতো; শিল্প (শহর) ইতিমধ্যে কৃষির একাধিপত্যের বাইরে ছিল" (দেখুন ৬১, পৃ. ৪৮৪; ২৪, পৃ. ৪৮৬-৪৮৭, ৪৯৭)। মার্কসের মতে, "চিরায়ত প্রাচীন সমাজের ইতিহাস– শহরের বা নগরের ইতিহাস। আর সে শহর (নগর) ভূমালিকানা ও কৃষিকার্যনির্ভর। এশিয়াটিক ইতিহাস–শহর ও গ্রামের অবিচ্ছেদ্য ঐক্যের ইতিহাস..." (দেখুন, ২৪, পৃ. ৪৭৯)।

পাণ্ডুলিপিতে (১৮৫৭-১৮৫৮) মার্কস প্রাক্-পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশে অর্থ-সম্পদের প্রবৃদ্ধির প্রভাব বিশ্লেষণে রোম ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের পতনের সাথে পশ্চিম ইউরোপের মধ্যযুগীয় (শেষের দিকের) সামন্তবাদী সমাজের তুলনা করেছেন। এ মর্মে মার্কসের উক্তি হলো: "অর্থ-সম্পদের প্রবৃদ্ধির ফলে উভয় ক্ষেত্রেই মালিকানাসম্পর্ক বিনষ্ট হয়েছে। তবে সেটা ঘটেছে সমাজবিকাশের বিভিন্ন পর্বে। আর তার ফলাফলও বিভিন্ন। ... তদুপরি শুধু অর্থ-সম্পদের অস্তিত্ব এমনকি তাদের তুলনামূলক আধিক্য 'অর্থের পুঁজিতে রূপান্তরের' জন্য যথেষ্ট নয়। অন্যথায় প্রাচীন রোম, বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য ও অন্যরা স্বাধীন শ্রম ও স্বাধীন পুঁজি দিয়ে তাদের

ইতিহাস সমাপ্ত করত এবং সেইসাথে জড়িত ছিল। তথাপি এই বিনষ্টকরণ শিল্প সেক্টরের বিকাশের পরিবর্তে শহরকে গ্রাম দ্বারা পদানত করে" (দেখুন ৬১, পৃ. ৪৯৭; ২৪, পৃ. ৫০৬-৫০৭)। সুতরাং মার্কসের মতে, পুরাকালীন (মূলত দাস) ব্যবস্থা যে "এশিয়াটিক গোষ্ঠীসমাজভিত্তিক" ব্যবস্থার তুলনায় প্রগতিশীল এবং মধ্যযুগীয় সামন্তবাদ পুরাকালীন সমাজের পরবর্তী প্রগতিশীল ব্যবস্থা এ ব্যাপারে দ্বিমতের অবকাশ নেই (হবসবন্ ও লিউইন অবশ্য এটা স্বীকার করতে নারাজ (বিস্তারিত দেখুন ২৩; ২০)।"

মার্কসের পাণ্ডুলিপি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ১৮৫৭-৫৮ সালের দিকে এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতির সাথে "মিশ্র" অথবা "উত্তরণকালীন" সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কোনো সম্পর্কের কথা তিনি ব্যক্ত করেননি (এ প্রসঙ্গে দেখুন, ৩, পৃ. ৬৩-৬৪)। অন্যদিকে যেসব গবেষক এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতিতে দাসব্যবস্থার মৌলসমূহের আধিক্য লক্ষ করেছেন, তাঁরা তুলনামূলক অধিক সঠিক। কারণ, পাণ্ডুলিপিতে মার্কস লিখেছেন যে "এশিয়াটিক মালিকানাব্যবস্থায় একক ব্যক্তিসত্তা, প্রকৃতপক্ষে– মালিক, তারই দাস, যার মধ্যে একত্রীভূত অবস্থায় বিরাজ করছে গোষ্ঠীসমাজ। সুতরাং এক্ষেত্রে দাসত্ব শ্রমের শর্ত ধ্বংস করছে না, পরিবর্তিত করছে না সম্পর্ক" (দেখুন, ৬১, পৃ. ৪৮২; ২৪, পৃ. ৪৭১-৪৭২, ৪৯৩)। একটি উপজাতি বা গোষ্ঠীসমাজ কর্তৃক অন্যকে পদানত করার ফলে যে সম্পর্ক সৃষ্টি হয় (প্রাথমিক অবস্থায় শ্রেণিবিভক্ত সমাজে যা ঘটত) সে সম্পর্কে মার্কসের ধারণা হলো "উপজাতীয় সমাজব্যবস্থায় মালিকানাসম্পর্কের প্রধান শর্ত হলো উপজাতির সভ্য হতে হবে। অর্থাৎ পরাজিত উপজাতি "মালিকানা শর্ত হারাচ্ছে" এবং ফলাফলে বিজিত উপজাতীয় পুনরুৎপাদনের "অসীম সম্পর্কের" একটিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। পরাজিত গোষ্ঠী বিজিত গোষ্ঠীর সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। সুতরাং দাসব্যবস্থা ও ভূমিদাসনির্ভরতা হলো উপজাতীয় মালিকানাব্যবস্থার পরবর্তী বিকাশপর্বমাত্র" (দেখুন ৬১, পৃ. ৪৮২; ২৪, পৃ. ৪৯৩)। সুতরাং প্রাচ্যসমাজে "সার্বজনীন দাসত্ব"-এর অস্তিত্ব (ager publicus)-এর কারণে এবং দাস ও এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে অনুরূপ মৌলিক সম্পর্ক উদ্‌ঘাটন মার্কসের মৌলিক আবিষ্কার। পরবর্তী সময়ে এরই ভিত্তিতে গবেষকেরা এশিয়াটিক উৎপাদনসম্পর্কের অভ্যন্তরে আদিম ও দাস উৎপাদনসম্পর্ক অনুসন্ধানে লিপ্ত হন।

এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে মার্কসের ১৮৫৩ সালের তুলনায় ১৮৫৭-৫৯ সালের গবেষণাকর্মে কিছু বিশেষ পরিবর্তন লক্ষণীয়। 'প্রাক্-পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক রূপসমূহ' পাণ্ডুলিপিতে মার্কস যা বিবৃত করেছেন তার প্রধান বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

প্রথমত, এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতির আওতাভুক্ত দেশসমূহে বৃহদায়তন সেচকার্যের (ভূমিকার, বৈশিষ্ট্য– খ দেখুন) প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নেই। ১৮৫৭-৫৮ সালের দিক থেকেই মার্কস ও এঙ্গেলস এ বিষয়টি আর উল্লেখ করছেন না। আসলে এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতিভিত্তিক সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে মার্কস-এঙ্গেলস উভয়েই আদিম সমাজ থেকে শ্রেণিবিভক্ত সমাজে উত্তরণের ক্ষেত্রে পৃথিবীর সব জনগোষ্ঠীর জন্য সর্বজনীন হিসেবেই দেখছেন। তাই এশিয়া ও আফ্রিকার জলবায়ুজনিত মৌলটি আর সর্বজনীন হতে পারল না।

দ্বিতীয়ত, ১৮৫৩ সালের তুলনায় ১৮৫৭-৫৯ সালে এশিয়াটিক রাষ্ট্রসমূহকে মার্কস অপেক্ষাকৃত কম স্বৈরতান্ত্রিক হিসেবে গণ্য করেছেন এবং রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রশ্নে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের অমিলের তুলনায় সমধর্মী বৈশিষ্ট্যের প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

তৃতীয়ত, আদিম সম্প্রদায়গত মালিকানা– সর্বজনীন ব্যাপার। এ মর্মে মার্কস মনে করতেন যে "বর্তমানে অবাস্তবভাবে একপেশে একটা অভিমত বহুলপ্রচলিত, তা এই যে 'আদিম সম্প্রদায়গত মালিকানা বিশেষভাবে স্লাভোনিক, কিংবা এমনকি একান্তই রুশ ব্যাপার। আদি যুগের এই ধারণাটি দেখা যায় রোমান; টিউটন ও ওকল্টদের মধ্যে এবং তার বহুবিচিত্র ধাঁচের গোটা একটা সংগ্রহ (যদিও কখনো কখনো তার জেরগুলো শুধু টিকে আছে) ভারতে এখনো বর্তমান। সম্প্রদায়গত সম্পত্তির এশীয়, বিশেষ করে ভারতীয় ধারণাগুলো সমনোযোগে অধ্যয়ন করলে ইঙ্গিত পাওয়া যাবে যে, বিভিন্ন ধরনের আদিম সম্প্রদায়গত মালিকানার ভাঙন বিভিন্ন ধরনের সম্পত্তির উদ্ভব ঘটায়। যেমন রোমান ও জার্মানিক ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিভিন্ন আদি রূপের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যেতে পারে কোনো কোনো ধরনের ভারতীয় সম্প্রদায়গত সম্পত্তির মধ্যে (দেখুন, ৬, পৃ. ২৬)।

সুতরাং, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বিকাশপ্রক্রিয়ায় সাধারণ উপাদানসমূহ অনুসন্ধানের প্রচেষ্টায় মার্কস প্রমাণ করেছেন যে, গোষ্ঠীসম্পত্তি শুধু এশিয়ারই বৈশিষ্ট্য নয়, তা সর্বজনীন। সেইসাথে "প্রাচ্যসমাজের ব্যতিক্রমধর্মী বিকাশ"-প্রক্রিয়ার তত্ত্বে অঙ্গচ্ছেদ ঘটল।

সুতরাং ১৮৫৯ সালের দিকে মার্কস ও এঙ্গেলস উভয়েই প্রাচীন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাধারণ আর্থসামাজিক বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলে ধরেন। উভয় ক্ষেত্রেই তাঁরা দাসসম্পর্ক ও গোষ্ঠীমালিকানার অস্তিত্ব উদ্‌ঘাটন করেন। কিন্তু প্রাচ্যে ভূমির ওপর "ব্যক্তিগত মালিকানার অনুপস্থিতি"-সংক্রান্ত ধারণাটি তখনো অপরিবর্তিত থাকে। সম্ভবত এ কারণেই 'অর্থশাস্ত্র বিচার প্রসঙ্গে'-র ভূমিকায় এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতির অস্তিত্বের কথা বলা হয়েছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মৌলিক পার্থক্যসংক্রান্ত চিরাচরিত ধারণাটি মার্কস ও এঙ্গেলস ঊনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকেও পুরোপুরি বর্জন করেননি। ১৮৬২ সালে লিখিত 'চীনের অবস্থা'-য় মার্কস চীনে এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতির অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন এবং ১৮৫৩ সালে ভারতের উদ্দেশ্যে যা বলেছিলেন, অনুরূপ বলেছেন চীনের ক্ষেত্রেও– "রাজনৈতিক উপরিকাঠামো দখলকারী ব্যক্তি ও উপজাতির দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। কিন্তু সামাজিক ভিত্তি অটুট, তা অপরিবর্তিত থাকছে– ব্যাপারটি প্রাচ্যীয় রাষ্ট্রব্যবস্থায় আমরা অহরহ লক্ষ করি" (দেখুন, ৬২, পৃ. ৫২৯)। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের চীন হলো মার্কসের মতে, "জীবন্ত প্রস্তরখণ্ড...; আর তাইপিনদের বিদ্রোহ-সৃষ্টিশীলতায় লক্ষ্যহীন ধ্বংসপ্রক্রিয়া" (দেখুন, ৬২, পৃ. ৫৩০)। অন্যদিকে, যেহেতু এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতিতে মালিকানাবৈশিষ্ট্যের ব্যাপারটি তখনো কারো কাছে সুস্পষ্ট ছিল না, তাই 'পুঁজি' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড (যা রচিত হয়েছে 'চীনের অবস্থা' বিশ্লেষণের সমসাময়িক সময়ে) প্রাক্-পুঁজিবাদী মালিকানা ধরনের ক্ষেত্রে এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতির কোনো উল্লেখ নেই, যা আছে তা হলো– আদিম, দাস ও সামন্তবাদী মালিকানাসম্পর্ক।

তৃতীয় পর্ব– বর্জন পর্ব (ঊনবিংশ শতাব্দীর ৭০-৮০-এর দশক)

'পুঁজি' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে মার্কস আর কখনো এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতির কথা বলেননি। অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর ৭০-এর দশক থেকে মার্কস কি এশিয়াটিক সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ধারণা পরিত্যাগ করলেন? যদি তা করেন, তাহলে কোন যুক্তিতে? এ বিষয়ে বিতর্কটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তা সর্বজনীন রূপ লাভ করেছে, অথচ কোনোটিই পরিপূর্ণ সমর্থনযোগ্য নয়, বিধায় কিছুটা আলোকপাত করা সঙ্গত। বিতর্কটিকে মোটামুটি চারটি ধারায় বিভক্ত করা যেতে পারে:

প্রথমত, 'উইটফোগেলের' মতে, মার্কস ও এঙ্গেলস এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতিসংক্রান্ত ধারণাটির পরিবর্তন করেছিলেন এবং শেষপর্যন্ত বর্জনও করেছিলেন (দেখুন ৩৫, পৃ. ৩৮০, ৮০২; ৩৩)। উইটফোগেলের মতে, "মার্কস-এঙ্গেলস যে এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্যটি অর্থাৎ ভূমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার অনুপস্থিতিই হলো প্রাচ্যে স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যব্যবস্থা অনিবার্য—বক্তব্যটি আদৌ বিজ্ঞানসম্মত নয়।" উইটফোগেল তাঁর যুক্তির সমর্থনে বাস্তব সমাজতন্ত্র থেকে কোনো উদাহরণ দিতে সক্ষম হননি, এমনকি মার্কস-এঙ্গেলসের কোনো প্রবন্ধ বা লেখার উদ্বৃতি প্রদানে সক্ষম হননি। উইটফোগেলের যুক্তির পদ্ধতিগত দিকটিও বিতর্কিত (বিস্তারিত দেখুন ১৬, পৃ. ১৭৮-১৮৩, ২০৮-২২০)। মার্কস-এঙ্গেলস এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতির ধারণাটি বর্জন করেছিলেন, তবে তা উইটফোগেলীয় যুক্তিতে নয়।

দ্বিতীয়ত; তোকেই (হাঙ্গেরি), গডেলিয়ের (ফ্রান্স), টের-আকোপিয়ান (সোভিয়েত ইউনিয়ন) প্রমুখের মতে, মার্কস ও এঙ্গেলস কখনো এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতির ধারণা বর্জন করেননি (দেখুন ৩২; ৪৫; ২৬; ১৩, পৃ. ২১০)। তোকেই-এর মতে, মার্কস এমনকি ১৮৮০-এর দশকেও এ ধারণাটি বর্জন করেননি। মার্কসের 'পুঁজি' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের ভিত্তিতে তোকেই লিখেছেন "পুঁজি'র তৃতীয় খণ্ডে কোথাও কোথাও এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতির কোনো কোনো বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ আছে। গ্রন্থটি মার্কস লিখেছিলেন মর্গানের 'প্রাচীনসমাজ' অধ্যয়নের পর এবং মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত" (দেখুন, ৪৫, পৃ. ১৭)। তোকেই-এর উল্লিখিত উদ্বৃতি সত্যভাষ্য নয়। কারণ, 'পুঁজি'র তৃতীয় খণ্ডটি মূলত রচিত হয়েছিল ১৮৬৫ সালের আগেই, অন্য দুটি খণ্ডের পাশাপাশি এবং মোটামুটি একই সময়ে। আর মার্কসের মৃত্যু ১৮৮৪ সালে। ১৮৬৫-পরবর্তী সময়ে মার্কস 'পুঁজি'র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন (দেখুন, ১১, পৃ. ৩)। সুতরাং 'পুঁজি'র তৃতীয় খণ্ড (অন্তত পাণ্ডুলিপিটি) মার্কসের জীবনের শেষের দিকের ধারণার প্রতিফলক নয়। তা মূলত প্রতিফলিত করে মার্কসের ঊনবিংশ শতাব্দীর ৬০-এর দশকের চিন্তাভাবনা।

তৃতীয়ত, অনেকেই মনে করেন যে মার্কস ও এঙ্গেলস কখনো এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি ধারণার সমর্থক ছিলেন না। যেমন পোসনিয়েভ-এর মতে, "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি প্রত্যয়টিকে" (সম্পূর্ণ ধারণা বা কনসেপ্ট অর্থে নয়) মার্কস "পুরাতাত্ত্বিক" (archaio), 'আদিম সাম্যবাদী", "উপজাতীয়" ইত্যাদি প্রত্যয়ের মতো একই অর্থে ইতিহাসের প্রাক্-শ্রেণিবিভক্ত বা প্রাক্-অসঙ্গতিপূর্ণ সমাজব্যবস্থা বোঝাতেই প্রয়োগ করেছিলেন। আর মর্গান যখন আমেরিকান-ইন্ডিয়ানদের মধ্যে গোষ্ঠীসমাজের অস্তিত্ব আবিষ্কার করলেন, তখন থেকেই "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি" ধারণা ব্যবহারের শেষ যুক্তিটিও নিঃশেষ হয়ে গেল" (দেখুন, ৫০, পৃ. ৬০-৬১)। পোর্সনেভের ধারণায় যুক্তিসম্পন্ন যা কিছুই থাকুক না কেন, এটা সত্য— মার্কস ও এঙ্গেলস ১৮৫৩-৫৯ অবধি প্রাচীন প্রাচ্যের আর্থসামাজিক ব্যবস্থাকে পাশ্চাত্যের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং তাদের কাছে এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি একটা সাধারণ প্রত্যয়ই ছিল না, তা ছিল অত্যন্ত যৌক্তিক একটি দৃষ্টিভঙ্গি। মর্গানের 'প্রাচীনসমাজ' প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে মার্কস ও এঙ্গেলস বিশ্বের সামাজিক-ঐতিহাসিক বিকাশের প্রারম্ভ বিন্দু হিসেবে প্রাচ্যসমাজের পরিবর্তে মর্গানীয় গোষ্ঠীসমাজকেই নির্দেশ করেছেন।

চতুর্থত, অনেকেই মনে করেন যে মার্কস ও এঙ্গেলস ১৮৮০-র দশকে এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতির ধারণা পরিবর্তন করেন (যেমন প্লেখানভ)। এই ধারার কেউ কেউ আবার মনে করেন যে, মার্কস নয় শুধু এঙ্গেলসই এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতির ধারণাটি শেষাবধি বর্জন করেছিলেন (যেমন ইলুসেচকিন, দেখুন ৩৭, পৃ. ৬৭)। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে মার্কস ও এঙ্গেলস একই সঙ্গে এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতিসংক্রান্ত ধারণাটি বর্জন করেছিলেন (দেখুন ৪৮, পৃ. ৩২)।

আমার মতে, 'পুঁজি'র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে মার্কস ও এঙ্গেলস উভয়েই এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি ধারণাটি বর্জন করেন। বর্জনপর্বে অন্যতম গবেষণাকর্ম হলো বাকুনিনের 'রাষ্ট্র ও নৈরাজ্য', ব্রিটিশ উকির ফির-এর 'ভারত ও সিংহলে আর্যগ্রাম

প্রসঙ্গে', কভালেভস্কির 'গোষ্ঠীভিত্তিক কৃষি ও তা পতনের কারণ, ধারা ও ফলাফল' ও মাউরের-এর 'গোষ্ঠী, পরিবার (খানা), গ্রাম ও শহরের অভ্যন্তরীণ কাঠামো ও সামাজিক ক্ষমতার ইতিহাস প্রসঙ্গে' পুস্তকসমূহের ওপর মার্কসের নোট; 'আতেচেস্তভিন্নিয়ে যাপিসকি'-র সম্পাদক ও ভেরা জাসুলিচের কাছে লেখা মার্কসের চিঠিপত্র এবং এঙ্গেলসের 'অ্যান্টি ড্যুরিং', 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি', 'কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টোর' দ্বিতীয় রুশ সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা; 'ইংল্যান্ডে শ্রমিকশ্রেণির অবস্থা' পুস্তকের আমেরিকা প্রকাশনার ভূমিকা, গবুনভের কাছে লেখা এঙ্গেলসের চিঠি, 'তাকাচেভ-এঙ্গেলস' বিতর্ক ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, ১৮৫৩ সালের রচনাবলীতে মার্কস ও এঙ্গেলস এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতির যেসব বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন তার প্রায় সবই তৎকালীন প্রাচ্যগবেষণার ফলাফল হিসেবে অন্যদের থেকে ধার করা। ১৮৫৯ সালের দিকে যদিও ধারণা পরিবর্তনপর্বের শুরু, তবু বলা যায়– ১৮৫৩-৬৭ সময়কালে তারা উভয়েই এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি ধারণাটি সমর্থন করেছেন, তবে তার অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যকে অত্যন্ত সমালোচনামূলক দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করছেন এবং এ পর্বের শেষ নাগাদ অন্যতম বৈশিষ্ট্য "ভূমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার অনুপস্থিতি"-এর বিরুদ্ধে কোনো কিছুই উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম হননি। সম্ভবত, ১৮৬৮ সাল থেকেই এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতিসংক্রান্ত অতীতের ধারণাটির অন্যতম বৈশিষ্ট্যসমূহকে মার্কস ও এঙ্গেলস ধীরে ধীরে বর্জন করা শুরু করেন। এ সময়ে মাউরের-এর পুস্তকের (দেখুন, ৫৩) বিষয়বস্তু নিয়ে তারা মনোযোগী হন এবং তা নোট করেন। বর্জন পর্বের সমাপ্তি ঘটে ১৮৮৪ সালে এঙ্গেলসের 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' শীর্ষক পুস্তকটি রচিত হওয়ার সাথে সাথে।

প্যারি কমিউনের পরাজয়, প্রথম ইন্টারন্যাশনালের বিলুপ্তি ও তৎপরবর্তী রাশিয়ার বৈপ্লবিক সংগ্রামের কারণেই সম্ভবত ঊনবিংশ শতাব্দীর ৭০-এর দশকে মার্কস ও এঙ্গেলস নতুন করে প্রাক্-পুঁজিবাদী আর্থসামাজিক কাঠামো বিশ্লেষণে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বাকুনিনের 'রাষ্ট্র ও নৈরাজ্য' পুস্তকের ওপর মার্কসের নোট, চেরনিশেভস্কি (মার্কসের ভাষায় "মহান রুশ গবেষক") এবং অন্য রুশ বিপ্লবী-গণতন্ত্রীদের চিন্তাভাবনার সাথে মার্কসের পরিচিতি ও তাকাচেভ-এঙ্গেলস বিতর্কের (১৮৭৫) ভিত্তিতে বলা যায় যে, "গোষ্ঠীসমাজ"-সংক্রান্ত ধারণা নবতর রূপ লাভ করছে, পরিবর্তিত হচ্ছে। ১৮৫০-এর দশকে যখন মার্কস-এঙ্গেলসের মতে, গোষ্ঠীসমাজ হলো বিকাশের প্রতিক্রিয়াশীল উপাদান (প্রতিবন্ধক), তখন ১৮৭০-এর

দশকে তারা মনে করেন যে, পশ্চাৎপদ দেশসমূহ পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে অতিক্রম না করেই, গোষ্ঠীসমাজকে কাজে লাগিয়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরিত হতে সক্ষম। গোষ্ঠীসমাজ নিয়ে এতদিন যে ধারণা বলবৎ ছিল তার বিপরীতে এঙ্গেলস লিখেছেন, "জমির ওপর গোষ্ঠীগত মালিকানার প্রথমটি আসলে ভারত থেকে আয়ারল্যান্ড পর্যন্ত, বিকাশের নিম্ন স্তরস্থিত সব ইন্দো-ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে এমনকি যেসব মালয় দেশ ভারতীয় প্রভাবে বিকাশ লাভ করেছে, সেখানেও দেখা যায়– যেমন জাভায়" (দেখুন, ১, পৃ. ৫১)। সেইসাথে গোষ্ঠীসমাজসংক্রান্ত নারদ্‌নিকদের ধারণাও আঘাতপ্রাপ্ত হলো। এ গোষ্ঠীসমাজ অপুঁজিবাদী পথে সমাজতন্ত্রে উত্তরিত হতে সক্ষম, তবে তার শর্ত সম্পর্কে এঙ্গেলস লিখেছেন যে, রুশ গোষ্ঠীসমাজ (তাবশ্চিনা) পুঁজিবাদী স্তর বাদ দিয়েই সমাজতন্ত্রে গমন করতে সক্ষম, যদি পশ্চিম ইউরোপে প্রলেতারীয় বিপ্লব সমাধা হয় (একই সাথে) এবং তা রুশ কৃষকদের উল্লিখিত উত্তরণপ্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয়... বৈষয়িক সহায়তা প্রদান করে..." (দেখুন, ৩৮, পৃ. ৫৪৫-৫৪৬)।

এ প্রশ্নে 'আতচেন্তভিন্নিয়ে যাপিসকি'-এর সম্পাদকমণ্ডলীর কাছে লেখা চিঠিতে (১৮৭৭) মার্কস রুশ বিপ্লবী-গণতন্ত্রী চেরনিশেভস্কির সাথে 'লিবারেল ইকনোমিস্টদের' বিরুদ্ধে ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন (দেখুন, ২২, পৃ. ২৯২। লিবারেল ইকনোমিস্টরা মনে করতেন যে গোষ্ঠীসমাজ নিশ্চিহ্ন করে পুঁজি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই তা সমাজতন্ত্রে গমন সক্ষম। 'আতেচেন্তভিন্নিয়ে যাপিসকি'-র সম্পাদনা পর্ষদ ও জাসুলিচের কাছে লেখা মার্কসের চিঠিতে মার্কস (দেখুন, ২২, পৃ. ২৯২, ২৩০) এবং গবুর্নভের কাছে লেখা এঙ্গেলসের চিঠিতে (দেখুন, ৩৮) মার্কস ও এঙ্গেলস উভয়েই উল্লেখ করেছেন যে, পশ্চিম ইউরোপে যদি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা হয়ে যায়, তাহলে গোষ্ঠীসমাজভিত্তিক রুশ দেশের পক্ষে– 'যার অর্ধেকের বেশি জমিজুড়ে চাষিদের যৌথমালিকানা'– পুঁজিবাদে উত্তরণ ব্যতিরেকেই সমাজতন্ত্রে গমন সম্ভব (দেখুন ৭, পৃ. ১০)।

আমার ধারণা ঊনবিংশ শতাব্দীর ৭০-এর দশকের রুশ বাস্তবতাই প্রাচ্যের সামাজিক-ঐতিহাসিক বিকাশসংক্রান্ত মার্কস-এঙ্গেলসের চিন্তাভাবনার বিকাশে সর্বাধিক মাত্রায় সহায়ক তথ্য প্রদান করে। যৌথমালিকানা পদ্ধতির অবশিষ্ট হিসেবে রুশ গ্রাম-গোষ্ঠীসমাজে (তাবশ্চিনা) বারবার কৃষি-ভূমি পুনর্বিভাগ প্রক্রিয়াটি ভারতের তুলনায় অধিকতর ব্যাপক ছিল। প্রাচ্যের দেশসমূহের মতোই রাশিয়াতেও স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা বলবৎ ছিল। আবার অন্যদিকে ঊনবিংশ শতকে ৭০-এর দশকে রুশ

অর্থনীতিতে ব্যক্তিমালিকানার পুঁজিবাদী ও প্রাক্-পুঁজিবাদী ধরণসমূহ ইউরোপীয় মাপেই বিকশিত হচ্ছিল, কৃষিতেও ইউরোপীয় পথে বিকশিত হচ্ছিল পুঁজিবাদ (বিস্তারিত দেখুন, ৬৫)। রুশ নারদনিকরা উল্লিখিত প্রক্রিয়ার একটি দিক– 'পুঁজিবাদের' বিকাশ ব্যাপারটি অস্বীকারের মাধ্যমে অন্য দিকটিকে, অর্থাৎ গোষ্ঠীভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থাকে অতিমূল্যায়িত করেন। গেরসেন, বাকুনিন ও স্লাভিয়ানোফিলদের ধারণার ভিত্তিতে নারদনিকরা মনে করতেন যে, "রুশ অর্থনীতি গোষ্ঠীসমাজভিত্তিক এবং রুশ রাষ্ট্রব্যবস্থা শ্রেণিনিরপেক্ষ" (দেখুন, ৬৫)। নারদনিকদের এই বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে এঙ্গেলস (তাকাচেভের সমালোচনা প্রসঙ্গে) লিখেছেন যে, "এটা সঠিক নয় যে, জার সম্রাট শূন্যে ঝুলে আছে। এটা ঠিক নয় যে, রুশ অর্থনৈতিক সম্পর্কসমূহ রাষ্ট্রেরই সৃষ্টি...। এটা ঠিক নয় যে, 'গ্রাম গোষ্ঠী' হলো রাষ্ট্রীয় নীতিমালার কৃত্রিম সৃষ্টি" (দেখুন, ৭৩, পৃ. ৫৩৮)। এঙ্গেলস দেখিয়েছেন যে, "রুশ রাষ্ট্রব্যবস্থা জমিদার, জোতদার ও উঠতি বুর্জোয়াদের অর্থনৈতিক স্বার্থেরই বাহক, রুশ রাষ্ট্র নয়, জনাব তাকাচেভই শূন্যে ঝুলে আছেন" (দেখুন ৭৩, পৃ. ৫৪০)। সুতরাং এঙ্গেলস যখন রুশ দেশেও 'এশিয়াটিক স্বৈরতন্ত্রের' কথা উল্লেখ করেছেন তখন 'বিশেষ এশিয়াটিক আর্থসামাজিক ব্যবস্থার' যুক্তি কোথায়? আর তাই যখন হাকস্তহাউজেন এবং পরবর্তী সময়ে মাউরের প্রমাণ করলেন যে, তথাকথিত এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি শুধু ভারতেই নয়, রুশ দেশেরও বৈশিষ্ট্য, তখন মার্কস ও এঙ্গেলস অত্যন্ত যুক্তিযুক্তভাবেই ঊনবিংশ শতাব্দীর ৭০-এর দশকে সুস্পষ্ট উপসংহার পৌঁছলেন যে, গোষ্ঠীভিত্তিক উৎপাদন ধরনসমূহ কোনো বিশেষ ধরনের শ্রেণিভিত্তিক, বিরোধমূলক (antagonistic) আর্থসামাজিক ব্যবস্থার ভিত্তি হতে পারে না। সমসাময়িককাল থেকেই এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য– ভূমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার অনুপস্থিতি, রাষ্ট্রের সরাসরি নির্দেশ ও পরিচালনায় বৃহৎ সেচব্যবস্থা, স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উপস্থিতি এবং ঐ রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে গোষ্ঠীসমাজের অস্তিত্ব ইত্যাদির একটি বাদে প্রায় সবকয়টি বৈশিষ্ট্যই অস্বীকার করা হয়। যেটি তখনো মার্কস-এঙ্গেলস কর্তৃক অস্বীকৃত হয়নি তা হলো এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি তত্ত্বের প্রধান প্রশ্ন– "সনাতন প্রাচ্যসমাজে কৃষিভূমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার অনুপস্থিতি"।

উল্লিখিত 'প্রধান প্রশ্নে' মার্কস-এঙ্গেলসের ধারণার পরিবর্তন ঘটেছিল কি? ঘটে থাকলে তা কখন এবং কীভাবে? উল্লেখ্য, ঊনবিংশ শতাব্দীর ৭০-এর দশকে প্রকাশিত (ও লিখিত) মার্কস-এঙ্গেলসের কোনো লেখায় এ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু নেই। তবে রুশ দেশের অপুঁজিবাদী পথে বিকাশের তত্ত্বটি এঙ্গেলস পরে

প্রাচ্যসমাজের জন্যও প্রযোজ্য বলে মনে করতেন (দেখুন ২২, পৃ. ৩৩১)। সেই সাথে এটাও ঠিক যে, ১৮৮১-৮২ সালে এঙ্গেলস এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি ধারণার প্রধান প্রশ্নটি (প্রধান বৈশিষ্ট্য) অস্বীকার করেননি। 'অ্যান্টি-ড্যুরিং'-এ এঙ্গেলস লিখেছেন (১৮৭৭-৭৮) যে, "সমগ্র প্রাচ্য, যেখানে ভূস্বামী' (land proprietor) প্রত্যয়টিও অনুপস্থিত...। শুধু তুর্কিরা তাদের 'দখলকৃত' প্রাচ্যীয় দেশসমূহে সর্বপ্রথম আমদানি করল একধরনের সামন্তবাদী ভূ-মালিকানা" (দেখুন, ৪২, পৃ. ১৮১)। এরপরেই এঙ্গেলস বলেছেন যে, "ভারত থেকে রাশিয়া পর্যন্ত যেখানেই প্রাচীন গোষ্ঠীসমাজের অস্তিত্ব প্রচলিত ছিল, সেখানেই হাজার হাজার বছর ধরে প্রাচ্যীয় স্বৈরতন্ত্র নামের একধরনের নির্মম রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি সৃষ্টি হয়। যেসব স্থানে এসব গোষ্ঠীসমাজ ভেঙ্গে যায়, শুধু সেখানেই জনগোষ্ঠী উত্তরোত্তর বিকাশে সক্ষম হয় এবং তাদের পরবর্তী অর্থনৈতিক প্রগতি স্তর হলো– দাস শ্রমের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি ও তার অগ্রগতি" (দেখুন ৪২, পৃ. ১৮৬)। অর্থাৎ এঙ্গেলস একদিকে যেমন প্রাচ্যসমাজে ভূমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার অনুপস্থিতির কথা বলেছেন তেমনি অন্যদিকে এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতির পরবর্তী আর্থসামাজিক ব্যবস্থা হিসাবে দাস সমাজের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। সেইসাথে এটাও ঠিক যে, প্রাচীন গোষ্ঠী'র সাথে 'প্রাচ্যীয় স্বৈরতন্ত্রে'র সংযোগে-উদ্ভূত আর্থসামাজিক ব্যবস্থাকে 'বিশেষ' আর্থসামাজিক ব্যবস্থা হিসেবে ধরে নেওয়া আদৌ সঠিক নয়। কারণ এক্ষেত্রে এঙ্গেলস উদাহরণ হিসেবে ভারতের পাশাপাশি রাশিয়ার কথা উল্লেখ করেছেন (দেখুন, ১, পৃ. ৫১-৫৬), অথচ এঙ্গেলস ইতিমধ্যে জানতেন যে, রাশিয়ার আধিপত্যবিস্তারকারী উৎপাদন ধরন ছিল– ব্যক্তিমালিকানাধীন জোতদারি অর্থাৎ সামন্তবাদী পদ্ধতি (স্মরণ করুন এঙ্গেলস-তাকাচেভ বিতর্ক)। 'অ্যান্টি-ড্যুরিং'-এর তৃতীয় অধ্যায়ে ব্যাপারটি আরো বেশি সুস্পষ্ট। এঙ্গেলস দেখিয়েছেন যে, রাষ্ট্রের উৎপত্তিতে গোষ্ঠীসমাজ, কৃত্রিম সেচব্যবস্থা ইত্যাদির বিপরীতে ব্যক্তিগত মালিকানা ও তা থেকে উদ্ভূত শ্রেণিদ্বন্দ্বের ভূমিকাই প্রধান। এ-মর্মে এঙ্গেলসের উক্তিটি হলো "শ্রেণিদ্বন্দ্বের মধ্যে বিকশিত এতদিন ও এখনকার যে সমাজের কথা আমরা জানি, তার প্রয়োজন ছিল রাষ্ট্রব্যবস্থার, অর্থাৎ নির্দিষ্ট উৎপাদন পদ্ধতিতে শোষকশ্রেণির উৎপাদনের বাহ্যিক শর্তকে সচল রাখার প্রতিষ্ঠান, অর্থাৎ শোষিত শ্রেণিকে বলপূর্বক পদানত রাখার সংগঠন (দাসত্ব, ভিলেইনেজ অথবা ভূমিদাসত্ব, মজুরিশ্রম)" (দেখুন ৪২, পৃ. ২৯১)। সুতরাং রাষ্ট্র "প্রাচীনকালে– দাস-মালিকদের রাষ্ট্র..., মধ্য যুগে– সামন্তবাদী জমিদারদের রাষ্ট্র...আমাদের কালে– বুর্জোয়াদের রাষ্ট্র" (দেখুন ৪২, পৃ. ২৯২)। সুতরাং শ্রেণিসমাজের ইতিহাসে বিরাজমান প্রধান উৎপাদন পদ্ধতিসমূহ

এবং প্রধান রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে এঙ্গেলস কখনো এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি অথবা প্রাচ্যীয় স্বৈরতন্ত্রের উল্লেখ করছেন না। কেন? এ-ক্ষেত্রে ধারণা করা যেতে পারে যে, এঙ্গেলস হয় মনে করতেন যে, এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি হলো শ্রেণি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তির পূর্বেকার আর্থসামাজিক ব্যবস্থার ভিত্তি (অর্থাৎ এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি আদিম সাম্যবাদী উৎপাদন পদ্ধতি) অথবা তিনি এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি ধারণাটিকেই বর্জন করেছিলেন (আমার মতে শেষোক্তটি সঠিক)। তবে উভয় ক্ষেত্রেই (ধারণা যেটাই সঠিক হোক না কেন) অযৌক্তিক প্রতিপন্ন হয় সেই কল্পিত আর্থসামাজিক ব্যবস্থা, যা 'আদিম গোষ্ঠীমালিকানা ও রাষ্ট্রব্যবস্থার সম্মিলন'। উল্লেখ্য, রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে এঙ্গেলস ১৮৭৭-৭৮ সালে যে মৌলিক ধারণা পোষণ করতেন পরে সেটাই রাষ্ট্র সম্পর্কে সাধারণ মার্কসবাদী ধারণা হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত (এ মর্মে বিস্তারিত দেখুন ২; ৫৯; ৫৪; ৫৫; ৫৬;৬৯)।

কভালেভস্কির ধারণা 'প্রাচ্যে রাষ্ট্রীয় মালিকানার আধিপত্য ছিল না'— মার্কস এ ধারণাটির ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং লেখেন যে, "কভালেভস্কিই প্রথম যিনি বুঝেছিলেন যে ভারতে মোগলরাই একমাত্র ভূ-মালিক ছিলেন না" (দেখুন, ৫৪, পৃ. ১৩১)। তবে কভালেভস্কি কর্তৃক ভারতে "গোষ্ঠীমালিকানার বিপরীতে ব্যক্তিমালিকানার অতিমূল্যায়নের" সাথে মার্কস দ্বিমত পোষণ করেন। মার্কস লিখেছেন যে, "ব্রিটিশ মস্তিষ্কধারীরা আস্তে আস্তে অনুধাবন করলেন যে, গোষ্ঠীমালিকানা নির্দিষ্ট স্থানের বৈশিষ্ট্য নয়, তা ভূমির ওপর উৎপাদনসম্পর্কের নির্ধারিত ধরনমাত্র; যার ব্যতিক্রম হয়েছিল সেসব স্থানে, যেখানে মুসলমান সরকার বিশেষ আমলার ব্যক্তিমালিকানা প্রতিষ্ঠা করে" (দেখুন, ৫৪, পৃ. ১৮)। কভালেভস্কির মতো মার্কসও উল্লেখ করেন যে, "মুসলমান আমলে, এমনকি তারও আগে ভারতে ভূমির ওপর ব্যক্তিমালিকানা বহাল ছিল" (দেখুন ৫৪, পৃ ১৪; ৫৫, পৃ. ৪১৫-৪১৬)।

ভারতের প্রাক্-ঔপনিবেশিক আর্থসামাজিক ব্যবস্থার স্বরূপ সম্পর্কে মার্কস কী ধারণা পোষণ করতেন? মেন্-এর মতোই কভালেভস্কিও ভাবতেন (দেখুন ৬৩) যে, প্রাক্-ঔপনিবেশিক ভারতের সামন্তবাদ ছিল অসম্পূর্ণ। মার্কস যদিও কভালেভস্কির সাথে এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করতেন, তবু মধ্যপ্রাচ্যের আর্থসামাজিক বিকাশ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে, "ভারতের মতোই (মোঘলদের পতনের যুগের ভারত), তুর্কিদের আধিপত্য মধ্যপ্রাচ্যে সামন্তবাদী শোষণব্যবস্থা কায়েম করেনি" (দেখুন ৫৬, পৃ. ৮)। কভালেভস্কির পুস্তকের ওপর লিখিত মার্কসীয় নোট থেকে উপসংহারে পৌঁছানো যায় যে, ঊনবিংশ শতকের ৫০-এর দশক পর্যন্ত মার্কস বিশ্বাস করতেন

যে, প্রাচীন কাল থেকেই প্রাচ্যে (বিশেষত ভারতে) ভূমির ওপর গোষ্ঠীমালিকানার পাশাপাশি ব্যক্তিগত মালিকানাও বহাল ছিল এবং সেইসাথে উৎপাদনসম্পর্কের সামন্তবাদীকরণের প্রক্রিয়াটিও অব্যাহত ছিল। উল্লিখিত নোটে মার্কস এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি এবং দাস উৎপাদনসম্পর্কের কথা উল্লেখ করেননি, যা বলেছেন তা হলো প্রাক্-পুঁজিবাদী উৎপাদনসম্পর্কের অস্তিত্বের কথা। এ প্রসঙ্গে মার্কসের মূল উদ্দেশ্য ছিল– বুর্জোয়াদের "ব্যক্তিমালিকানাসম্পর্কের চিরস্থায়ীত্ব"-সংক্রান্ত ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণের লক্ষ্যে প্রাক্-ঔপনিবেশিক আর্থসামাজিক কাঠামোতে বিরাজমান আদিম ব্যবস্থার উচ্ছিষ্টাংশসমূহের সারার্থ উদ্‌ঘাটন করা। শুধু তা-ই নয়, ব্রিটিশ গবেষক ফির্-এর 'ভারত ও সিংহলে আর্য গ্রাম প্রসঙ্গে' পুস্তকের মন্তব্য করতে গিয়ে মার্কস লিখেছেন, "ফির্ নামক এই গর্দভটি গ্রামগোষ্ঠী সংগঠনকে সামন্তবাদী বলে আখ্যায়িত করেছেন" (দেখুন ৫৭, পৃ. ৭৫)। এই গ্রামগোষ্ঠী সংগঠনকে মার্কস ভাবতেন প্রাক্-শ্রেণিবিভক্ত অথবা আদিম সাম্যবাদী সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অবশিষ্টাংশ হিসেবেই।

সম্ভবত ১৮৮১-৮৪ (মার্কসের মৃত্যুর আগের কয়েক বছর) হলো সেই কালপর্ব, যখন মূর্ত সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও তার একের অন্যটিতে উত্তরণসম্পর্কিত মার্কসীয় তত্ত্বটি তার যৌক্তিক পরিণতি লাভ করে। মর্গান কর্তৃক আবিষ্কৃত আদিম গোষ্ঠীসমাজসংক্রান্ত ধারণাবলীর ভিত্তিতেই প্রাক্-পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সম্পর্কেও এঙ্গেলসের ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটে। প্রসঙ্গত, উল্লেখ করা উচিত যে, মর্গানের গবেষণাফলাফল যদিও কভালেভস্কির পুস্তকেরও দুই বছর আগে প্রকাশিত হয় (১৮৭৭ সাল), তবু সমসাময়িককালে ইউরোপবাসীর কাছে তা ছিল স্বল্পপ্রচারিত, প্রায়-অজানা। কভালেভস্কি আমেরিকা ভ্রমণের সময় মর্গানের পুস্তকটি ক্রয় করেন এবং মার্কসকে তা ধার দেন। পরবর্তী সময়ে মার্কস মর্গানের পুস্তকের ওপর বিস্তারিত মন্তব্য রচনা করেন (আনুমানিক সময়কাল ১৮৮০-১৮৮১ সাল)। মর্গানের রচনা যে মার্কসের প্রাক্-পুঁজিবাদী আর্থসামাজিক ব্যবস্থাসংক্রান্ত ধারণায় প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা জাসুলিচের কাছে লেখা মার্কসের চিঠি (মার্চ, ১৮৮১) থেকে সহজেই অনুমেয়। এই চিঠিতে **মার্কস**

প্রথমত, সরাসরি মর্গানের আবিষ্কারের সাথে একমত হন (দেখুন ৫৮, পৃ. ৮০২);

দ্বিতীয়ত, ১৮৫৩ সালের পর এই প্রথমবারের মতো আদিম সাম্যবাদী সমাজসম্পর্কিত তত্ত্ব সূত্রায়ন করেন এবং উল্লেখ করেন যে, তা

প্রাচীন সমাজের পূর্বসূরী এবং আদিম সাম্যবাদকে 'পুরাতাত্ত্বিক' (archaic) ব্যবস্থা নামে অভিহিত করেন (কোথাও এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতির উল্লেখ নেই)। উল্লিখিত চিঠিতে মার্কস ভারতের 'গোষ্ঠীভিত্তিক' সমাজকে আদিম সমাজ হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং লেখেন যে, "আদিম গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজ হলো সর্বক্ষেত্রেই পুরাতাত্ত্বিক ব্যবস্থার সর্বশেষ পর্ব" (দেখুন ৫৮,পৃ. ৪০৩); এবং

তৃতীয়ত, একবারও রাষ্ট্রের বিষয়টি উত্থাপন করেননি। অথচ ইতিপূর্বে যখনই 'গ্রামগোষ্ঠী সমাজ'-এর প্রসঙ্গ এসেছে, তখনই রাষ্ট্রব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে (স্মরণ করুন 'অ্যান্টি-ড্যুরিং', কভালেভস্কির পুস্তকের মার্কসীয় নোট)। মর্গানের তত্ত্বটিকে মার্কস যেভাবে গ্রহণ করেছিলেন তা হলো– মালিকানা (ব্যক্তি), শ্রেণিবিভক্তি ও রাষ্ট্রহীন একটি সমাজে অর্থনৈতিক উপাদানসমূহের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলশ্রুতিতেই দাস সমাজের জন্ম। শ্রেণিবিভক্ত সমাজ সৃষ্টিতে মার্কস (মর্গানও) এমন কোনো উত্তরণপর্ব লক্ষ করেননি যেখানে উৎপাদনের উপায়ের ওপর ব্যক্তিমালিকানা ও শ্রেণি অনুপস্থিত অথচ রাষ্ট্র বিদ্যমান। এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতিকে আদিম সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থার অংশ হিসেবেও মার্কস স্বীকার করেননি। সুতরাং ১৮৮০-৮১ সালের দিকে মার্কস এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতির তত্ত্বকে সক্রিয়ভাবে বর্জন করেছেন বললে অত্যুক্তি হবে না।

মার্কস ও কাউটস্কির কাছে লেখা এঙ্গেলসের চিঠিপত্র (যথাক্রমে ১৮৮২ ও ১৮৮৪ সালে লেখা) থেকে লক্ষ করা যায় যে, মর্গানের পুস্তকটি এঙ্গেলসকে উদ্বুদ্ধ করে এবং তারই ভিত্তিতে মার্কসও একটি গবেষণাকার্য পরিচালনায় আগ্রহী হন (দেখুন ৪১, পৃ. ১০৩; ২, পৃ. ১৬৭)। মার্কসের কাছে লেখা চিঠিতে এঙ্গেলস উল্লেখ করেন যে, "মর্গানের গবেষণাকার্যটি আদিম সমাজ সম্পর্কে অভিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এমনতর নির্ধারক ভূমিকা পালন করছে, যেমনটি জীববিজ্ঞানে ডারউইন। মর্গান স্বাধীনভাবে ঐতিহাসিক বিকাশের মার্কসীয় বস্তুবাদী ব্যাখ্যা আবিষ্কার করেছেন এবং আধুনিক সামাজিক সম্পর্কের কম্যুনিস্ট ব্যাখ্যায় পৌঁছেছেন। এই প্রথম আমেরিকান-ইন্ডিয়ানদের গোষ্ঠী-সংগঠনের উদাহরণে রোমান ও গ্রিক গোত্রের (Gen) বিশ্লেষণের মাধ্যমে আদিম সমাজের ইতিহাসের সুদৃঢ় ভিত্তি উদ্‌ঘাটিত হলো" (দেখুন ৫৬, পৃ.

৯৭)। ঊনবিংশ শতকের পঞ্চাশের দশকে এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি প্রসঙ্গে মার্কস ও এঙ্গেলস যে রকমটি বলেছিলেন ঠিক অনুরূপভাবেই আদিম সাম্যবাদী আর্থসামাজিক ব্যবস্থা সম্পর্কে একই চিঠিতে এঙ্গেলস ব্যক্ত করেছেন যে, "... হল্যান্ডবাসীরা 'প্রাচীন গোষ্ঠী-সাম্যবাদের' ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয়ভাবে উৎপাদনকার্য সংগঠিত করেছিল ... প্রসঙ্গত এটা প্রমাণিত হয় যে, জাভা দ্বীপে আদিম সাম্যবাদ, ভারত ও রাশিয়ার মতোই ব্যাপক মাত্রার শোষণ ও স্বৈরতন্ত্রের প্রকৃষ্ট ভিত্তি হিসেবে কাজ করে" (দেখুন, ৫৬, পৃ. ৯)। সুতরাং স্পষ্ট যে, রাষ্ট্র– গোষ্ঠীসমাজের অভ্যন্তর থেকে উদ্ভূত নয়; হল্যান্ডদের আগমনের প্রাক্কালে সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হলো 'প্রাচীন গোষ্ঠী সাম্যবাদ'; এবং 'সাম্যবাদে'র অর্থ প্রাচীন এশিয়াটিক স্বৈরতন্ত্র অথবা 'দাসত্ব' নয়। এঙ্গেলসের মতে, গোষ্ঠীসমাজ শোষণের ভিত্তি হতে পারে তখন, যখন তাতে ঔপনিবেশিক শোষকদের হস্তক্ষেপ রয়েছে।

মর্গানের 'প্রাচীনসমাজ' পাঠ করার পর একই বিষয়ে মার্কসও গবেষণাকার্য পরিচালনায় উদ্বুদ্ধ হন (তবে মৃত্যুজনিত কারণে তা শেষ করা সম্ভব হয়নি)। এ বিষয়ে এঙ্গেলস তাঁর 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি'তে লিখেছেন "নিচের অনুচ্ছেদগুলো একদিক দিয়ে একটি অর্পিত দায়িত্ব পালনেরই ফলশ্রুতি, 'পরিকল্পনাটি ছিল স্বয়ং মার্কসের', আর কারো নয়; তিনি তাঁর নিজের– বলা যেতে পারে আমাদের দুজনের পর্যালোচিত ইতিহাসের বস্তুবাদী শিক্ষার অনুষঙ্গে মর্গানের গবেষণার ফলগুলো বিবৃত করতে এবং এভাবে তার সামগ্রিক তাৎপর্য ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন" (দেখুন, ২, পৃ. ৭)। মর্গানের পুস্তকের ওপর লেখা মার্কসের নোটসমূহ থেকে দেখা যায় যে, মার্কস মূল প্রশ্নসমূহে মর্গানের সাথে ঐকমত্যে পৌঁছেছিলেন। মার্কস প্রাচীন সমাজবিকাশে অর্থনৈতিক মৌলসমূহের ভূমিকার প্রশ্নে মর্গানের মূল পুস্তকের কাঠামো পরিবর্তন করেন। মর্গানের মূল পুস্তকের দ্বিতীয় অংশ "ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত ধারণার বিকাশ"-কে মার্কস তাঁর নোটের শেষ অংশে, অর্থাৎ তৃতীয় ও চতুর্থ অংশ যথাক্রমে "পরিবারসংক্রান্ত ধারণার বিকাশ" ও "মালিকানাসংক্রান্ত ধারণার বিকাশ"-এর পরে স্থানান্তরিত করেন। অর্থাৎ মার্কসের কাছে আদিম সমাজবিকাশের পরম্পরা যোগসূত্রটি হলো দ্বন্দ্বাত্মক বস্তুবাদী। যৌক্তিক এ যোগসূত্রটি এ রকম: বৈষয়িক উৎপাদন ও পরিবারের বিকাশ→ মালিকানাসম্পর্কের বিকাশ→ রাষ্ট্রের উদ্ভব। মার্কস লিখেছিলেন যে, "উৎপাদনের উপায়ের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা সভ্যতা বিকাশের অপেক্ষাকৃত স্বল্প সময়ের ব্যবধানে সমাজে আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়েছে, পরবর্তীতে তা মনুষ্যসমাজে নিয়ে এসেছে স্বৈরতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ, রাজতন্ত্র, সুবিধাভোগী শ্রেণি এবং সবশেষে প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্র।"

এঙ্গেলসের 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্র' পুস্তকে উল্লিখিত মার্কসীয় ধারণা আরো সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর পুস্তকে প্রথমেই আলোচিত হচ্ছে আদিম সংস্কৃতির বিভিন্ন পর্ব, তারপর গোষ্ঠী-সংগঠন এবং সবশেষে উৎপাদনের উপায়ের ব্যক্তিগত মালিক কর্তৃক গোষ্ঠীসমাজের ধ্বংসের মধ্যে দিয়েই উৎপত্তি হচ্ছে রাষ্ট্র। এঙ্গেলসের মতে, সভ্যতার বিকাশ শুরু হচ্ছে শ্রেণিভিত্তিক সমাজব্যবস্থার উৎপত্তির সাথে সাথে, আর "সভ্যতার সূত্রপাত পণ্যোৎপাদনের যে স্তরে, তার অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য হলো: (১) ধাতব মুদ্রা এবং আনুষঙ্গিক আর্থিক মূলধন, সুদ ও তেজারতির প্রবর্তন; (২) উৎপাদকদের মধ্যস্থতাকারী রূপে বণিকদের অভ্যুদয়; (৩) জমির ব্যক্তিগত মালিকানা ও বন্ধকি প্রথার উদ্ভব, এবং (৪) উৎপাদনের প্রধান রূপ হিসেবে দাস শ্রমের প্রচলন। ... সভ্য সমাজে রাষ্ট্রই সমাজকে সংহত রাখে এবং সব ক্ষেত্রেই তা হলো মূলত শোষিত, নিপীড়িত শ্রেণিকে দমনের যন্ত্র" (দেখুন, ২, পৃ. ১৯৩)। এঙ্গেলসের মতে, দাস সমাজই হলো প্রথম শ্রেণিবিভক্ত (শ্রেণিভিত্তিক) সমাজ এবং ভূমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা ছাড়া কোনো সভ্য, শ্রেণিবিভক্ত সমাজ নেই। এঙ্গেলসের মতে " শোষণের প্রথম রূপ দাস প্রথা– প্রাচীন জগতের বৈশিষ্ট্য; এর পরবর্তী, মধ্যযুগে– ভূমিদাস প্রথা, এবং আধুনিক যুগে– মজুরিশ্রম। এগুলোই সভ্যতার তিনটি মহৎ যুগের বৈশিষ্ট্যসূচক পরাধীনতার তিনটি মহৎ রূপ" (দেখুন ২, পৃ. ১৯৩)। 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা, রাষ্ট্রের উৎপত্তি' গ্রন্থের কোথাও প্রাচ্যের স্বৈরতন্ত্র অথবা এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতির উল্লেখ নেই। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, ১৮৮৪ সাল নাগাদ মার্কস ও এঙ্গেলস উভয়েই এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতির ধারণাটি শুধু বর্জনই করেননি, সেই সাথে আর্থসামাজিক ব্যবস্থার বিকাশ ও রূপান্তরসংক্রান্ত তত্ত্বটিকে পরিপূর্ণ রূপদানে সক্ষম হয়েছিলেন এবং উপসংহারে পৌঁছেছিলেন যে– সুদূর অতীতে (আদিম সাম্যবাদী সমাজে) যেমন উৎপাদনের উপায়ের ওপর সামাজিক মালিকানার আধিপত্য ছিল, ঠিক তেমনি অনাগত ভবিষ্যতেও (সাম্যবাদী সমাজে) সেটা বলবৎ থাকবে।

মার্কস ও এঙ্গেলস ১৮৪৭-৪৮ সালে 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারে' এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আঁচ দিয়েছেন সত্য, কিন্তু ১৮৮৮ সালে এঙ্গেলস এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতির অস্তিত্ব যে ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত সে সম্পর্কে একটি সংশোধনী সংযোজন করেছেন। আর তা হলো "১৮৪৭ সালে সমাজের প্রাগ-ইতিহাস (prehistory), লিখিত ইতিহাসের পূর্ববর্তীকালের সামাজিক সংগঠনের বিবরণ প্রায় অজ্ঞাতই ছিল। তারপরে, হাকস্তহাউজেন রুশ দেশে জমির ওপর যৌথমালিকানা আবিষ্কার করেন, মাউরার প্রমাণ করেন যেসব টিউটনিক

জাতির ইতিহাস শুরু হয় এই সামাজিক ভিত্তি থেকে। ক্রমে ক্রমে দেখা গেল যে, ভারত থেকে আয়ারল্যান্ড পর্যন্ত সর্বত্র গ্রামগোষ্ঠীই (village communities) সমাজের আদি রূপ ছিল কিংবা রয়েছে। 'গোত্রের' (Gens) আসল প্রকৃতি এবং 'উপজাতির' (tribe) সঙ্গে তার সম্পর্ক বিষয়ে মর্গানের চূড়ান্ত আবিষ্কার এই আদিম কমিউনিস্ট ধরনের সমাজের ভেতরকার সংগঠনের বিশিষ্ট রূপটি খুলে ধরল। এই আদিম গোষ্ঠীগুলো ভেঙ্গে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ভিন্ন ভিন্ন এবং শেষপর্যন্ত পরস্পরবিরোধী শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়তে থাকে" (দেখুন ৭, পৃ. ৩২)। আর এই ভাঙ্গনের ধারা বিশ্লেষণ করা হয়েছে 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' পুস্তকে। এরপরও যদি প্রাচ্যবিশারদেরা এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন যে, মার্কস ও এঙ্গেলস "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি" ধারণাটির সমর্থক ছিলেন কি না অথবা এঙ্গেলসের 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' ইউরোপকেন্দ্রিক কি না— তাহলে ভ্রান্তি নিরসনে ১৮৮৭ সালে এঙ্গেলসের লেখা উদ্বৃত করা যেতে পারে, যেখানে তিনি বলছেন, "এশিয়াটিক ও চিরায়ত প্রাচীন সমাজে দাস শোষণই ছিল শ্রেণিনির্যাতনের নির্ধারক রূপ, অর্থাৎ যত না জনগোষ্ঠীকে ভূমি থেকে উচ্ছেদ করা ততোধিক ব্যক্তির অস্তিত্বকে পদানত করা...। মধ্যযুগে জনগোষ্ঠীকে ভূমি থেকে উচ্ছেদ নয়, বরং বিপরীতে তাদের ভূমির সঙ্গে জড়িত রাখাই সামন্ত শোষণের ভিত্তি" (দেখুন ৪০, পৃ. ৩৪৮-৩৪৯)।

মার্কস-এঙ্গেলসপরবর্তী চিরায়ত মার্কসবাদের অন্যতম প্রবক্তা লেনিন তাঁর কোনো গবেষণাকর্মে 'এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি' প্রত্যয়টি স্বীকার করেননি। এ মর্মে উল্লেখ করা যেতে পারে যে,

ক. প্রাক্-পুঁজিবাদী রুশ দেশকে প্লেখানভ যখন এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতিভিত্তিক দেশ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন, তখন লেনিন বলেছেন সামন্তবাদের কথা (দেখুন, ৬৭, পৃ. ৪৩৩-৪৩৪);

খ. চীনসহ এশিয়ার প্রাক্-পুঁজিবাদী সম্পর্কসমূহকে লেনিন আখ্যায়িত করেছেন সামন্তবাদী হিসেবে (দেখুন ৬৮, পৃ. ৪০৩-৪০৪); এবং

গ. বিশ্বের আর্থসামাজিক বিকাশ-ইতিহাস বিশ্লেষণে লেনিন এঙ্গেলসের পুস্তক 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি'-তে প্রদত্ত সূত্রকেই অনুকরণ করতেন এবং সবসময়ই আদিম সাম্যবাদের পরই স্থান দিয়েছেন দাস সমাজকে, সেখানে এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতির কোনো উল্লেখ নেই (দেখুন, ৬৯)।

উপসংহার

এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে মার্কস ও এঙ্গেলসের ধারণার বিকাশ-বিশ্লেষণে এ প্রবন্ধে যেসব উপসংহারে পৌঁছানো সম্ভব সেগুলো সময়ক্রম ও যুক্তিক্রমানুসারে নিম্নরূপ:

১. ১৮৫৩ সাল অবধি মার্কস ও এঙ্গেলস এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি প্রকল্পটি বিশ্বাস করতেন এবং সে বিশ্বাসে বিশেষ কোনো নতুনত্ব ছিল না, তা তৎকালীন চিরাচরিত প্রাচ্যবিশারদদের ধারণারই প্রতিফলন ছিল মাত্র;

২. ১৮৫৩ সালে মার্কস-এঙ্গেলস কর্তৃক নির্দেশিত ও পরবর্তী সময়ে ১৮৫৭-৫৯ সালে মার্কস কর্তৃক সূত্রায়িত বিশেষ সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে 'এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি' প্রকল্পটি বিশ্বপরিসরে সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার রূপান্তরসংক্রান্ত তত্ত্ব সৃষ্টির একটি পর্ব হিসেবেই আবির্ভূত হয়;

৩. ১৮৫৭-৬৭ সময়কালে মার্কস ও এঙ্গেলস উভয়েই এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি প্রকল্পটির একটি বৈশিষ্ট্য ব্যতীত (প্রধান বৈশিষ্ট্য: "সনাতন প্রাচ্যে ভূমির ওপর ব্যক্তিমালিকানার অনুপস্থিতি") অন্য প্রায় সব বৈশিষ্ট্যই ভ্রান্ত প্রমাণে সচেষ্ট হয়েছেন;

৪. ১৮৭০-১৮৯৪ কালপর্বে মার্কস ও এঙ্গেলস উভয়েই এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি প্রকল্পটি ভ্রান্ত প্রমাণিত করেছেন এবং তার পরিবর্তে প্রাচ্যসমাজে আদিম, দাস ও সামন্তবাদী উৎপাদন পদ্ধতির অস্তিত্ব উদ্‌ঘাটন করেছেন; এবং শেষাবধি একই সময়ে

৫. মার্কস ও এঙ্গেলস প্রমাণ করেছেন, সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিকাশের দৃষ্টিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে কোনো মৌলিক বৈপরিত্য নেই; নেই কোনো পার্থক্য; বিভাজন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে নয়, বিভাজন হবে দাস ও সামন্তবাদী আর্থসামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে;– আদিম সাম্যবাদী সমাজ– শ্রেণিহীন ও রাষ্ট্রহীন এবং আদিম সাম্যবাদ ও দাস সমাজব্যবস্থার মধ্যবর্তীকালে কোনো 'বিশেষ' আর্থসামাজিক ব্যবস্থা নেই, নেই এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি অথবা ভূমির ওপর

ব্যক্তিগত মালিকানার অনুপস্থিতিসহ রাষ্ট্রের উপস্থিতি, এবং শ্রেণিবিভক্ত সমাজ ছাড়া রাষ্ট্রের উৎপত্তি হতে পারে না।

প্রবন্ধে ব্যবহৃত গ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহ

ক. বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থ, প্রবন্ধ

১. এঙ্গেলস. ফ. 'রাশিয়ায় সামাজিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে'; মার্কস-এঙ্গেলস রচনা সংকলন, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম অংশ (দুই খণ্ডে সমাপ্ত), মস্কো, ১৯৭২।

২. এঙ্গেলস. ফ. 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি'। মর্গানের গবেষণা প্রসঙ্গে। মার্কস-এঙ্গেলস, নির্বাচিত রচনাবলী (১২ খণ্ডে সমাপ্ত), খণ্ড ১১, মস্কো ১৯৮২।

৩. বারকাত. আবুল., 'এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি– সোভিয়েত প্রাচ্য গবেষণার দুই পর্ব'। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়* পত্রিকা, জুন ১৯৮৫, পৃ. ৫৪-৭৫।

৪. মার্কস. ক., 'ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ ফলাফল '। মার্কস-এঙ্গেলস রচনা সংকলন (দুই খণ্ডে সমাপ্ত), প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় অংশ, মস্কো ১৯৭১।

৫. মার্কস. ক., 'ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ফলাফল'। মার্কস-এঙ্গেলস রচনা সংকলন (দুই খণ্ডে সমাপ্ত), প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় অংশ, মস্কো ১৯৭১।

৬. মার্কস. ক., 'অর্থশাস্ত্র বিচার প্রসঙ্গে', মস্কো, ১৯৮৩।

৭. মার্কস ও এঙ্গেলস, 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার', মস্কো, ১৯৭৭।

খ. ইংরেজি ভাষায় রচিত গ্রন্থ, প্রবন্ধ

৮. Banerjee, D. M., Pre-capitalist Economic Formations and the Indian Economy (1550-1700)". *The Quarterly Review of Historical Studies,* Calcutta, 1966-67, vol, no. 1. pp.47-50.

৯. Bedekar, D. K., 'Marxism and Ancient India'. *India Today,* Bombay, 1951, vol.1. no.3.

১০. Campbell. G., *Modern India: Sketch of the system of Civil Government,* London 1852.

১১. Engels. F., 'Preface to the Capital of K. Marx', vol. II, Moscow 1974.

১২. Encausse, H. C, Schram. S. R., *Marxism and Asia,* London, 1969.

১৩. Godelier, Maurice, The concept of the Asiatic Mode of Production and Marxist Models of Social Evolution", in Seddon David (ed), *Relation of Production. Marxist Approaches to Economoc Anthropology,* London, 1978.

১৪. Gouldner, Alivia W., *The two Marxisms, Contradictions and Anomalies in the develoment of theory*. London, 1980.

১৫. Hegel. G. W. F., *The Philosophy of History.* N. Y. Dover, 1956.

১৬. Hindess, B and Hirst, P. Q., *Pre-capitalist Modes of Production.* London, 1979.

১৭. Hoffman, E., 'Social-Economic Formations and Historical Science'. *Marxism Today,* London, 1965, no.9.

১৮. Kosambi, N. D., 'Marxism and Ancient India', *India Today,* Bombay, 1951, vol. 1, no.2.

১৯. Kovalevsky, M. M., *Communal Agriculture: The Causes, Course and Consequence of its Decline*. Leningrad, 1962.

২০. Lewin, G., *The Problem of Social Formations in Chinese History.* M. T., 1967, no.1.

২১. Lewin, G., 'The Marxist theory of Social Formations'. *Marxism Today,* London, June 1969.

২২. Marx, K. and Engels. F., *Selected Correspondence*. Moscow, Progress, 1975.

২৩. K. Marx, K., *Pre-capitalist Economic Formations,* Introduction by Hobsbawn, E., London, 1964

২৪. L. Marx, K., *Grundrisse. Foundations of the Critique of Political Economy* (Rough Draft). Translated with a Foreword by Martin Nicolaus. London, 1973.

২৫. Marx, K., 'Revolution in China and in Europe'. *Marx-Engels Collected Works,* Moscow 1979, vpl. 12.

২৬. Mc Culloch, J. K., *The Literature of Political Economy,* London, 1845.

২৭. Patton, R., *The Principles of Asiatic Monarchies,* London, 1801.

২৮. Rafles, T. Stromford, *History of Java.* London, 1824,

২৯. Skalnik. P and Pokora. T., 'Beginning of the Discussion about the Asiatic Mode of Production in the USSR and People's Republic of China'. *Eirene,* Praha, 1966, vol. V.

৩০. Suret, Canal. J., *The Traditional Societies of Tropical Africa,* M. T. 1966. no. 2.

৩১. Thorner, D., 'Marx on India and the Asiatic Mode of Production'. *Contributions to Indian Sociology.* Paris: The Hague, December, 1966, no. IX.

৩২. Tokei, F., *Asiatic Mode of Production,* Budapest, 1968.

৩৩. Wilks, M., *Historical Sketches* of the South of India. An attempt to trace the history of Mysoor. London, 1810.

৩৪. Wittfogel, K. A., 'Results and Problems of the study of Oriental Despotism'. *Journal of Asian Studies,* 1969, no. 2.

৩৫. Wittfogel, K. A., *Oriental Despotism,* New Haven: Yale University Press, 1963.

গ. রুশ ভাষায় রচিত গ্রন্থ, প্রবন্ধ

৩৬. ইত্তলক, ই. স. 'এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে', মার্কসবাদের পতাকা' (পত্রিকা), মস্কো ১৯৩১, সংখ্যা ৩। (Eolk. I. S., Khe voprosu ob aziatskom sposobe prizevodstva. *Plamennia iznamia Marxisma).*

৩৭. ইলুসেচকিন. ভ. প., 'অ-অর্থনৈতিক বলপ্রয়োগের পদ্ধতি ও সামাজিক বিবর্তনের দ্বিতীয় প্রধান পর্বের সমস্যা প্রসঙ্গে', মস্কো, ১৯৬৭। (Elusechkin.,V. P. Sistema vineekonomicheskie prenuzdenia e problema fiteroi osnovnoi stadi ovsestvennoi evolusii).

৩৮. এঙ্গেলস, ফ., "ইমিগ্রেশন রচনাবলী', মার্কস-এঙ্গেলস রচনাসমগ্র, খণ্ড ১৮।

৩৯. এঙ্গেলস, ফ., ৫ই আগস্ট ১৮৮০ সালে গবুনর্ভ. ম. ক-এর কাছে লেখা চিঠি। মার্কস-এঙ্গেলস রচনাসমগ্র, খণ্ড ১৪।

৪০. এঙ্গেলস, ফ., 'ইংল্যান্ডে শ্রমিকশ্রেণির অবস্থা'। ভূমিকা: আমেরিকায় শ্রমিক আন্দোলন। মার্কস-এঙ্গেলস রচনাসমগ্র, খণ্ড ২১।

৪১. এঙ্গেলস, ফ., ৮ ডিসেম্বর ১৮৮২ সালে মার্কসের কাছে লেখা চিঠি। মার্কস-এঙ্গেলস রচনাসমগ্র, খণ্ড ৩৫।

৪২. এঙ্গেলস, ফ., 'অ্যান্টি-ড্যুরিং'। মার্কস-এঙ্গেলস রচনাসমগ্র, খণ্ড ২০।

৪৩. গডেলিয়ের, ম., "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতির ধারণা ও সমাজবিকাশের মার্কসীয় ছক"। 'এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণ' (পত্রিকা), মস্কো ১৯৬৫, সংখ্যা ১। (Godelier, M., Poniatia aziatskova sposoba prizevodstva e Marxistskaya Skhema razvitia obsectva. *Narodi Azi-E-Afriki*).

৪৪. টের-আকোপিয়া, .ন. ব., 'এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি ও গ্রাম-গোষ্ঠীসমাজ সম্পর্কে মার্কস-এঙ্গেলসের ধারণা প্রসঙ্গে'। 'এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণ' (পত্রিকা), মস্কো ১৯৬৫, সংখ্যা ২, ৩। (Ter-Akopian, N. B., "Razvitia vizgliadov Marxa E Engelsa na aziatskom sposobe prizevodstva e zemledelcheskiuuo obschinu". *Narodi Azi-e-Afriki*).

৪৫. তোকেই, ফ., 'সমাজব্যবস্থার তত্ত্ব'। মার্কসের তাত্ত্বিক ক্রিয়াকাণ্ডে সামাজিক রূপসমূহের বিশ্লেষণ। মস্কো, ১৯৭৫। (Tokei, F., Theori obsectvennikh formacii. Problemi analiza obsectvennikh form vi theoreticheskoi nasledctvi Karla Marksa).

৪৬. প্রাচীন ইতিহাস বিশ্লেষণে মার্কসের পাণ্ডুলিপি, 'প্রাক্-পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক রূপসমূহ'-এর তাৎপর্য', পুরাকালীন ইতিহাস পত্রিকা", মস্কো ১৯৪০, সংখ্যা ১। (Uznachenia rukopisi Marksa "Formi, predsectvuyusie capitalistichiskomu prizevodstbu" dilia estori derebnosti. *Vestnik Derebnoi Estorii*).

৪৭. প্রাচ্যের দেশসমূহের ঐতিহাসিক বিকাশের সাধারণ ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ। প্রাচ্যের সামাজিক বিকাশসংক্রান্ত বির্তকের দলিলাদি। মস্কো, ১৯৬৬। (Obsie-e-asobennoie vi estoricheskom razvitii stran vostoka. Materiali diskussi ob ovsectvennikh formasiakh na vostoka).

৪৮. 'প্রাচ্যে প্রাক্-পুঁজিবাদী সমাজসমস্যা' মস্কো, ১৯৭১। (Problemi do-kapitalistichiskikh obsectb vistranakh vostoka).

৪৯. পোলিয়ানস্কি, ফ. ইয়া, 'অ-মার্কসীয় অর্থনীতি-তত্ত্বের লেনিনীয় সমালোচনা', মস্কো, ১৯৭৭। (Polianski, F. Y.; Kritika V. I. Leninim anti-marksistskikh ekonomichiskikh theori).

৫০. পোর্সনিয়েভ, ভ. ফ., "শেষ জীবনে এবং 'ঐতিহাসিক অনুক্রমিক লেখনী'র প্রতি মার্কসের ঐতিহাসিক আগ্রহ প্রসঙ্গে"। "মার্কস-ঐতিহাসিক" (সংকলন), মস্কো, ১৯৬৮। (Porsniev, V. F.; Estorichiskie enteresi Marksa vi poslednie godi zizni e rabota nad "-chronologichiskimi Vipiskama", Sbornik, "*Marks-Estorik*").

৫১. বার্নিয়ার, ফ., 'মহান মোগল রাষ্ট্রে শেষের দিকে সংঘটিত রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের ইতিহাস'। মস্কো-লেনিনগ্রাদ, ১৯৩৬। (Bernier, F., Estori posliednikh politichiskikh pereborotov vi gosudarstve velikogo mogola).

৫২. ভাসিলিয়েভ, এল. এস. এবং স্তচেভস্কি ই. আ., 'প্রাক্-পুঁজিবাদী সমাজের উদ্ভব ও বিবর্তনের তিনটি মডেল'। "ইতিহাস পত্রিকা"; মস্কো, ১৯৬৬, সংখ্যা ৬। (Vasiliev, L. S., Stuchevski. E. A.; Tre modwli vozniknovenia e evolusii do-kapitalistichiskikh ovestb. *Vestnikh Estorii*).

৫৩. মাউরের, গ. ল, 'গোষ্ঠী, পরিবার (খানা), গ্রাম ও শহরের অভ্যন্তরীণ কাঠামো ও সামাজিক ক্ষমতার ইতিহাস প্রসঙ্গে'। মস্কো, ১৮৮০। (Maurer. G. L., Videnie vi estoriu obschinnogo, podvornogo, selskogo e gorodskogo ustroistva e obsestvennoi vlasti).

৫৪. মার্কস, ক., "অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি।" সি. পি. এস. ইউ-এর কেন্দ্রীয় কমিটির মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ইনস্টিউটের আর্কাইভ দলিল। আংশিক প্রকাশিত হয়েছে *'সোভিয়েত প্রাচ্য গবেষণা'* জর্নালে, মস্কো, ১৯৫৮, সংখ্যা ৫।

৫৫. মার্কস, ক., "অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি।" ঐ। আংশিক প্রকাশিত হয়েছে *'সোভিয়েত প্রাচ্য-গবেষণা'* জর্নালে। মস্কো, ১৯৫৮, সংখ্যা ৪।

৫৬. মার্কস, ক., " অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি।" ঐ। আংশিক প্রকাশিত হয়েছে *'প্রাচ্যের সমস্যা"* জর্নালে'। মস্কো, ১৯৫৯, সংখ্যা ১।

৫৭. মার্কস. ক., জর্জ ফিরের পুস্তক 'ইন্ডিয়া ও সিংহলে আর্যদের গ্রাম'-এর নোট। *'এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণ'* (পত্রিকা), মস্কো ১৯৬৪, সংখ্যা-১। (Marks. K., "Konspekt khenigi dz. Fira Ariiskaya derevnia vi Indi e vi Ceylone." *Narodi Azi-e-Afriki*).

৫৮. মার্কস, ক., ভ. ই. জাসুলিচের কাছে লেখা মার্কসের চিঠির খসড়া। মার্কস-এঙ্গেলস রচনাসমগ্র (রুশ), খণ্ড ১৯।

৫৯. মার্কস, ক., ল. গ. মর্গানের পুস্তক "প্রাচীন সমাজ"-এর নোট। "মার্কস-এঙ্গেলস আর্কাইভ", মস্কো ১৯৪১, খণ্ড-৯।

৬০. মার্কস, ক., 'দর্শনের দারিদ্র্য'। মার্কস-এঙ্গেলস রচনাসমগ্র (রুশ), খণ্ড ৪।

৬১. মার্কস, ক., 'প্রাক্-পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক রূপসমূহ'। মার্কস-এঙ্গেলস রচনাসমগ্র (রুশ), খণ্ড ৪৬, অংশ ১।

৬২. মার্কস, ক., 'চীনের অবস্থা'। মার্কস-এঙ্গেলস রচনাসমগ্র (রুশ), খণ্ড ১৫।

৬৩. মেন্. গ. স., 'রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের প্রাচীনতম ইতিহাস'। "এম. পি. বি বক্তৃতা", ১৮৭৬। (Men, G. S., Derebniesaya estoria. Uchrezdenii leksi SPB).

৬৪. রেদের, দ. ফ., এবং উলিয়ানভস্কি প. এ., 'এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি'। 'সোভিয়েত ইতিহাস মহাভিধান', মস্কো ১৮৬১, খণ্ড ১। (Reder, D. F., Ulianovski P.A.; Aziatski sposob prizevodstva. *Sovietskaya Istorichskaya Ensiklopedia).*

৬৫. লেনিন, ভ. ই., 'রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ'। লেনিন রচনাসমগ্র (রুশ), খণ্ড ৩।

৬৬. লেনিন, ভ. ই., 'জনগণের বন্ধু কারা এবং কীভাবে তারা সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের বিরুদ্ধে লড়াই করে'। লেনিন রচনাসমগ্র (রুশ), খণ্ড ১।

৬৭. লেনিন, ভ. ই.,'রুশ সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের কৃষি কর্মসূচী'। লেনিন রচনাসমগ্র (রুশ), খণ্ড ৬।

৬৮. লেনিন, ভ. ই., 'চীনে গণতন্ত্র ও নারদনিকইজম প্রসঙ্গে'। লেনিন রচনাসমগ্র (রুশ), খণ্ড ২১।

৬৯. লেনিন, ভ. ই., 'রাষ্ট্র প্রসঙ্গে'। লেনিন রচনাসমগ্র (রুশ), খণ্ড ৩৯।

৭০. মেনো, জ., "লা পেনসে্" জর্নালে আদিকালীন শ্রেণিসমাজসম্পর্কিত বিতর্ক প্রসঙ্গে। "ইতিহাসের সমস্যা" (জর্নাল), মস্কো ১৯৬৭, সংখ্যা ৯। (Scheno. Z., "Diskussia a ranneklassobikh ovsestvakh na stranichakh zurnala La Pensee," *Voprosi Istorii*)

৭১. স্লেগেল, ফ., 'ভারতের আর্থসামাজিক ও ঐতিহাসিক রূপ'। মস্কো, ১৮১০।

৭২. হাকস্তহাউজেন, এ., 'জনগণের জীবনের, বিশেষত রাশিয়ার গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক গবেষণা প্রসঙ্গে'। মস্কো। ১৮৭০, খণ্ড ১। (Gakstgausen. A., Essledovania vunutrennikh otnosenii narodnoi zizni e vi osobennosti selskikh utcherezdenii Rossi).

৭৩. হেরেন, এ. এইচ. ল., 'রাজনীতি-অর্থনীতি ও বাণিজ্য প্রসঙ্গ' (প্রাচ্যসমাজ, বিকল্প ব্যবস্থা)। মস্কো, ১৮২৫ (প্রথম প্রকাশ জার্মান ভাষায়, গোটিনজেন, ১৮০৪-১৮০৫)।

প্রবন্ধ ৪

এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি– সোভিয়েত প্রাচ্য গবেষণার দুই পর্ব

প্রসঙ্গকথা: *এ প্রবন্ধটির রচনাকাল ১৯৮২-৮৪, আর প্রকাশকাল ১৯৮৫। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল* ***ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকায়*** *(দ্বাবিংশ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৯২, জুন ১৯৮৫, পৃ. ৫৪-৭৫)। আমার জানামতে, এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি নিয়ে* ***ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকায়*** *এটাই প্রথম প্রকাশনা। সোভিয়েত প্রাচ্যবিশারদদের রুশ ভাষায় লেখা অধিকাংশ গ্রন্থ-প্রবন্ধ অন্য ভাষায় অনূদিত হয়নি (হয়ে থাকলেও সামান্য কয়েকটি)। একদিকে উৎপাদন পদ্ধতি হিসেবে এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি নিয়ে গবেষিত প্রকাশনার স্বল্পতা, আর অন্যদিকে স্বল্পপরিচিত বিদেশি ভাষায় মূল লেখা (এক্ষেত্রে রুশ ভাষা)– এসবই আমাকে এ প্রবন্ধটি লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এ লেখাটি প্রকাশিত হওয়ার পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাডেমিক মহলে উত্তর-প্রত্যুত্তরজাতীয় বিতর্কমূলক (polemics অর্থে) লেখালেখি হয়। সেসব লেখালেখি ১৯৮৫-৮৭ সময়কালে* ***ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকায়*** *প্রকাশিত হয়েছিল।*

ভূমিকা

প্রত্যেক উৎপাদন পদ্ধতির অর্থনৈতিক প্রত্যয়সমূহের সারার্থ উদ্‌ঘাটন করা বৃহৎ অর্থে রাজনৈতিক অর্থনীতির অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। সেই অর্থে প্রাক্-পুঁজিবাদী সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক তত্ত্বের অসম্পূর্ণতাই প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সমাজের বহু তাৎপর্যপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে বির্তকের মূল কারণ। ১৮৫০ সালে মার্কস-এঙ্গেলস কর্তৃক সূত্রায়িত (formulated) এবং পরবর্তী সময়ে "অর্থনৈতিক পাণ্ডুলিপি ১৮৫৭-১৮৫৮", "রাজনৈতিক অর্থনীতির সমালোচনা প্রসঙ্গে", "পুঁজি",

"অ্যান্টি-ড্যুরিং" ইত্যাদি পুস্তকে বিকশিত "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি" প্রকল্পকে কেন্দ্র করে যে বির্তক, সেটি উল্লিখিত বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণ করে।

"এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি"সংক্রান্ত বিতর্ক চলছে প্রায় একশত পঞ্চাশ বছর ধরে। বিতর্কে তুলনামূলক অধিক মাত্রায় অংশগ্রহণ করেছেন রাশিয়া (পরবর্তী সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন) ও ফ্রান্সের সামাজিক বিজ্ঞানীরা। এই বিতর্কে যেসব প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে সেগুলো মূলত নিম্নরূপ:

১. "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি" কোনো বিশেষ উৎপাদন পদ্ধতি (Mode of Production) কি না? যদি সেটি কোনো বিশেষ উৎপাদন পদ্ধতি হয়ে থাকে, তাহলে মার্কসের সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (Social-Economic formation)-সংক্রান্ত তত্ত্বের (যেখানে মাত্র পাঁচটি উৎপাদনব্যবস্থা স্বীকৃত) পুনর্মূল্যায়ন (reappraisal) প্রয়োজন কি না?

২. "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি" যদি বিশেষ উৎপাদন পদ্ধতি হয়েই থাকে, তাহলে তার বৈশিষ্ট্যসমূহ কী কী? অন্যান্য উৎপাদন পদ্ধতির সাথে "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি"র পার্থক্যসমূহ কোথায়।

৩. ঐতিহাসিক বিকাশে কোথায়, কখন "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি"-র অস্তিত্ব লক্ষণীয়? (অর্থাৎ এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতির অস্তিত্বের কালপর্ব)। তার বিকাশসূত্রটাই বা কী?

উপরোক্ত প্রশ্নসমূহকে সামনে রেখে "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি"-র রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সারার্থ উদ্‌ঘাটনের প্রশ্নে সোভিয়েত প্রাচ্যবিশারদেরা যে বিভিন্ন দল/উপদলে বিভক্ত হয়েছেন সেটির বৈশিষ্ট্য নির্ধারণই এ প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য। প্রবন্ধের পদ্ধতিগত ভিত্তি হিসেবে গৃহীত হয়েছে মার্কসীয় রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বসমূহ এবং তথ্যগত ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে সোভিয়েত প্রাচ্যবিশারদদের ৭৪টি গবেষণাপুস্তক, প্রবন্ধ ও সংশ্লিষ্ট দলিলপত্র[৪১]।

সোভিয়েত বিতর্কের দুই পর্ব

"এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি" গবেষণায় বিষয়বস্তুর গভীরে প্রবেশের মাত্রা ও তার অন্তর্নিহিত সারার্থ উদ্‌ঘাটনের দৃষ্টিতে সোভিয়েত প্রাচ্য গবেষণাকে দুটি কালপর্বে

[৪১] সংশ্লিষ্ট সব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে মূল উৎস থেকে। তথ্য, বিবৃতি, বক্তব্য সবকিছুই অনুবাদ করেছেন লেখক নিজে।

বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথম পর্বটি ১৯২৫ থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় পর্বটি ১৯৬৪ সাল ও তৎপরবর্তীকাল। এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতির সারার্থ উদ্‌ঘাটনের ক্ষেত্রে প্রথম পর্বে গবেষণার কেন্দ্রীয় বিষয় যখন "মালিকানাসম্পর্ক" (Ownership-related relations), তখন দ্বিতীয় পর্বের বিষয় "শোষণজনিত সম্পর্ক" (Exploitation related relations)। প্রথম পর্বে যখন বাস্তব ঐতিহাসিক তথ্যাদি (ইতিহাস, নৃতত্ত্ব , ভূগোল, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি ইত্যাদি বিষয়)- ভিত্তিক বিশ্লেষণ প্রায়ই অনুপস্থিত, তখন দ্বিতীয় পর্বে ঐসব তথ্যের ব্যাপক প্রয়োগ লক্ষণীয়। প্রথম পর্বে যখন নামকরণের লক্ষ্যে সারার্থ উদ্‌ঘাটন সমস্যাটা প্রধান হিসেবে বিবেচিত, তখন দ্বিতীয় পর্বে "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি"কে প্রাক্-পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির অনিবার্য লক্ষণ হিসেবে দেখা হয়েছে। উভয় পর্বেই "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতির" সারার্থকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন নামে সূত্রায়িত করার চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে– এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি হলো বিশেষ উৎপাদন পদ্ধতি– প্রাক্-দাস উৎপাদন পদ্ধতি; দাস অথবা সামন্তবাদী উৎপাদন পদ্ধতির বিশেষ রূপ; সামন্তবাদ ও দাস উৎপাদন পদ্ধতির মিশ্ররূপ; মুচলেকাবদ্ধ-শ্রমভিত্তিক অথবা বলপূর্বক কর দানে বাধ্যভিত্তিক অথবা রাষ্ট্রীয় গোষ্ঠী-সমাজভিত্তিক সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি। দ্বিতীয় পর্বে– উল্লিখিত সূত্রসমূহে প্রথম পর্বের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী যুক্তি সংযোজিত হয়েছে।

সোভিয়েত বিতর্কের প্রথম পর্ব

বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকের গোড়া থেকেই অর্থাৎ ঔপনিবেশিক শোষণ পদ্ধতির সংকট ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিকাশের ফলশ্রুতিতে তৃতীয় বিশ্বের সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোর চরিত্র নির্ধারণ এবং তার অতীত ও বর্তমান সমাজদেহের বৈশিষ্ট্য উদ্‌ঘাটনের সমস্যাটা স্বাভাবিকভাবেই ব্যাপক বিতর্কের বিষয়বস্তু হিসেবে পরিগণিত হয়। তৃতীয় বিশ্বের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের, বিশেষত ১৯২৫-২৭ সালের চীনা বিপ্লবের চালিকাশক্তি ও তার ভবিষ্যৎ পথ নিরূপণের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে বিতর্কটি বিশেষ শক্তি সঞ্চয় করে। সমসাময়িককালে সঙ্গত কারণেই চীনা সমাজের সামাজিক আর্থকাঠামোটি প্রাচ্যবিশারদদের গবেষণার মূল বিষয়বস্তু হিসেবে পরিগণিত হয়। এ সময় সোভিয়েত গবেষক ভার্গা, কান্তারোভিচ, গ্রিনেভিচ প্রমুখের মূল গবেষণালক্ষ্য ছিল চীনা আমলাতন্ত্রের সামাজিক চরিত্র উদ্‌ঘাটনের সমস্যার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা ("সেন্‌সি", "জেনট্রি"; দেখুন ভার্গা ১৯২৮; ৫০-৫৩; ১৮)। "সেন্‌সি", "জেনট্রি" অথবা ভার্গার ভাষায় "শিক্ষিত শ্রেণি" ("ক্লাস গ্রামাটেইভ")

হলো কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও গোষ্ঠী-সমাজের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত আমলাদের একটি সামাজিক স্তর। ভার্গার মতে, "সেন্‌সি" ও "জেনট্রি"-রা রাষ্ট্রীয় আয় ভাণ্ডারের পক্ষে কর রাজস্ব সংগ্রহের মাধ্যম হিসেবে কেন্দ্রীয় ক্ষমতাবলয়ের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত এবং এভাবেই তারা রাষ্ট্রের আয়-উৎসের লক্ষ্যে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত দ্রব্যের (surplus product) ব্যাপক অংশের আত্মসাৎকারী। পশ্চিম ইউরোপের ফিউডালদের সাথে "সেন্‌সি" ও "জেনট্রি"-দের সামঞ্জস্যের চেয়ে অসামঞ্জস্যই বেশি। এই সামাজিক স্তরটিকেই সোভিয়েত গবেষক মাদিয়ার, কোকিন ও পাপাইয়ান এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতির নিয়ামকশ্রেণি হিসেবে বিবেচনা করেছেন (দেখুন ৫৯; ২৭)। উল্লেখ্য, ১৯২৫-২৭ সালের চীনা বিপ্লবের সময় চীনা কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রধান স্লোগান হলো "জমিদার-জোতদার ও জেনট্রি নির্মূল কর"। এমনকি কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের গ্রোগ্রামেও "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি"-র অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে (দেখুন, ১৬)।

১৯২৯ সালে সোভিয়েত গবেষক দুবরোভস্কি প্রণীত "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি, সামন্তবাদ, ভূমি দাসব্যবস্থা ও বাণিজ্যপুঁজিসংক্রান্ত প্রশ্নসমূহের সারার্থ" শীর্ষক গ্রন্থটি (দেখুন ৪৩) প্রকাশনার পরে "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতির বিতর্কটি জোরালো হয়। কারণ, তৎকালীন রচনাবলী থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, উল্লিখিত পুস্তক প্রকাশনার অব্যবহিত পরে এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি বির্তকটির রূপান্তর ঘটে প্রাক্-পুঁজিবাদী সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসংক্রান্ত সাধারণ সমাজবিজ্ঞানীয় বিতর্কে। প্রাচ্যে বিশেষ এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতির অস্তিত্বসংক্রান্ত থিসিসটি দুবরোভস্কি অস্বীকার করেন। এ লক্ষ্যে তিনি একাধারে যেমন প্রমাণ করার চেষ্টায় ছিলেন যে, মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিন "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি" তত্ত্বের স্রষ্টা ছিলেন না, তেমনি অন্যদিকে ঐতিহাসিক বিকাশে সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পাঁচটি পর্বের (আদিম সাম্যবাদী সমাজ, দাস সমাজ, সামন্ত সমাজ, পুঁজিবাদী সমাজ ও সাম্যবাদী সমাজ) পরিবর্তে ১০টি মূল উৎপাদন পদ্ধতির তত্ত্ব সৃষ্টি করেন। যেমন দুবরোভস্কির মতানুসারে, সামন্তবাদ ও ভূমিদাস-ব্যবস্থা, পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে গমনের সময়কার অন্তবর্তীকালীন সমাজব্যবস্থা, সমাজতান্ত্রিক সমাজ ও বিশ্ব সাম্যবাদ– এগুলো বিভিন্নধর্মী উৎপাদন পদ্ধতির পরিচায়ক। সমসাময়িক সোভিয়েত প্রাচ্যবিশারদেরা দুবরোভস্কির সমালোচনা করেন এবং ১৯২৮-৩১ সালে মাদিয়ার, ইকিমভ, বেরিন, কোকিন, পাপইয়ান, ফক্স, স্টুসের, গোডেস ও অন্য অনেকেই তাঁদের গবেষণায় যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি" মার্কসের সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তত্ত্বের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ (দেখুন, ৫৯, পৃ. ১০৪-১২৭;

৬০; ৪৯; ৬; ২৭; ৪৮)। উল্লিখিত গবেষণাসমূহে "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি" হলো রাষ্ট্রীয় নির্দেশনায় বিকাশমান গ্রামীণ ভূমিভিত্তিক গোষ্ঠীসমাজ অর্থাৎ গোড়ার দিকের শ্রেণিভিত্তিক সমাজ, যেখানে উৎপাদনের প্রধান শর্তসমূহের (ভূমি ও জল) সর্বোচ্চ মালিক রাষ্ট্র ; শোষণের মূল ধরন কর রাজস্ব এবং শ্রমজনিত বাধ্যবাধকতা (বেগার শ্রম– "এুদাভাইয়া পাভিননস্ত", সামাজিক শ্রম বা গোষ্ঠীশ্রম)।

মাদিয়ারের মতানুসারে "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি"-র শ্রেণিগত, রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও শোষণজনিত সম্পর্কসমূহের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ (দেখুন ২৭, পৃ. L. III) :

ক. প্রাচ্যে মূল শ্রেণিসমূহ হলো গোষ্ঠীসমাজের অন্তর্ভুক্ত কৃষকসমাজ এবং একটি বিশেষ শ্রেণি, যারা ঐ গোষ্ঠীসমাজেরই প্রাক্তন সদস্য (মিসরের ধর্মযাজক, প্রাচীন চীনের সাহিত্যিক সম্প্রদায় ইত্যাদি)।

খ. রাষ্ট্রের স্বৈরশাসন (despotic অর্থে)।

গ. ভূমি ও সেচব্যবস্থার ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় মালিকানার উপস্থিতি।

ঘ. শোষণের মূল অর্থনৈতিক রূপ রাজস্ব, যা করের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ (অথবা রাজস্ব ও কর সমান)। গোষ্ঠীসমাজে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত দ্রব্যকে নির্ধারক শ্রেণি রাজস্ব কর হিসেবে আত্মসাৎ করে।

ঙ. সামন্তবাদের সাথে "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি"-র সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগত বৈশিষ্ট্য: অর্থনৈতিক সারার্থের দৃষ্টিতে উদ্বৃত্ত দ্রব্য শোষণের রূপটি সামন্তবাদের সাথে এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতির সাদৃশ্য নির্দেশ করে। কিন্তু সামন্তবাদী মালিকানা ও সামন্তশ্রেণির অনুপস্থিতি প্রাচ্যসমাজের সাথে সামন্তবাদীয় সমাজের নীতিগত বৈসাদৃশ্য নির্দেশ করে।

এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যসমূহ সূত্রবদ্ধকরণ এবং প্রাচ্যে শ্রেণিসংগ্রামের বহুরূপতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মাদিয়ারের অবদান নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু অসম্পূর্ণতা যথেষ্ট মাত্রায় বিদ্যমান। কারণ, ধর্মযাজক ও শিল্পী-সাহিত্যিকদের (যথাক্রমে মিসর ও প্রাচীন চীনের ক্ষেত্রে) "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি"-র নির্ধারক

শ্রেণি[৪২] হিসেবে উল্লেখ করার ক্ষেত্রে মার্কসীয় পদ্ধতিতত্ত্ব অনুপস্থিত। অন্যথায় সেক্ষেত্রে ঐসব ধর্মযাজক ও শিল্পী-সাহিত্যিকদের সাথে উৎপাদনের উপায়সমূহের ওপর মালিকানার সম্পর্ক; সামাজিক উৎপাদনপ্রক্রিয়ায় তাদের অবস্থান ও গুরুত্ব; সামাজিক শ্রমসংগঠন ও ব্যবস্থাপনায় তাদের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়ক যথাযোগ্য গুরুত্ব প্রদান করা উচিত ছিল।

১৯২৮-৩১ সময়কালে সোভিয়েত ইউনিয়নের "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি" বিশারদদের গবেষণার অন্যতম বিষয়বস্তু হলো এশিয়াটিক ও সামন্তবাদী উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে সাদৃশ্য অনুসন্ধান করা। তবে বৈসাদৃশ্য অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে ১৯৩১ সালে লেনিনগ্রাদে অনুষ্ঠিত বিতর্কে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছেন কভালিয়েভ ও স্ত্রুভে। কভালিয়েভ "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি"-র সমর্থনে প্রাচীন সমাজে সামন্তবাদের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে, প্রাক্-দাস সমাজে সামন্তবাদের অস্তিত্ব স্বীকার করার অর্থ সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা অস্বীকার করা। কাভালিয়েভ লিখেছেন, "যদি ধরে নেওয়া হয় যে, এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি হলো সামন্তবাদ, তাহলে আদি প্রাচীন সমাজও সামন্তবাদী সমাজ; কারণ মার্কসের মতে, যৌথ শোষণ ও যৌথমালিকানার ভিত্তিতেই আদি প্রাচীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত। ফলাফলে আমাদের সামনে সামন্তবাদের অস্তিত্ব প্রাচীন উৎপাদন পদ্ধতির (ancient mode of production) পূর্বে ও পরে। সুতরাং আমরা সরাসরি বিকাশের চক্রতত্ত্বের মতো প্রতিক্রিয়াশীল তত্ত্বে নিমজ্জিত হচ্ছি" (দেখুন, ১৫, পৃ. ৭৯-৮০; ১৭)।

প্রাচীন মিসরের লোককথা, পুঁথিশাস্ত্র ও অন্য দলিল দস্তাবেজের ভিত্তিতে স্ত্রুভে উপসংহারে পৌঁছান যে, "ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য কৃষিজমি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন নয়, তা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এমনকি রাজরাজরাদের মালিকানাধীন এবং সেক্ষেত্রে মালিকানা বিক্রয় হয় না, বংশপরম্পরায় হস্তান্তরিত হয়" (দেখুন, ১৫, পৃ. ৯৮-৯৯)। উল্লিখিত তথ্যাবলীর ভিত্তিতে স্ত্রুভে মনে করেন যে, নীল নদের তীরে, ভূমির ওপর রাষ্ট্রীয়

[৪২] মার্কসীয় বিশ্লেষণে শ্রেণির সংজ্ঞা নিম্নরূপ: "শ্রেণিবর্গ হলো মানুষের বৃহৎ গ্রুপসমূহ, যাদের পার্থক্য করা হয় প্রথমত: সামাজিক উৎপাদনের ঐতিহাসিক নির্দিষ্ট কাঠামোতে তাদের অবস্থানে; দ্বিতীয়ত: উৎপাদনের উপায়সমূহের উপর তাদের সম্পর্ক বিচারে; তৃতীয়ত: শ্রমের সামাজিক সংগঠনে তাদের অংশের পরিমাণ ও তা করায়ত্ব করার পদ্ধতি হিসেবে। শ্রেণিবর্গ মানুষের এই ধরনের গ্রুপ, যেখানে সামাজিক অর্থনীতির নির্দিষ্ট কাঠামোতে বিভিন্ন গ্রুপের অবস্থানের পার্থক্যের ফলে এক গ্রুপ অন্য গ্রুপের শ্রমকে আত্মসাৎ করে" (দেখুন ৬৮, খন্ড ৩৯, পৃ. ১৫)।

মালিকানা নির্ধারক ভূমিকা পালন করে। আর তাই প্রাচীন মিসরকে (রোমানদের বিজয়ের পূর্বপর্যন্ত) তিনি "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি"-র আওতাভুক্ত করেন।

কভালিয়েভ ও স্ত্রুভের রচনাবলী থেকে সহজেই অনুমেয় যে, 'এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি'-র বিতর্কটি ধীরে ধীরে পদ্ধতির আওতাধীন ঐতিহাসিক কালক্রম নির্ধারণের ক্ষেত্রে গভীর থেকে গভীরতর পর্যায়ে প্রবেশ করে। যখন থেকে প্রমাণ করা সম্ভব হলো যে, প্রাচ্যসমাজে ভূমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা ও জোতদারি বিস্তৃত ও বিকাশমান প্রক্রিয়া, ঠিক তখন থেকেই উপনিবেশিক ও আধা-উপনিবেশিক এশিয়াকে বাদ দিয়ে শুধু প্রাচীন (মিসর, ব্যাবিলন, চীন) ও মধ্যযুগীয়, প্রাচীয় রাজতন্ত্রকে (চীন, ভারত, পারস্য ইত্যাদি) "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি"-র আওতাধীন সমাজ হিসেবে চিহ্নিত করা হলো। সত্যিকার অর্থে এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতির আওতাধীন সমাজব্যবস্থার এই সময়ক্রমটি মার্কস কর্তৃক সূত্রায়িত সময়ক্রমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ, মার্কস যখনই "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি"-র কথা বলেছেন, তিনি নির্দেশ করেছেন প্রাক্-প্রাচীন ও প্রাক্-সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থা (দেখুন, ৫৬, পৃ. ৭; ৫৭, পৃ. ৮৬১-৫০৮; ৫৮,পৃ ৮৯)।

সুতরাং ১৯৩১ সাল অবধি "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি"র বিতর্কটি যদিও অসম্পূর্ণ তথাপি ইতিহাস, অর্থনীতি ও দর্শনবিজ্ঞানের বিকাশে তা ছিল অপরিহার্য। কারণ সমসাময়িক সময়েই নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিশেষ সক্রিয়ভাবে গবেষণার বিষয়বস্তু হিসেবে উদ্ভব হচ্ছে: মার্কসের প্রাক্-পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতিতত্ত্বসমূহ; ঐতিহাসিক বিকাশে পাঁচটি সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভূমিকাসংবলিত প্রশ্নাদি; "চিরন্তন সামন্তবাদ"; "প্রাচীন সমাজে পুঁজিবাদ"; বিভিন্ন "চক্রতত্ত্ব" ইত্যাদি।

১৯৩১ সাল অবধি যেসব সোভিয়েত প্রাচ্যবিশারদ "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি" তত্ত্বকে অস্বীকার করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন দুভরোভস্কি ও ইত্তলক (দেখুন ৪৩; ৮)। উভয়েই গবেষণাক্ষেত্রে উৎপাদন পদ্ধতি প্রত্যয়টিকে মালিকানাসম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেছেন এবং বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে চীনের ইতিহাসকে সামনে এনেছেন।

স্ত্রুভে, যিনি ১৯৩০ সালে প্রাচীন প্রাচ্যসমাজকে সামন্ত সমাজ হিসেবে এবং ১৯৩১ সালে একই সমাজকে "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি"-র আওতাধীন সমাজ হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন, তিনিই ১৯৩৩ সালে প্রাচীন মিসরীয় ও সুমেরু সমাজকে উন্নত দাস সমাজ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। উল্লেখ্য, গবেষণায় বিভিন্ন উৎসভিত্তিক বাস্তব তথ্যের ব্যাপক সমাবেশ নিঃসন্দেহে স্ত্রুভের মৌলিক অবদান।

প্রাচীন প্রাচ্যের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের দলিলাদি এবং নৃতত্ত্বগত তথ্যের ভিত্তিতে স্ত্রুভে প্রমাণ করেন যে, প্রাচীন প্রাচ্যসমাজ দাসভিত্তিক সমাজব্যবস্থা। সেখানে যুদ্ধবন্দীরা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন খামারে সারা বছর শ্রমশক্তি সরবরাহ করত এবং বিনিময়ে তাদের সরবরাহ করা হতো উৎপাদনের উপায় ও অস্তিত্বের উপায়। স্ত্রুভে এ ধরনের শ্রমদাতাদের দাস এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অধীনস্থ অর্থনীতিকে উৎপাদন সংগঠনের মূল ধরন হিসেবে আখ্যায়িত করেন (বিস্তারিত দেখুন, ৭৪, পৃ. ৩২-১১১)। স্ত্রুভের গবেষণায় লক্ষণীয় এই যে, প্রমাণসাপেক্ষ বিষয়টি শুরু থেকেই প্রমাণ হয়ে আছে। কারণ, তিনি ধরেই নিচ্ছেন যে সবধরনের নির্ভরশীল সবাধ মানুষই দাস। এটা তিনি ধরে নিতে বাধ্য হচ্ছেন; কারণ, দাস শোষণ হলো সর্বপ্রথম ধরনের শোষণপদ্ধতি।

ইতিমধ্যে ১৯৩৪ সালে স্ত্রুভের সমালোচনা করে মিসুলিন প্রাচীন প্রাচ্যসমাজকে উন্নত দাস সমাজের পরিবর্তে প্রাথমিক পর্যায়ের দাস সমাজ হিসেবে আখ্যায়িত করেন (দেখুন, ৬৪)। পরবর্তী সময়ে, ১৯৩০-এর শেষের দিকে মিসুলিনের সূত্র প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত হয়, এমনকি স্ত্রুভেও সেটা স্বীকার করে নেন।

১৯৩০-৫০ দশকে নিকোলাস্কি, তুমেনিয়েভ ও দিয়াকোনভের গবেষণায় (দেখুন, ৪৪-৪৭; ৩১-৩৩; ৩৬-৪২) প্রমাণিত হয় যে, প্রাচীন প্রাচ্যসমাজের বৈষয়িক উৎপাদনব্যবস্থায় বিশেষত, মূল সেক্টর কৃষিতে দাসশ্রম ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রতিবন্ধক ছিল। উল্লিখিত প্রাচ্যবিশারদেরা প্রমাণ করতে সচেষ্ট হন যে, অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে প্রাচীন প্রাচ্যের রাষ্ট্রকাঠামো যতদূর না দাস শোষণভিত্তিক ততোধিক আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন কৃষকদের শোষণভিত্তিক। উল্লেখ্য, ১৯৪০ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত উপরোক্ত উপসংহারটি প্রাচ্যবিশারদের দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়, এমনকি তা পাঠ্যপুস্তকেও বিশেষ স্থান দখল করতে সক্ষম হয়। প্রাচীনকালের প্রাচ্যসমাজে দাস উৎপাদন পদ্ধতি যে নির্ধারিত উৎপাদন পদ্ধতি ছিল না, এ ব্যাপারে পরবর্তী সময়ের প্রাচ্যগবেষণায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো দ্বিমত লক্ষ করা যায় না (এ মর্মে উৎসাহী পাঠক প্রবন্ধের শেষের "গ্রন্থপঞ্জি"র তালিকায় ১৯৫০ সালের পরে প্রকাশিত উৎসমূলগুলো খুঁটিয়ে দেখতে পারেন)।

সোভিয়েত বিতর্কের দ্বিতীয় পর্ব

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও পরবর্তী সময়ে জাতীয় পুনর্গঠনসম্পর্কিত বিভিন্ন কারণে ১৯৪০ ও ১৯৫০-এর দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নে "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি"র বিতর্ক প্রায় স্থগিত থাকে। পরে, ষাটের দশকে তৃতীয় বিশ্বের আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক স্বাধীনতাপ্রাপ্তি, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিকাশ ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিকাশের সাথে সাথে প্রাচ্যগবেষণাও চাঙ্গা হয়ে ওঠে। সোভিয়েত বিতর্কের প্রথম পর্বে যখন উৎপাদনের উপায়ের ওপর মালিকানাজনিতসম্পর্কটি প্রাধান্য লাভ করে, তখন দ্বিতীয় পর্বে বহুমাত্রিক শোষণসম্পর্কসমূহ অনুসন্ধানের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে বিবেচিত হয়।

প্রাচীন প্রাচ্যসমাজের বহুমাত্রিক শোষণসম্পর্কসমূহ উদ্‌ঘাটনের ভিত্তিতে সোভিয়েত প্রাচ্যবিশারদেরা মোটামুটি তিন ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়েন। ধারাসমূহ হলো– (১) প্রাচীন প্রাচ্য রাষ্ট্রব্যবস্থা দাসভিত্তিক, (২) প্রাচীন প্রাচ্য রাষ্ট্রব্যবস্থা সামন্তবাদী, এবং (৩) প্রাচীন প্রাচ্য রাষ্ট্রব্যবস্থা 'এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি'-ভিত্তিক।

১৯৬০-এর দশকে সোভিয়েত প্রাচ্যবিশারদের অনেকেই, বিশেষত দিয়াকোনভ, ইলিন, করোসতোভসিয়েভ ইতিপূর্বে ১৯২০-৩০-এর দশকে আলোচিত স্ত্রুভের "প্রাচীন প্রাচ্য দাসভিত্তিক সমাজ" তত্ত্বটির বিকাশ সাধন করছেন (বিস্তারিত দেখুন ৩৫; ৩৭-৪০; ৭; ৮; ১৯-২১)। এ মর্মে তারা "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি" তত্ত্ব আলোচনা-সমালোচনা-তর্কবিতর্ক (polemics অর্থে) করছেন এবং বাস্তব তথ্যের সহায়তায় প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন যে, প্রাচীন প্রাচ্যে ভূমির ওপর রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব, রাষ্ট্রীয় ভূমালিকানা ও সার্বভৌমত্ব বিরাজমান ছিল না, জনগণের ওপর আরোপিত রাজস্ব ও কর একই বৈশিষ্ট্যের নয়। তাদের মতে, রাষ্ট্র কর্তৃক গোষ্ঠী-সমাজ-শোষণ শ্রমজীবীর ওপর আরোপিত সাধারণ রাজস্ব এবং যেটি সব শোষণভিত্তিক সমাজেই বিদ্যমান। আলোচিত ধারার গবেষকেরা দাসব্যবস্থাকে বিশেষ দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করেছেন এবং তাদের মতে, প্রাচীন ভারতের কর্মকার সম্প্রদায়, প্রাচীন সমাজের রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় কাজে নিয়োজিত শ্রমজীবী ও নির্ভরশীল গোষ্ঠী, যেমন স্পার্টাকাস-ইলোট– এসব সম্প্রদায়ের ওপর যে শোষণপদ্ধতি চালু ছিল, তার বৈশিষ্ট্য আধা-দাস শোষণ।

১৯৬০-এর দশকের এই ধারার গবেষণার ফলাফল প্রসঙ্গে মন্তব্য করলে বলা উচিত যে–

১. এই ধারার গবেষকেরা "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি"র সমর্থকদের সমালোচনা করার ক্ষেত্রে তাদের দ্বিতীয় স্তরের বৈশিষ্ট্যসমূহ যেমন– কৃত্রিম সেচব্যবস্থা, সেচ প্রকল্প নির্মাণকার্য, স্বৈরতান্ত্রিক চরিত্রের রাষ্ট্র (দেখুন, ২৫, পৃ. ১৫৪-১৫৮) ইত্যাদিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এক্ষেত্রে "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি"র সমর্থকদের প্রাথমিক গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়াদি, যেমন– ভূমির ওপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা, গোষ্ঠী-সমাজের উপস্থিতি ইত্যাদি কাম্য মাত্রায় বিশ্লেষিত হয়নি।

২. সামন্তবাদীয় শোষণ রূপ (ধরন) সমূহকে দাস শোষণপদ্ধতির আওতাভুক্ত করার ফলে যুক্তিযুক্তভাবেই সামন্তবাদের সাথে দাস সমাজব্যবস্থার পার্থক্য উদ্‌ঘাটিত হয়নি। যার উল্টো ফল হলো— অন্য একটি ধারা অভ্যুদয়ের পূর্বশর্ত সৃষ্টি, যে ধারানুযায়ী "সামন্তবাদই একমাত্র প্রাক্-পুঁজিবাদী সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা"।

বস্তুত, ১৯৬০-এর দশকে ও ১৯৭০-এর দশকের প্রথমার্ধে কোবিসানভ, মেদভেদিয়েভ ও অন্যরা উল্লেখ করলেন যে, প্রাচ্যসমাজে নির্ভরশীল জনসংখ্যার বহু স্তরই সামন্ত ও আধা সামন্ততান্ত্রিক শোষণপদ্ধতির দ্বারা শোষিত হচ্ছে (দেখুন, ২৩; ২৮; ৬৫; ৬৬; ৬৭)। তাদের মতে, স্বাধীন গোষ্ঠীসদস্য কর্তৃক প্রদেয় রাজস্ব কর ও "সামাজিক-শ্রম" অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে যথাক্রমে দ্রব্যখাজনা ও শ্রমখাজনার রূপ পরিগ্রহ করে। কোবিসানভ-মেদভেদিয়েভ ধারার সাথে ইলুসেচকিনের বক্তব্যও সারার্থের দিক থেকে প্রায় সমার্থক (দেখুন, ৯-১৩)। তার মতে, আদিম সাম্যবাদী সমাজের পরে একটি মাত্র একীভূত বিরোধমূলক সমাজব্যবস্থা বিরাজ করেছে, যার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো করনির্ভর শোষণপদ্ধতি। প্রধান প্রধান শোষণ রূপসমূহ নির্ধারণের ক্ষেত্রে অন্যরা যখন আইনি দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করেছেন, ইলুসেচকিন সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দিকসমূহের ওপর গুরত্ব প্রদান করেছেন, অর্থাৎ শোষণ রূপসমূহ বিচার করেছেন সরাসরি উৎপাদকদের উৎপাদনের উপায়ের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার চরিত্র ও পদ্ধতির নিরিখে। রাজনৈতিক অর্থনীতির দৃষ্টিতে তিনি প্রাক্-পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতিতে পাঁচটি প্রধান শোষণ রূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন। যেগুলো হলো– দাস; ভূমিদাস ("সার্ফ" ব্যবস্থা); মুচলেকাবদ্ধ কৃষকভিত্তিক ব্যবস্থা (bonded peasant system); প্রাক্-পুঁজিবাদী কৃষক (করভিত্তিক); প্রাক্-পুঁজিবাদী মজুরিশ্রমভিত্তিক উৎপাদনব্যবস্থা (দেখুন ১৪)। উল্লেখ্য, ১৯৬০-এর দশকে আকাদেমিশিয়ান ভার্গা "পুঁজিবাদের রাজনৈতিক-অর্থনীতি" পুস্তকে "এশিয়াটিক

উৎপাদন পদ্ধতি"-র বৈশিষ্ট্যসমূহকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন। প্রথম শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো: আদিম প্রাচ্য কৃষিতে বৃহদায়তন কৃত্রিম সেচব্যবস্থার নির্ধারক ভূমিকা; সেচ প্রকল্প নির্মাণ ও তদারকি– রাষ্ট্রীয় অন্যতম দায়িত্ব (function); ভূমির ওপর ব্যক্তিমালিকানার পরিবর্তে একচেটিয়া রাষ্ট্রীয় মালিকানা। দ্বিতীয় শ্রেণির দ্বিতীয় স্তরের গুরত্বসম্পন্ন বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো: সমাজে প্রধান শোষিত শ্রেণি হলো গোষ্ঠীসমাজের কৃষক; রাষ্ট্রীয় সংগঠনের প্রকৃতি হলো বংশপরম্পরা স্বৈরতান্ত্রিক রাজতন্ত্র (দেখুন, ৫০, শেষ অধ্যায়)।

ইদানীংকালে বেশ কিছু সোভিয়েত প্রাচ্যবিশারদ মনে করেন যে, আদিম প্রাচ্য ও প্রাক্-উপনিবেশিক আফ্রিকায় "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি" বহাল ছিল। অবশ্য এক্ষেত্রে বিভিন্ন গবেষক "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি" ধারণাটি ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। যেমন– আন্দ্রেয়িয়েভ, গারুসিয়ান্স, কিসিবেকভ, ইসরাইটেল প্রমুখ মনে করেন যে, শুধু শ্রেণিহীন থেকে শ্রেণিসমাজে আগমনকালীন অন্তবর্তী সমাজেই "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি"-র অস্তিত্ব উদ্ঘাটন করা সম্ভব (দেখুন, ১-৩; ৩০; ২৬; ৫)। এ বক্তব্যের পক্ষে উল্লিখিত গবেষকেরা অন্তর্বর্তীকালীন সমাজে বিদ্যমান নিম্নলিখিত লক্ষণসমূহ উদ্ঘাটন করেছেন: আদিম সাম্যবাদী ও বিরোধমূলক সমাজের (antagonistic society) উপাদানসমূহের অসঙ্গতিপূর্ণ সহাবস্থান, বিভিন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনসমূহের দীর্ঘকালীন সহাবস্থান ইত্যাদি। "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি" যে অন্তর্বর্তীকালীন উৎপাদন পদ্ধতি, তা প্রমাণের জন্য যে যুক্তি প্রদর্শিত হয়েছে সেটি এ রকম: একাধারে আদিম প্রাচ্যসমাজে আদিম সাম্যবাদী সমাজের "জন্মদাগ" বিরাজ করছে, সেখানে গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজ বিরাজমান অর্থাৎ সেখানে সমগ্র শ্রমকাঠামোতে যৌথশ্রম প্রধান ভূমিকা পালন করছে; পণ্যোৎপাদন নিম্ন মাত্রায় বিদ্যমান; কর রাজস্ব ও "সামাজিক শ্রম"জনিত সম্পর্কের উপস্থিতির কারণে শ্রেণিদ্বন্দ্ব প্রকট হয়নি; অন্যদিকে, প্যাট্রিআরখাল বা পিতৃতান্ত্রিক সম্পর্কসমূহের উপস্থিতি বিদ্যমান। তদুপরি শোষণহীনতা, শ্রেণিহীনতা ও রাষ্ট্রহীনতার কারণে প্রাচ্যসমাজের বৈশিষ্ট্য উদ্ঘাটনের ক্ষেত্রে আদিম সাম্যবাদী ও শ্রেণিবিরোধভিত্তিক সমাজের পার্থক্য লক্ষণীয়। আন্দ্রেয়িয়েভ-গারুসিয়ান্স ও অন্যদের মতে, উপরোল্লিখিত সমস্যাবলী "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি"-র দ্বিমুখী বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে এবং সে কারণেই "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি"কে আদিম সাম্যবাদী অথবা বিকশিত শ্রেণিসমাজ হিসেবে চিহ্নিত করা সঠিক নয়।

এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতির উপস্থিতি নিয়ে আন্দ্রেয়িয়েভ-গারুসিয়ান্স-কিসিবেকভ-ইসরাইটেল যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, অন্যরা আবার এ প্রসঙ্গে ভিন্নতর যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। যেমন সিমিওনোভ, ভাসিলিয়েভ, স্তুচেভস্কি, মিলিকস্‌ভলি, কোরানাস্‌ভলি এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতিকে দেখেছেন "সামন্তবাদ-দাসব্যবস্থার" মিশ্র রূপ হিসেবে (দেখুন, ৬৯-৭২; ৫৪-৫৫; ৭৩; ৬১-৬৩; ২৮-২৯)। এই ধারার প্রবক্তারা আদিম প্রাচ্যসমাজে দাস শোষণের প্রতিবন্ধকতা ও সীমাবদ্ধতা লক্ষ করে রাষ্ট্রীয় মালিকানা, কর রাজস্ব এবং অন্যান্য আধাসামন্তবাদী শোষণপদ্ধতির সহায়তায় আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন কৃষকসমাজের শোষণ ইত্যাদিকে সমাজবিকাশে নির্ধারক প্রক্রিয়া হিসেবে যুক্তি প্রদর্শন করেন (বিস্তারিত দেখুন, ৬৩)। এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতিকে "সামন্তবাদ-দাসব্যবস্থার মিশ্রণ" হিসেবে দেখার ক্ষেত্রে উল্লিখিত গবেষকেরা সমাজবিকাশে রাজনৈতিক উপাদানসমূহকে অতিরিক্ত মাত্রায় গুরুত্ব প্রদর্শন করেন।[৪৩] তাদের মতে, এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি হলো "একীভূত প্রাক্-পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আওতাধীন বিভিন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনসমূহের সহাবস্থানজনিত রূপ" (দেখুন, ৫৪, পৃ. ৯)।

সোভিয়েত প্রাচ্যবিশারদদের যে ধারাটি বর্তমানে "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি"-র অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাদের সবাই মার্কস-এঙ্গেলসকে উদ্ধৃত করেই সচরাচর একটি যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর ৫০-৭০ দশকে মার্কস ও এঙ্গেলস উভয়ই "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি"-কে ঐতিহাসিক বিকাশের সুনির্দিষ্ট স্তর হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, এবং লেনিন সেটা অস্বীকার করেননি। এ ধরনের যুক্তিকে "উদ্ধৃতি অন্ধত্ব" হিসেবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। কারণ– প্রথমত, মার্কসের যেসব রচনাবলী উদ্ধৃতি দেওয়া হচ্ছে তার অধিকাংশই ১৮৫৭ সালের আগে রচিত। পরবর্তী সময়ের ২৬ বছরের রচনাবলী উদ্ধৃত হচ্ছে না কেন? দ্বিতীয়ত,

[৪৩] সমাজ বিকাশে রাজনৈতিক উপাদানসমূহের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তবে সেটা মাত্রাতিরিক্ত নয় এবং স্থায়ীভাবে প্রধান গুরুত্বপূর্ণ নয়। এ মর্মে ব্লক ও স্মীথি সমীপে এঙ্গেলসের চিঠির বিষয়বস্তু উল্লেখ করা যেতে পারে যে, "ইতিহাসের বস্তুবাদি ধারণা অনুসারে বাস্তব জীবনের উপাদান ও পুনরুৎপাদনই হচ্ছে ইতিহাসে 'শেষ পর্যন্ত' নির্ধারক বস্তু। অর্থনৈতিক পরিস্থিতি হলো ভিত্তি এবং উপরিকাঠামো...এদের সকলের একটি পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া রয়েছে, যেখানে অসংখ্য আকস্মিকতার মধ্যে অর্থনৈতিক আন্দোলন শেষপর্যন্ত আবশ্যিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে" এবং "অর্থনৈতিক বিকাশের উপর রাষ্ট্রশক্তির প্রতিক্রিয়া তিন প্রকারের হতে পারে। রাষ্ট্রশক্তি একই অভিমুখে যেতে পারে... অথবা অর্থনৈতিক বিকাশধারার বিপরীত দিকে যেতে পারে... অথবা অর্থনৈতিক বিকাশের কয়েকটি পথ বন্ধ করে অন্য কয়েকটি পথে ঠেলে দিতে পারে" (দেখুন যথাক্রমে, ই ব্লক সমীপে এঙ্গেলসের চিঠি, লন্ডন ২১-২২ সেপ্টেম্বর, ১৮৯০ এবং ক. স্মিথ সমীপে এঙ্গেলসের চিঠি, লন্ডন ২৭ অক্টোবর, ১৮৯০)।

লেনিন কখনো "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি" নিয়ে বিশেষ অনুসন্ধানকার্য চালাননি। "জনগণের বন্ধু কারা এবং কীভাবে তারা সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের বিরুদ্ধে লড়েন" এবং "কার্ল মার্কস"– উভয় প্রবন্ধেই লেনিন "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি" ধারণাটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে মার্কসকে উদ্ধৃত করেছেন মাত্র (দেখুন, ৬৮, খণ্ড ১, পৃ. ১৩৬; খণ্ড ২৬, পৃ. ৫৭)। তৃতীয়ত, রাশিয়ান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট পার্টির চতুর্থ কংগ্রেসে প্লেখানভ ও একমেলরড প্রদত্ত সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের কৃষি প্রোগ্রামের সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি" প্রত্যয়টি অস্বীকার করেছেন। উল্লেখ্য, মার্কস-এঙ্গেলস তাঁদের শেষ জীবনে, ঊনবিংশ শতাব্দীর ৭০-৯০-এর দশকে "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি" ধারণাটি পরিহার করেছিলেন কি না, সেটি ইদানীংকালের সোভিয়েত প্রাচ্যবিশারদদের বিতর্কের অন্যতম বিষয়বস্তু। যেসব সোভিয়েত সমাজবিজ্ঞানী "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি"কে ঐতিহাসিক বিকাশের কোনো পর্বেই নির্ধারক উৎপাদন পদ্ধতি হিসেবে দেখতে নারাজ, এ ব্যাপারে তাদের প্রধান যুক্তি হলো– ঐতিহাসিক বিকাশে আদিম, দাস, সামন্ত, পুঁজি ও সাম্যবাদী– এই পাঁচটির যেকোনো একটি উৎপাদন পদ্ধতি নির্ধারক হতে পারে, যেখানে "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি"র স্থান নেই।

উপসংহার

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রাচ্যবিশারদদের মধ্যে "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি"র বিতর্কটি সুরাহা হয়নি। বহু বিতর্কিত প্রশ্নের এখনো সুরাহা হয়নি এবং আদিম প্রাচ্যসমাজসংক্রান্ত নতুন নতুন তথ্যাবলী উদ্‌ঘাটনের সাথে সাথে একেকটি পুরোনো সমস্যা সমাধান হচ্ছে, আবার সেইসাথে জন্ম নিচ্ছে নতুন সমস্যা। এতদসত্ত্বেও এ বিতর্কের ফলেই এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা এবং এমনকি ইউরোপের ঐতিহাসিক বিকাশসংক্রান্ত বহু বাস্তব তথ্যের তাত্ত্বিক সাধারণীকরণ সামাজিক বিজ্ঞানের বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছে। "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি" বিতর্কটি বর্তমানে এমন একটি স্তরে উপনীত, যখন প্রাক্-পুঁজিবাদী সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার স্বরূপ নির্ধারণের ক্ষেত্রে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে অনেক প্রয়োজনীয় এবং স্বল্পবিশ্লেষিত প্রশ্নসমূহ গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে, যার মধ্যে আছে: খুদে উৎপাদকদের দীর্ঘস্থায়ীত্বের কারণ; কর ও রাজস্বভিত্তিক সম্পর্কের বিকাশ; বলপূর্বক আদায়কৃত করব্যবস্থার ক্রমবিকাশ; আদিকালীন শ্রেণিসমাজে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভূমিকা; উৎপাদনপ্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রের অংশগ্রহণের বৈশিষ্ট্য; শোষণের আদি রূপ ইত্যাদি। অধুনা প্রাচ্যগবেষকেরা "সনাতন কাঠামো/গঠন" (Traditional Structure)-সংক্রান্ত সেইসব বিষয়ের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন, যেগুলো অতীতে

যান্ত্রিকভাবে ইউরোপীয় সামন্তবাদের সাথে গুলিয়ে ফেলা হতো। গবেষিত হচ্ছে সামাজিক অর্থনৈতিক গঠনসমূহের (Socio-economic structure) বৈবর্তনিক ইতিহাস ও তাদের আন্তসম্পর্ক; গোষ্ঠী ও উপজাতীয় সমাজের ভবিষ্যৎ ইত্যাদি। আর "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি"কেন্দ্রিক গবেষণা নিঃসন্দেহে একাধারে যেমনি অধনতান্ত্রিক পথে বিকাশের মার্কসীয় তত্ত্বকে সমৃদ্ধ করেছে– অন্যদিকে ঐতিহাসিক বিকাশের কোনো স্তরে কোথাও "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি"র অস্তিত্ব ছিল কি না সে প্রশ্নেও ধনাত্মক অথবা ঋণাত্মক বিশ্লেষণাত্মক উত্তর দিতে সহায়তা করেছে।

প্রবন্ধে ব্যবহৃত পুস্তক ও রচনাবলী (মূল রুশ ভাষায়)

১. আন্দ্রেয়িয়েভ, ই. ল., "পৃথিবীর ইতিহাসের পদ্ধতিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ", *দর্শন পত্রিকা*, ১৯৭১, সংখ্যা ১০। (Andreev, E. L,, *"Methodologicheski analiz problem ceomirnoi istori", Voprosi Filosofy).*

২. আন্দ্রেয়িয়েভ, ই. ল., "আদিম সাম্যবাদী সমাজ থেকে শ্রেণিসমাজে উত্তরণের যুগে সামাজিক সম্পর্কসমূহের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে", *সোভিয়েত নৃতত্ত্ববিদ্যা পত্রিকা*, ১৯৭১, সংখ্যা ২। ("O charactere socialnikh subiazai v epokhu perekhoda ot perbobithnovo stroia khe klassobomu obsectbhu", *Sovietskaia Ethnographia)*

৩ আন্দ্রেয়িয়েভ, ই. ল., "আদিম সাম্যবাদী সমাজ থেকে শ্রেণিসমাজে উত্তরণের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত ও বৈবর্তনিক বিশ্লেষণ", *দর্শন পত্রিকা*, ১৯৭২, সংখ্যা ৪। ("Sisteriale-genetichiski analiz e problema smeni formasii. Na materiale perekhoda ot perbobitnoi formasii khe klassobomu obsectbhui", *Voprosi Filosofy).*

৪. ইত্তলক, ই. সি., "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি প্রসঙ্গে", *মার্কসবাদের পতাকা* (পত্রিকা) মস্কো, ১৯৩১, সংখ্যা ৩। (Eolk, IS., "Khe voprosu ob aziatskom sposove prizevodstva", *Plamennia iznamia Marxism).*

৫. ইজরাইটেল, ভ. ইয়া., 'সামাজিক বিকাশের কাঠামো বিশ্লেষণ'; গোর্কি, ১৯৭৫। (Ezraitel. V. Ya, "Problemi formasionnova analiza obsectvennova razvitia").

৬. ইফিমভ, এ. ভ., "অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও প্রাচ্য সমাজকাঠামো প্রসঙ্গে মার্কস-এঙ্গেলসের ধারণা", *ঐতিহাসিক-মার্কসবাদী*, ১৯৩০, সংখ্যা ১৬। (Ifimov, A.V., "Konsepsia ekonomichiskoi formasi Marxa-e-Engelsa e ekh vizgliadi na struktur Vostochnikh obsestv", *Istorik Marxist).*

৭. ইলিন, গ. ফ., "প্রাচীন ভারতীয় দাস সমাজের মূল সমস্যা", *প্রাচীনকালের ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, মস্কো, ১৯৬৩। (Elin, G. F., "Asnovnie Problemi Rabstvo v Drevnoi Endi", *Vestnik Drevnoi Istori).*

৮. ইলিন, গ. ফ., 'প্রাচীন প্রাচ্য ও দাস সমাজ', "এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণ" (পত্রিকা), ১৯৭৩, সংখ্যা ৪। ("Rabstvo e drevni vostok", *Narodi Azi-e-Afriki*).

৯. ইলুসেচকিন্, ভ. প., "অর্থনৈতিক বলপ্রয়োগের পদ্ধতি ও সামাজিক বিবর্তনের দ্বিতীয় প্রধান পর্বের সমস্যা প্রসঙ্গে", মস্কো, ১৯৭০। (Elusechkin V. P, "Sistema vineekonomicheskie prenuzdenia e problema fiteroi osnovnoi stadi ovsestvennoi evolusii").

১০. ইলুসেচকিন্, ভ. প., "প্রাচীনকালীন প্রাক্-বুর্জোয়া সমাজে করপদ্ধতির মাধ্যমে শোষণ", মস্কো, ১৯৭১। ("Rentni sposob expluatasi v doburgoagnikh obsestvakh drevnosti", *Crednebekovia E Novova bremeni'*).

১১. ইলুসেচকিন্, ভ. প., "ভাগচাষ পদ্ধতি– প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় চীনে শোষণের প্রধান রূপ", তৃতীয় সম্মেলন, "চীনের সমাজ ও রাষ্ট্র", মস্কো, ১৯৭২। ("Arenda-egdolsina osnovnaia forma expluatasi v drevnem e crednevekobom Ketai, 'Treatayia Naychnaiya Konferensia", "*Obsectvo E Gosudarstvo Ketai*", Moskva, 1972).

১২. ইলুসেচকিন্, ভ. প., 'মধ্যযুগীয় চীনে অ-স্বাধীন শ্রমশক্তির উৎপাদনের উপায়ের সাথে সম্মিলনের পদ্ধতি', চতুর্থ সম্মেলন, "চীনের সমাজ ও রাষ্ট্র", প্রথম খণ্ড, মস্কো, ১৯৭৩। ("Sposovi soediniania nesbovodnikh rabotnikov so sredstvami prizevodstva vi. srednevekobom Ketai', "Chetviortaiya Naychnaiya Konferensia" "*Obsectvo e gosufarstvo Ketaia*", Moskva, 1973).

১৩. ইলুসেচকিন্, ভ. প., 'প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় চীনের সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোর চরিত্র প্রসঙ্গে', "চীনের সমাজ ও রাষ্ট্র", মস্কো, ১৯৭৬। ("Khe Voprosu a formasionnoi kharakteristike drevnovo e siridnobekobova "obsestvo Ketaia", 1976).

১৪. ইলুসেচকিন্, ভ. প., "চীনের ইতিহাসের আলোকে সামাজিক বিকাশের দ্বিতীয় প্রধান স্তর প্রসঙ্গে", "চীন সমাজ ও রাষ্ট্র" (সম্পাদনায় সুখারচুক গ. দ.), মস্কো, ১৯৭৩। ("Problema vetoroi osnovnoi stadi razbita obsectva vi suvete istori Ketaia", "Kitaia-obsectva e Gosudarastvo"; Sukharchuk. G. D. edited).

১৫. ইলুসেচকিন্, ভ. প., 'এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি বিতর্ক প্রসঙ্গে', মস্কো-লেনিনগ্রাদ, ১৯৩১। ("Diskussia ob aziatskom sposove prizevodstva").

১৬. ইলুসেচকিন্, ভ. প., 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মসূচি ও গঠনতন্ত্র', মস্কো, ১৯৩০। ("Programnna e ustav kommunistichiskova enternasionala").

১৭. কভালিয়েভ, এম. ই., 'পুরাকালীন উৎপাদন পদ্ধতি প্রসঙ্গে মার্কস ও এঙ্গেলসের মতবাদ', "শিল্প-সংস্কৃতির ইতিহাস", রাষ্ট্রীয় একাডেমী পত্রিকা, খণ্ড ১২, সংখ্যা ৯-২০, মস্কো-লেনিনগ্রাদ, ১৯৩২। (Kovaliev, S. E, "Uchenia Marksa-e-Engelsa ob antichnom sposove prizevodstva", *Ezvestia Gosudarstvennoi Akademi Estori Materialnoi Kulturi*).

১৮. কান্তারোভিচ, এ. ইয়া., "প্রাক্-পুঁজিবাদী যুগের চীনে সামাজিক সম্পর্কের গঠনপদ্ধতি", *নতুন প্রাচ্য* (পত্রিকা), সংখ্যা ১৫, ১৯২৬। (Kantarovitch, A. Y, "Sistema ovsestvennikh otnosenii Ketaia dokapitalistichiskoi epokhi", *Novi Vostok*).

১৯. কারাসতোভসিয়েভ, ম. আ., "প্রাচীন প্রাচ্যসমাজের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে", *এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণ* (পত্রিকা), ১৯৬৬, সংখ্যা। (Karastovsiev, M. A., "O Kharactere drevnevostochnova ovsestva", *Narodi Azi-e-Afriki*).

২০. কারাসতোভসিয়েভ, ম. আ, "প্রাচীন প্রাচ্যসমাজ" ধারণা প্রসঙ্গে", *পুরাকালীন ইতিহাস পত্রিকা*, ১৯৭০ সংখ্যা ১। ("O poniatti drevni vostok", *Vestnik Drevnoi Istori*).

২১. কারাসতোভসিয়েভ, ম. আ, "শ্রেণিবিভক্ত সমাজের উৎপত্তি– তাত্ত্বিক দিক", *এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণ* (পত্রিকা), ১৯৭১, সংখ্যা ৪। ("Nekotorie theoretichiskie aspekti stanovlenia klassobova ovsestva", *Narodi Azi-e-Afriki*).

২২. কারাসতোভসিয়েভ, ম. আ, 'প্রাথমিক পর্যায়ের শ্রেণিবিভক্ত সমাজ গবেষণায় "সিস্টেম অ্যানালিসিস" পদ্ধতি প্রয়োগের অভিজ্ঞতা থেকে", *এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণ* (পত্রিকা), ১৯৭৩, সংখ্যা ৬। ("Opit Oriminienia sistemnova analiza vi essledobanii ranneklassovikh ovestv", *Narodi Azi-e-Afriki*).

২৩. কাবিসানভ, এউ. এম., "আকসুম", মস্কো, ১৯৬৬। (Kabisanov A. U. M, 'Aksum').

২৪. কাবিসানভ, এউ. এম., "গ্রীষ্মপ্রধান আফ্রিকার "মনুষ্যসমাজ" প্রাথমিক পর্বের সামন্তসমাজে উদ্বৃত্ত দ্রব্য বিচ্ছিন্নকরণের ধারণা প্রসঙ্গে, *এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণ*, মস্কো ১৯৭২, সংখ্যা ৪। ("Podludie" vi Tropiachiskoi Afriki: Khe Voprosy o formakh Otchujenia pribavochnova produkta vi Rannefiodallnikh Ovsetvakh", *Narodi Azi-I-Afriki*).

২৫. কিম, গ. ফ (সম্পাদক), 'প্রাচ্যের দেশসমূহের প্রাক্-পুঁজিবাদী সমাজকাঠামোর সমস্যা প্রসঙ্গে', মস্কো, ১৯৭১, (Kim, G. F. edited, "Problemi dokapitalistichiskikh ovsestv vi stranakh vostoka").

২৬. কিসিবেকভ, দ. ক., 'উত্তরণকালীন সামাজিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে', আলমা আতা, ১৯৭৩। (Kisibekov, D. K. "Perekhodnie Ovsestvenniea Otnosenia", Alma Ata).

২৭. কোকিন, এম. ডি এবং পাপাইয়ান. জি. কে., "জিন-তিয়ান": প্রাচীন চীনের কৃষিকাঠামো' (মুখবন্ধ: মাদিয়ার এল) মস্কো, ১৯৩০। (Kokin, M. D and Papaian. G. K.; "Zin-tian": Agrarni stroi drevnevo Ketaia; Predislovia: Madiar, L).

২৮. কোরোনাস্‌ভলি, গ. ভ., "প্রাচীন প্রাচ্যে দাস সমাজবিকাশে সীমাবদ্ধতার কারণ প্রসঙ্গে", *ইতিহাস পত্রিকা*, ১৯৬৯, সংখ্যা ৯। (Koranasbili, G. V; "O Prichinakh nerazvitosti rabstva na Drevnim Vostoke", *Voprosi Istori*).

২৯. কোরোনাস্‌ভলি, গ. ভ., 'প্রাচীন প্রাচ্য ও প্রাচীন পৃথিবী', "প্রাচীন সমাজের ইতিহাস পত্রিকা", তিফিলিসি, ১৯৭৩, খণ্ড ৪। ("Drevni Vostok-i-Antichni Mir", *Voprosi Drevnei Istori*).

৩০. গারুসিআনস্. ইউ. এম., "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি", *ইতিহাস পত্রিকা*, ১৯৭৬, সংখ্যা ২। (Gaarusians U. M., "Ob aziatskom sposobe prizevodstva", *Voprosi Istori*).

৩১. চুমিয়েনেভ, এ. ই, "প্রাচীন ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের অলৌকিক 'কাহিনীতে মানুষ", *প্রাচীন সমাজের ইতিহাস পত্রিকা*, ১৯৪৮, সংখ্যা ৪। (Chumienev, A. E, "O prednagnachenil ludiei po mifam drevnevo dburechiea", *Vestnik Drevnei Istori*).

৩২. চুমিয়েনেভ, এ. ই., 'প্রাচীন সুমেরীয় সমাজের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি', মস্কো, ১৯৫৬। ("Gosudarstbennoi Khoziastbo drevnevo Symera").

৩৩. চুমিয়েনেভ, এ. ই., প্রাচীনকাল ও পশ্চাদ-প্রাচ্য: সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশ-বৈশিষ্ট্য', *ইতিহাস পত্রিকা*, ১৯৫৭, সংখ্যা ৬। ("Peredni Vostok-e-Antichnost: Osobinnost Socialno-ekonomichiskova razvitia", *Vestnik Istori*).

৩৪. চুমিয়েনেভ, এ. ই., "প্রাচীনকাল ও পশ্চাদ-প্রাচ্যঃ নদীমাতৃক দেশ (ভূমধ্যসাগর ও মিশর) হেলেনীয় ও রোমান যুগ," *ইতিহাস পত্রিকা*, ১৯৫৭, সংখ্যা ৯। ("Peredni Vostok-e-Antichnost: Strani rechnikh kultur (dburechia e Egipet) vi allinistichtiskyuo-e-remskyno epokhi." *Vestnik Istori*).

৩৫. দিয়াকোনভ, ই. এম., "পুরাকালীন প্রাচ্যসমাজের গোষ্ঠীসমস্যা প্রসঙ্গে", *পুরাকালীন ইতিহাস পত্রিকা*, মস্কো ১৯৬৪, সংখ্যা ৪। ('Diakonov, E. M., "Khe probleme obshini na drevnem vostoke", *Vestnik Drevnoi Istori*).

৩৬. দিয়াকোনভ, ই. এম., 'প্রাচীন ভূমধ্যসাগরীয় সমাজ ও রাষ্ট্রের কাঠামো', মস্কো, ১৯৫৯। ("Obsestbenni-e-Gosudarstbenni Stroi Drevneva Duburechia").

৩৭. দিয়াকোনভ, ই. এম., "সোভিয়েত গবেষকদের দৃষ্টিতে প্রাচীন প্রাচ্যসমাজের গোষ্ঠী", *পুরাকালীন ইতিহাস পত্রিকা*, মস্কো, ১৯৬৩, সংখ্যা ১। ("Obsena na Drevnem Vostoke Vi rabotakh Sovietskikh essledovatelev", *Vestnik Drevnoi Istori*).

৩৮. দিয়াকোনভ, ই. এম., "প্রাচীন পশ্চিম এশিয়া রাজতন্ত্রীয় অর্থনীতির মূল বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে", *এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণ* , মস্কো ১৯৬৬, সংখ্যা ১। ("Osnovnie cherti ekonomiku b monarchiakh drevnoi zapadnoi Azi", *Narodi Azi-e-Afriki*).

৩৯. দিয়াকোনভ, ই. এম., "মালিকানা সমস্যাঃ খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দ পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যের সামাজিক কাঠামো প্রসঙ্গে", *পুরাকালীন ইতিহাস পত্রিকা*, ১৯৬৭, সংখ্যা ৪। ("Problemi Sobstbennosti: O strukture obsestva blizniva vostoka do siridini II tie N. E" *Vestnik Drevnoi Istori*).

৪০. দিয়াকোনভ, ই. এম., "অর্থনৈতিক সমস্যা খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দ পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যের সামাজিক কাঠামো প্রসঙ্গে", *পুরাকালীন ইতিহাস পত্রিকা*, ১৯৬৮, সংখ্যা ৩৪। ("Problemi ekonomiki: O strukture obsestva blizniva vostoka do siridini II tic. do N. E", *Vestnik Drevnoi Istori*).

৪১ দিয়াকোনভ, ই. এম., "প্রাচীন সমাজে দাস, ইলিয়ট ও ভূমিদাস", *পুরাকালীন ইতিহাস পত্রিকা*, ১৯৭৩, সংখ্যা ৪। ("Rabi, eloti-Krepostnia vi rannei drevnosti," *Vestnik Drevnoi Istori*).

৪২. দিয়াকোনভ, ই. এম., "অ্যাসিরীয় সমাজে নৃতাত্ত্বিক গ্রুপ ও সামাজিক বিভক্তি", *সোভিয়েত প্রাচ্যগবেষণা পত্রিকা*, ১৯৫৮, সংখ্যা ৬। ("Etnos e sosialnoia deleania vi Asiri", *Sovietskoye Vostkovidienie*).

৪৩. দুবরোভস্কি, এস. এম., "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি: সামন্তবাদ, ভূমিদাস-ব্যবস্থা ও বাণিজ্য পুঁজি প্রসঙ্গে", মস্কো, ১৯২৯। (Dubrosvki, S. M, "Khe voprosu o susnosti aziatskova sposova prizevodstva: Feodalisma, Krepostnichestva e Torgobova Kapitala").

৪৪. নিকোলস্কি, এন. এম. "ইতিহাস। প্রাচীন প্রাচ্যের প্রাক্-শ্রেণিবিভক্ত সমাজ", *প্রাচীন জনতা জর্নাল*। মস্কো, ১৯৩৩। (Nikolski, N. M, "Istoria: Doklassovi ovsestva, drevni vostok", *Antochni Mir*).

৪৫. নিকোলস্কি, এন. এম., "প্রাচীন ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল ও দাসব্যবস্থা," *পুরাকালীন ইতিহাস পত্রিকা*, ১৯৩৮, সংখ্যা ৪। ("Rabstva vi drevniem duburechia", *Vestnik Drevnoi Istori*).

৪৬. নিকোলস্কি, এন. এম., "প্রাচীন ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল কররাজস্বসংক্রান্ত প্রশ্নাবলী", *পুরাকালীন ইতিহাস পত্রিকা*, ১৯৩৯, সংখ্যা ২। ("Khe voprosy o rente-naloge vi drevniem duburechia", *Vestnik Drevnei Istori*).

৪৭. নিকোলস্কি, এন. এম., "প্রাচীন ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল ও দাসব্যবস্থা", *পুরাকালীন ইতিহাস পত্রিকা*, ১৯৪১, সংখ্যা ১। ('Rabstva vi drevniem duburechia', *Vestnik Drevnoi Istori*).

৪৮. ফক্স, আর., এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি ও তার উৎস প্রসঙ্গে মার্কস ও এঙ্গেলস', *লিতোপিসি মারসিজমা*, পুস্তক III (XI), মস্কো, ১৯৩০। (Fox, R., "Vizgliadi Marxa e Engelsa na Aziatskom sposove prizevodstva e ekh estochniki", *Litopisi Marxisma).*

৪৯. বলোটনিকভ, আ. আ (সম্পাদিত), এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি প্রসঙ্গে, তিফিলিসি, ১৯৩০। (Bolotnikov, A. A, ed., "Ob Aziatskom Sposove Prizevodstva").

৫০. ভার্গা ই. সি., "চীনা বিপ্লবের প্রধান সমস্যাসমূহ", *বলশেভিক*, ১৯২৮, সংখ্যা ৪। (Varga, E. S., "Osnovniea Problemi Ketaiskoi Revoliusi", *Bolshevik*).

৫১. ভার্গা ই. সি., 'এল. মাদিয়ারের "চীনের অর্থনীতি প্রবন্ধ সংকলন" পুস্তকের ভূমিকা: "চীনা বিপ্লবের ভবিষ্যৎ", মস্কো, ১৯৩০। (Ocherki po ekonomike Ketaia. Videnie b Khinige L. Madiara, *"Perspektivi Ketaiskoi Revoliusi").*

৫২. ভার্গা ই. সি., "চীনা বিপ্লবের অর্থনৈতিক সমস্যা", *প্লানোভোই খোজিয়েস্তভা*, ১৯২৫, সংখ্যা ১২। ("Ekonomichiskie problemi revoliusi vi Ketai", *Planovoi Khoziastva*).

৫৩. ভার্গা, ই. সি., "পুঁজিবাদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমস্যা প্রসঙ্গে", মস্কো, ১৯৬৪, (পুস্তকের শেষ অধ্যায় "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি" প্রসঙ্গে)। ("Ocherki po problemam politichiskoi-ekonomii kapitalisma", Poslednia Galava, *Aziatski Sposov prizevodstva).*

৫৪. ভাসিলিয়েভ, এল. এস., 'চীনা রাষ্ট্রের উদ্ভব ও বিকাশ', "চীন–ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ইতিহাসবিজ্ঞান" (সম্পাদনা মুনকুয়েভ. এম); ১৯৭৭, পৃ. ৯। (Vasiliev, L. S., "Vozniknovenie e fromirovania Ketaiskova Gosudarstva. *Ketai: Istoria, Kultura i Ístoriografia"; Munkuev. M. ed).*

৫৫. ভাসিলিয়েভ, এল. এস এবং স্তুনেভস্কি. ই. আ., "প্রাক্-পুঁজিবাদী সমাজের উদ্ভব ও বিবর্তনের তিনটি মডেল" (এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি সমস্যা), *ইতিহাস পত্রিকা*, ১৯৬৬, সংখ্যা ৬। (Vasiliev, L. S., Stuchevski. E. A, "Tre modeli vozniknovenia e evolusii dokapitalistichiskikh Ovsestva. (Khe Probleme Aziatskova Sposova Prizevodstva", *Voprosi Istori).*

৫৬. মার্কস, কার্ল, রাজনৈতিক-অর্থনীতির সমালোচনা প্রসঙ্গে– মুখবন্ধ, রচনাসমগ্র, খণ্ড ১৩। (Marx, Karl, "Predislovia Khe Kritike Polotichiskoi Ekonomki").

৫৭. মার্কস-এঙ্গেলস, প্রাক্-পুঁজিবাদী উৎপাদন গঠন প্রসঙ্গে, রচনাসমগ্র, খণ্ড ৪৬, প্রথম অংশ। ("Formakh Pridsestvuisikh Kapitalistichiskome Prizevodstve").

৫৮. মার্কস, কার্ল, 'পুঁজি', রচনাসমগ্র, খণ্ড ২৩, পৃষ্ঠা ৮৯ (Kapital)।

৫৯. মাদিয়ার, এল. ই, ইফিমভ, আই, বেরিন, টি, কোকন, এম পাপাইয়ান, গ ফক্স, আর স্তুসের, এবং এম গডেস, ঐতিহাসিক মার্কসবাদী, খণ্ড ১৬, মস্কো ১৯৩০। (Madiar, L. E, Efimov, A., Berin, T., Kokin, M, Papaian, G, Fox, R., Stusser, A Godes, M, *Istorik Marxist*).

৬০. মাদিয়ার, এল. ই., "ইতিহাসবিজ্ঞানে যান্ত্রী কতাবাদী ঝোঁকের বিরুদ্ধে", মস্কো-লেনিনগ্রাদ, ১৯৩০। (Madiar, L. E., "Protiv mekhanistichiskikh tendensi vi Istorichiskoi Nauke").

৬১. মিয়োলিকিস্ভলি, গ. ক., "প্রাচীনতম শ্রেণিসমাজের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে", *ইতিহাস পত্রিকা*, ১৯৬৬, সংখ্যা ১। (Milekisvili, G. K., "Khe voprosu o kharaktere drevneisikh kalssobikh ovsesvt", *Voprosi Istori*).

৬২. মিয়োলিকিস্ভলি, গ. ক., "প্রাচীন প্রাচ্যের সামাজিক অর্থনৈতিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে" (শ্রেণিসমাজের সামাজিক শ্রেণিবদ্ধকরণের অভিজ্ঞতা); *এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণ*, ১৯৭২, সংখ্যা ৪। ("Kharacter Sosialno-ekonomichiskova stroia na Drevnem Vostoke: Opit sosialno-tipologichiskoi klassifikasi klassovikh obsestv", *Narodi Azi-i-Afriki*).

৬৩. মিয়োলিকিস্ভলি, গ. ক., "প্রাচীন মধ্যপ্রাচীয় সমাজের সামাজিক অর্থনৈতিক কাঠামোর কিছু দিক", *প্রাচীন সমাজের ইতিহাস পত্রিকা*, ১৯৭৫ সংখ্যা ২। ("Nekotoria aspekti voprosa o sosialno-ekonomichiskova storia drevnikh blznivostochnikh obsestv", *Vestnik Drevnei Istori*).

৬৪. মিশুলিন, এ. ভ., "প্রাচ্যীয় দাস-সমাজ প্রসঙ্গে (মুখবন্ধ ভ. ভ. স্ত্রুভে)", *পুরাকালীন প্রাচ্যের ইতিহাস*, মস্কো, ১৯৩৪। (Misulin, A.V., "Khe voprosu o rabstve na vostok". Predislovia: Struve. V. V., *Istoria Drevnivo Vostoka).*

৬৫. মেদভেদিয়েভ, ই. এম., "প্রাচীন ভারতীয় সমাজের সামাজিক অর্থনৈতিক কাঠামো প্রসঙ্গে", *এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণ*, মস্কো, ১৯৬৬, সংখ্যা ৬। (Medvediev, E. M., "Khe voprosu o sosialno-ekonomichiskoi stroi drevnei Istori India", *Narodi Azi-I-Afriki*).

৬৬. মেদভেদিয়েভ, ই. এম, "প্রাচীন ভারত", *পুরাকালীন ইতিহাস পত্রিকা*, ১৯৭২, সংখ্যা ২। ("Drevnia India", *Vestnik Drevnei Istori*).

৬৭. মেদভেদিয়েভ, ই. এম., "প্রাচ্যের জনগণের ঐতিহাসিক বিকাশে সনাতন সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা", প্রাচ্যের আধুনিক ইতিহাসবিজ্ঞান, মস্কো, ১৯৭৫। ("Ezuchenie Sovietskmi istorikami prolemi fromirobania tradisionnova obsestva vi Indi", *'Sovremennaiya Istoriographia Stran Zarubedznova Vostoka',* Role tradisionnnikh institutov vi istorichiskom razviti narodov Vostoka").

৬৮. লেনিন, ভ. ই., রচনাসমগ্র, রুশ সংস্করণ; খণ্ড ৩৯, পৃ. ১৫; খণ্ড ১, পৃ. ১৩৬; খণ্ড ২৬, পৃ. ৫৭। (Lenin, V. I., "Veliki Pochin: Isto Takoi Druzia Naroda e kak ani Vaiuut protiv Sosial-demokratov").

৬৯. সিমিওনোভ, ইউ, ই., "মনুষ্যসমাজের বিকাশের কিছু প্রশ্ন", *দর্শন পত্রিকা*, ১৯৬৫, সংখ্যা ৬। (Simionov, U E, "O nekotorikh voprosak stanovlenia chelovhiskova obsestva", *Voprosi Filosofi*).

৭০. সিমিওনোভ, ইউ ই., "প্রাচীন প্রাচ্যসমাজে শ্রেণি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তির প্রশ্ন সম্পর্কে", *এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণ*, ১৯৬৫, সংখ্যা ১। ("Problema stanovlenia klassov vi Gosudarstva b stranakh drevnevo Vostoka", *Narodi Azi-I-Afriki*).

৭১. সিমিওনোভ, ইউ. ই., "প্রাচীন চীনে শ্রেণিসমাজের উৎপত্তি ও বিকাশ প্রসঙ্গে সোভিয়েত ঐতিহাসিকদের অবদান", *এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণ*, সংখ্যা ১। ("Sovietskiea Istoriki o stanovleni klassobova obsestva vi drevnei Ketai", *Narodi Azi-i-Afriki*).

৭২. সিমিওনোভ, ইউ. ই. "সামাজিক অর্থনৈতিক কাঠামোতত্ত্ব ও বিশ্ব ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া", *এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণ*, ১৯৭০, সংখ্যা ৫। ("Theoria obsestvenno-ekonomichiskoi formasi e seomirnoi istorichisk prosses", *Narodi Azi-i-Afriki*).

৭৩. স্তুচেভস্কি, ই. আ., 'রোমান শাসনযুগে প্রাচীন মিশরের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে "কৃষকসমাজ", (ডক্টর অব সায়েন্স থিসিসের সংক্ষিপ্ত প্রকাশনা); মস্কো, ১৯৭৩। (Stuchevski, E. A., "Zemledelsi gosudarstvennova khoziestva drevnevo Egipta epokhi Remessidov").

৭৪. স্ত্রুভে, ভ. ভ., "প্রাচীন প্রাচ্যে দাসসমাজের উৎপত্তি, বিকাশ ও বিলুপ্তি প্রসঙ্গে পৃথিবীর সাংস্কৃতিক ইতিহাস" *রাষ্ট্রীয় একাডেমি পত্রিকা*, সংখ্যা ৭৭, মস্কো-লেনিনগ্রাদ ১৯৩৭। *বৈশ্বিক সংস্কৃতিবিষয়ক*। (Struve, V. V., "Problema rozdenia, razvitia e razlogenia rabovladelchiskikh obsestv drevneva Vostoka", *Izvestia Gosudarstvennoi Akademi Istori Mirovoi Kulturi*).

প্রবন্ধ ৫

প্রাক্-পুঁজিবাদী চীনে আর্থসামাজিক ব্যবস্থা ও এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি

প্রসঙ্গকথা: *এ প্রবন্ধটির রচনাকাল ১৯৮৪-৮৬, আর প্রকাশকাল ১৯৮৭। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল* ***ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকায়*** *(সপ্তবিংশ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৯৩, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭, পৃ. ১১১-১৪৪)। প্রাক্-পুঁজিবাদী চীনে আর্থসামাজিক ব্যবস্থা ও "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি" শিরোনামে এ প্রবন্ধটি রচনার পেছনে মূলত দুটো কারণ কাজ করেছিল: প্রথমত, 'এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি'-র সমর্থকদের প্রায় সবাই উদাহরণ হিসেবে চীন ও ভারত-এর কথা বলতেন; দ্বিতীয়ত, প্রাক্-পুঁজিবাদী চীনের তিন হাজার বছরের আর্থসামাজিক ইতিহাসের বৈচিত্র্য। বলা চলে "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি" তত্ত্বের বিচার-বিশ্লেষণে সুনির্দিষ্ট দেশের দীর্ঘ বাস্তব আর্থসামাজিক ইতিহাসের সম্মিলন নিয়ে– এটাই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকাশিত আমার প্রথম লেখা।*

ক. অবতরণিকা

এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতির প্রবক্তা ও সমর্থকদের ধারণানুযায়ী এশিয়া ও উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার দেশগুলো অর্থাৎ প্রাচ্যভূমির আর্থসামাজিক বিকাশের মর্মবস্তু ইউরোপীয় দেশগুলোর তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী এবং তা মার্কসীয় "আর্থসামাজিক বিকাশের পঞ্চস্তরীয় তত্ত্বের" সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ অথবা সাযুজ্যপূর্ণ নয়। এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতির তাত্ত্বিকদের মতে, মার্কসীয় "বিকাশের পঞ্চস্তরীয় তত্ত্ব"টি ইউরোপকেন্দ্রিক এবং সেটা শুধু পশ্চিমা সভ্যতার আর্থসামাজিক বিকাশ-বিশ্লেষণে প্রযোজ্য প্রাচ্যভূমির ঐতিহাসিক বিকাশ বিশ্লেষণে আদৌ সহায়ক নয় (বিস্তারিত দেখুন ৫)। আলোচিত

বিষয়ের পরিধি ও ক্রিয়াক্ষেত্র এতই বিস্তৃত যে শুধু সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই নয় এমনকি শিল্প-সাহিত্যেও প্রায়শ উল্লেখ করা হয়ে থাকে যে, পশ্চিমা ও প্রাচ্যের বিকাশ-বৈশিষ্ট্য নীতিগতভাবে পৃথকধর্মী (যেমন দেখুন ৪১, পৃ. ১)।

"পশ্চিমা ও প্রাচ্যসভ্যতার নীতিগত পৃথকধর্মিতা" ধারণার ভিত্তিতেই বুর্জোয়া শিল্প-সাহিত্যে সৃষ্টি হয়েছে পশ্চিম ও প্রাচ্যের ভিন্নধর্মী "আত্মিক বিকাশের মডেল"সমূহ। সুতরাং 'এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি'র ধারণাটি যে শুধু সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজনৈতিক-অর্থনীতিগত প্রভাব বিস্তার করে তা-ই নয় সেইসাথে তা হয়ে দাঁড়িয়েছে শিল্প-সাহিত্যসংক্রান্ত তত্ত্ব সৃষ্টিরও উপজীব্য।

এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতির তাত্ত্বিকদের মতে, প্রাচ্যভূমির অর্থনৈতিক ভিত্তি হলো কৃষিজমির ওপর সামাজিক/যৌথবদ্ধ মালিকানাসহ কমিউনিটি/গোষ্ঠী কৃষি। কৃষি ও খানাভিত্তিক শিল্পের (household industry) অবিচ্ছেদ্য ঐক্যের কারণে প্রাচ্যভূমি স্বনির্ভর এবং তার উৎপাদন পদ্ধতি অনড়। প্রাচীন প্রাচ্যের শহর ও গ্রামে কোনো সুস্পষ্ট বিভাজন লক্ষণীয় নয়। শহর হলো স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনাকারী এলিটদের জন্য আবাস এলাকামাত্র। রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব হলো আন্তকমিউনিটি অর্থনৈতিক সম্পর্কের অনুপস্থিতির কারণে প্রকৃতির বিরূপতা থেকে মুক্তি ও আত্মরক্ষার জন্য আন্তকমিউনিটি সংযোগ রক্ষা করা। রাষ্ট্র সবার ঊর্ধ্বে অবস্থিত, পবিত্র ও অবাধ শোষক। রাষ্ট্র হলো বৃহদায়তন সেচের উদ্দেশ্যে ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে সংঘবদ্ধকরণ, দেশ রক্ষা দায়িত্ব থেকে শুরু করে ভূমি ও জলসম্পদের সর্বোচ্চ মালিকানা ও খাজনা প্রয়োগের একচ্ছত্র অধিকর্তা। উৎপাদিত উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করা ও বৈদেশিক বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণকর্তা হলো শাসক এলিট বাহিনী। এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতির প্রবক্তাদের মতে, এগুলো হলো মোটামুটিভাবে প্রাচ্যভূমির অতীত চেহারা, যার সাথে পুরাকালীন ও মধ্যকালীন পশ্চিমা সভ্যতার চেহারার কোনো মিলই নেই।

পাশ্চাত্যের তুলনায় প্রাচ্যভূমির পার্থক্য বিশ্লেষণে প্রাচ্যবিশারদদের অধিকাংশই বাস্তব উদাহরণ হিসেবে যেসব দেশকে মডেল হিসেবে ব্যবহার করেন, সেগুলো হলো চীন, ভারত, শ্রীলংকা, মিসর ও মধ্যপ্রাচ্য (মেসোপটেমিয়া)। উপরন্তু "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি" ও "পুরাকালীন সামন্তবাদ" তত্ত্বের প্রবক্তারাও চীনকে "আদর্শ মডেল" হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন। চীন– বৃহৎ সভ্যতার মধ্যে সবচেয়ে বিচ্ছিন্ন এবং বিচ্ছিন্নতার মাঝে বিকাশমান সর্ববৃহৎ সভ্যতা। আর তাই সঙ্গতকারণেই প্রাক্-পুঁজিবাদী আর্থসামাজিক বিকাশের অভ্যন্তরীণ কৌশল সম্পর্কে অভিজ্ঞানের ক্ষেত্রে

চীনের গত তিন সহস্রাব্দ কালের বিকাশ-ইতিহাসই প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হওয়ার দাবিদার।

খ. বিশ্লেষণের পদ্ধতিতাত্ত্বিক প্রসঙ্গ

বাস্তব ঐতিহাসিক তথ্যাদি থেকে তাত্ত্বিক কাঠামো সৃষ্টি এবং বিদ্যমান তাত্ত্বিক কাঠামোর সত্যতা যাচাইয়ের সহজ কোনো পথ ও পদ্ধতি সামাজিক বিজ্ঞানে অনুপস্থিত। প্রাক্-পুঁজিবাদী চীনের গত তিন হাজার বছরের আর্থসামাজিক ব্যবস্থাসমূহের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে উল্লিখিত সমস্যাটি অত্যাধিক মাত্রায় অনুভূত হয়। কারণ,

প্রথমত, আর্থসামাজিক ব্যবস্থার তত্ত্বই হোক অথবা এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতির তত্ত্বই হোক, সেগুলো বিমূর্ত। আর বাস্তবে 'নির্ভেজাল' আর্থসামাজিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব নেই, তা থাকতে পারে না (দেখুন, ২৩, পৃ. ১৭১; ২৪, পৃ. ২৪১-২৪২; ৬, পৃ. ৩৬৫)।

দ্বিতীয়ত, প্রাক্-পুঁজিবাদী চীনের গত তিন হাজার বছরের ইতিহাস[৪৪] অত্যন্ত জটিল ও তৎসংক্রান্ত প্রাচুর্য, বিস্তৃতি ও বৈসাদৃশ্য থেকে বিভিন্ন তথ্যের আন্তসম্পর্ক উদ্‌ঘাটনের মাধ্যমে মূর্ত কোনো উপসংহারে উপনীত হওয়া এখন পর্যন্ত সম্ভব নয়। অথচ "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি"র প্রবক্তারা অতি সহজেই এই উপসংহারে উপনীত হন যে, প্রাচীন যুগ থেকে পুঁজিবাদের অভ্যুদয়কাল পর্যন্ত সমগ্র পর্বটিতেই চীনে মালিকানা (উৎপাদনের উপায়ের ওপর) ও শোষণসম্পর্ক অপরিবর্তিত ছিল। তাদের মতে, তা আদিম বিকশিত উৎপাদিকা

[৪৪] গত তিন হাজার বছরের চীনে যেসব প্রধান ঐতিহাসিক শাসনকাল লক্ষ করা যায়, সেগুলো হলো যথাক্রমে 'সান্ অথবা ইন্ রাজত্ব' (খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০-১১০০); 'চৌ রাজবংশ' (খ্রীষ্টপূর্ব ১১০০-খ্রীষ্টপুর্ব ২২১ সাল), যার অন্তর্ভুক্ত: আদি/পশ্চিম চৌ (খ্রী.পূ. ১১০০-৭২০), চুন্-চিউ (খ্রী.পূ. ৭২২-৪৮১), যোদ্ধারাষ্ট্র, (খ্রী.পূ. ৪৮১-২২১); 'প্রথম সম্রাট': চিন্ (খ্রী.পূ. ২২১-২০৬) ও হান্ রাজবংশ (খ্রী.পূ.২০৬-২২১ খ্রীষ্টাব্দ); 'প্রথম বিভক্তি পর্ব' (২২১-৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দ): 'তিন রাজবংশ' (২২১-২৬৫ খ্রীষ্টাব্দ), ভসিন্ রাজবংশ (২৬১-২১৬ খ্রীষ্টাব্দ), উত্তর ও দক্ষিণ সম্রাট (৩১৬-৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দ); 'দ্বিতীয় সম্রাট' (৫৮৯-৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ): সুই (৫৮৯-৬১৮ খ্রীষ্টাব্দ) ও তান্ রাজবংশ (৬১৮-৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ); 'পাঁচ রাজবংশ' (৯০৭-৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ); 'সুং রাজবংশ' (৯৬০-১১২৭ খ্রীষ্টাব্দ), 'দ্বিতীয় বিভক্তি পর্ব': কিন্ ও দক্ষিণ সুং রাজবংশ (১১২৭-১২৮০ খ্রীষ্টাব্দ); 'হউআন (মঙ্গোল) সম্রাট' (১২৮০-১৩৬৭ খ্রীষ্টাব্দ); 'মিন সম্রাট' (১৩৬৮-১৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দ) ও চি-ইং বা 'মাঞ্চুরীয় সাম্রাজ্য' (১৬৪৪-১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ) (বিস্তারিত দেখুন, ৩৫, পৃ. ২৬১-২৬২, ৩৩, পৃ. ২৭-২৮)।

শক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং সেখানে কোনো সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত হয়নি।

তৃতীয়ত; আর্থসামাজিক বিকাশের বৈশিষ্ট্য উদ্‌ঘাটনে বিস্তৃত ঐতিহাসিক তথ্যের কোনটি কতটুকু গুরুত্ব বহন করে এবং কেন।

চতুর্থত; নির্দিষ্ট তথ্যের সত্যতা যাচাইকরণ কীভাবে সম্ভব?

উল্লিখিত পদ্ধতিতাত্ত্বিক সমস্যাসমূহের আশানুরূপ সমাধান না করে বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে কোনো উপসংহারে আসা সঠিক নয়। এক্ষেত্রে আর্থসামাজিক ব্যবস্থার ধারণা ও তার সংশ্লিষ্ট বড় মাপের উপাদানসমূহের আন্তসম্পর্ক নির্ধারণ করেই বিশ্লেষণ শুরু করা উচিত (এ বিষয়ে প্রাথমিক বিশ্লেষণাত্মক ধারণার জন্য দেখা যেতে পারে ২, পৃ. ৬৮-৭২; ৪, পৃ. ৭৮-৯২)। প্রাক্-পুঁজিবাদী চীনের গত তিন হাজার বছরের আর্থসামাজিক ব্যবস্থাসমূহের সারার্থ উদ্‌ঘাটনের ক্ষেত্রে ব্যাপক-বিস্তৃত ঐতিহাসিক তথ্যাদির সেগুলোই প্রাধান্য দিতে হবে যা,

প্রথমত, বিকাশের সাধারণ সমাজবিজ্ঞানীয় সূত্রটির সাথে সম্পর্কিত অর্থাৎ উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদনসম্পর্কের নির্ণায়ক;

দ্বিতীয়ত, যা উপরিকাঠামোর বিভিন্ন মৌলিক উপাদান অর্থাৎ রাষ্ট্রকাঠামো (চীনের ক্ষেত্রে বিশেষ শাসকগোষ্ঠী "সেন্‌সি"), মতাদর্শ ও দর্শনের সারার্থ নির্ণায়ক; এবং

তৃতীয়ত, সমাজ পরিবর্তনের সরাসরি উপাদানসমূহ যেমন বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সংঘর্ষসমূহের সাথে সম্পর্কিত। উৎপাদনসম্পর্কের চরিত্র উদ্‌ঘাটনের ক্ষেত্রে সরাসরি গুরুত্ব দিতে হবে উৎপাদনের উপায়ের ওপর মালিকানাসম্পর্ককে। আর প্রাক্-পুঁজিবাদী চীনে সেটা হতে পারে ভূমির ওপর মালিকানা এবং শ্রমশক্তির ওপর মালিকানা।

সুতরাং, প্রাক্-পুঁজিবাদী চীনের গত তিন হাজার বছরের আর্থসামাজিক ব্যবস্থাসমূহের বিকাশচরিত্র উদ্‌ঘাটনে যেসব মানদণ্ড ব্যবহৃত হওয়া যুক্তিসঙ্গত সেগুলো হলো– (১) উৎপাদনের উপায়ের ওপর মালিকানাসম্পর্ক (২) রাজনৈতিক উপরিকাঠামো (৩) মতাদর্শ ও (৪) উৎপাদিকা শক্তির বিকাশমাত্রা। বিশ্লেষণে মার্কসীয় পদ্ধতিতাত্ত্বিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ যেসব বিষয় বিবেচনা যুক্তিসঙ্গত হবে তা হলো:

প্রথমত, উল্লিখিত চারটি মানদণ্ড একই সময়ে ক্রিয়া করে না অর্থাৎ একটির পরিবর্তন একই সাথে অন্যটির পরিবর্তন সাধন করতে পারে এবং নাও পারে;

দ্বিতীয়ত, উৎপাদিকা শক্তির বিকাশই শেষপর্যন্ত মালিকানাসম্পর্কের আমূল পরিবর্তন অপরিহার্য করে তোলে। এর অর্থ এই নয় যে, সামাজিক বিপ্লব হলো উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের তাৎক্ষণিক ফল। একটি আর্থসামাজিক ব্যবস্থার অন্যটিতে রূপান্তর ঘটে তখন, যখন নির্দিষ্ট উৎপাদনসম্পর্ক নির্দিষ্ট উৎপাদিকা শক্তির চরিত্র ও বিকাশমাত্রার সাথে অত্যাধিক মাত্রায় অসঙ্গতিপূর্ণ হয়ে যায়। এটি হলো সমাজপরিবর্তনের বস্তুগত ভিত্তি এবং অপরিহার্য শর্ত। অন্যটি হলো ব্যক্তিভিত্তিক শর্ত। বিকাশের ঐতিহাসিক কাল নির্ধারণের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো এই যে, উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ঘটে অনিবার্যভাবে এবং উৎপাদনসম্পর্কের আমূল পরিবর্তন দেখা দেয় উৎপাদিকা শক্তির সাথে অসঙ্গতি দেখা দেওয়ার আগে নয়, অবশ্যই পরে। কত পরে? যে সমাজব্যবস্থায় উৎপাদিকা শক্তি যত ধীরে বিকশিত হয়, সেখানে আর্থসামাজিক ব্যবস্থার একটির অপরটিতে রূপান্তর প্রায়শ হয় তত ধীরে;

তৃতীয়ত; মালিকানাসম্পর্কের আমূল পরিবর্তন ঘটে রাজনৈতিক উপরিকাঠামোতে আমূল পরিবর্তনের সাথে সাথে;

চতুর্থত; মতাদর্শগত পরিবর্তন রাজনৈতিক উপরিকাঠামোতে আমূল পরিবর্তনের বহু আগেই ঘটে থাকে। মতাদর্শের লড়াই রাজনৈতিক উপরিকাঠামোর আমূল পরিবর্তনের অন্যতম শর্ত সৃষ্টি করে। এবং রাজনৈতিক উপরিকাঠামোর আমূল পরিবর্তনের পরও বহু যুগ ধরে মতাদর্শের লড়াই চলতে থাকে; এবং

পঞ্চমত; প্রাক্-পুঁজিবাদী চীনের আর্থসামাজিক বিকাশে বহিঃউপাদান হিসেবে বিদেশি আগ্রাসনের ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ নয় (অন্তত খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতক থেকে)। বিষয়টির পদ্ধতিগত তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো এই যে, বিজয়ী বিদেশিরা পরাজিতদের ওপর তিন ধরনের প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম, যা ঐতিহাসিকভাবে

প্রমাণিত। বিজয়ীরা পরাজিতদের ওপর তাদের অর্থাৎ বিজয়ীদের উৎপাদন পদ্ধতি চাপিয়ে দেয় (যেমন ব্রিটিশরা ভারতে পুঁজিবাদ আমদানি করে), অথবা বিজয়ীরা পরাজিতদের পশ্চাৎপদ (প্রায়শ) উৎপাদন পদ্ধতিতেই সন্তুষ্ট থাকে এবং তাদের দানটাই বিজয়ীদের শান্ত রাখে (যেমন, তুর্কি ও রোমান বিজয়ীদের ইতিহাস), অথবা বিজয়ীরা পরাজিতদের দেশে-দুই দেশে বিরাজমান উৎপাদন পদ্ধতির একটি সংশ্লেষিত রূপ সৃষ্টি করে (যেমন জার্মানিক বিজয়ীদের ইতিহাস)।

উল্লিখিত পদ্ধতিতাত্ত্বিক বিষয়াদি যথাযথ গুরুত্বসহকারে বিবেচনাধীন রেখে প্রাক্-পুঁজিবাদী চীনের গত তিন হাজার বছরের আর্থসামাজিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করে যা উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব সেগুলো হলো নিম্নরূপ:[৪৫]

গ. প্রাক্-পুঁজিবাদী চীনে ভিত্তিকাঠামো: উৎপাদনের উপায়ের ওপর মালিকানার বৈশিষ্ট্য ও পরিবর্তন

অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার মতোই চীনের আদিম যুগের ইতিহাসও অলৌকিক কাহিনিতে পরিপূর্ণ। প্রত্নতত্ত্ববিদসহ সব সমাজবিজ্ঞানীর কাছে চীনের আদিম সাম্যবাদী যুগসংক্রান্ত ধারণা এখনো স্পষ্ট নয় (দেখুন ৩৪, পৃ. ২০-২৩, ২৬-৩৩; ৩৯, পৃ. ৫-৭, ৮-২৪)। চীন বিশারদদের মতে, আদিম যুগের চীন হলো জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত "ইয়াও" ও "সুন"দের নেতৃত্বাধীন "স্বর্ণযুগ"। চৈনিক লোকগাঁথা অনুযায়ী "ইয়াও" ও "সুন্"-পরবর্তী আমলে নির্বাচিত উপজাতীয় নেতা "মহান্ ইউওয়া"র পুত্র জোরপূর্বক রাজ্যক্ষমতা দখল করে এবং তারপর থেকেই জনগণের নির্বাচিত "রাজার" বিপরীতে "বংশপরম্পরায় রাজ্যক্ষমতা হস্তান্তরের" নতুন পদ্ধতি প্রচলন হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যানুযায়ী প্রমাণিত হয় যে, আদি যুগেই উত্তর-চীনের উপজাতিরা প্রস্তর যুগ থেকে ব্রঞ্জ যুগে প্রবেশসহ গোষ্ঠীসমাজভিত্তিক নগরায়ণ অভিমুখে যাত্রা করে। প্রস্তর থেকে ধাতু যুগে প্রবেশ, কাঠের

[৪৫] এখানে উল্লেখ করা উচিত যে, একটি প্রবন্ধের অল্প পরিসরে প্রাক্-পুঁজিবাদী চীনের তিন হাজার বছরের জটিল ইতিহাসের সারসংক্ষেপ প্রায় অসম্ভব। এক্ষেত্রে যা করা হয়েছে তা হলো একান্তই রাজনৈতিক-অর্থনীতিগত দৃষ্টিতে ইতিহাস পর্যালোচনা। এ-দৃষ্টিতে পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহের বিষয়াদিকেই ইতিহাস পর্যালোচনার মার্কসীয় পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এ বিষয়ে পদ্ধতিতাত্ত্বিক বিস্তারিত দেখা যেতে পারে বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষৎ আয়োজিত জাতীয় সেমিনারে (জানুয়ারি ১৯৮৭) লেখকের "ইতিহাসের পদ্ধতিতাত্ত্বিক প্রশ্নসমূহ— একটি মার্কসীয় অবতারণা" শিরোনামের প্রবন্ধটি (এ গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রবন্ধ)।

কোদাল, ব্রোঞ্জের ঢাল-তলোয়ার ও যোদ্ধাদের ঘোড়া-গাড়ি ইত্যাদির ধরন থেকে সহজেই প্রমাণিত হয়েছে যে চীনা সভ্যতাকে পৃথিবীর অন্য সভ্যতার মতোই উৎপাদিকা শক্তির অনুরূপ বিকাশ স্তর অতিবাহিত করতে হয়। সামাজিক-শ্রেণিগত ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের সাথে তাল রেখেই উৎপত্তি হয় চৈনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা। "সান্" ও "চৌ" আমলের (খ্রীষ্টপূর্ব ষোড়শ থেকে দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত) ঐতিহাসিক পুরানিদর্শন, যেমন শবাধার থেকে প্রমাণিত হয় যে আজ থেকে তিন হাজার বছর আগের চীনে ধনী ও গরিবদের (বিশেষত দাসমালিক ও দাসদের) কবরের অঙ্গসজ্জাও পৃথক ছিল। আবার খ্রীষ্টপূর্ব একাদশ শতাব্দীতে "চৌ" উপজাতি কর্তৃক "সান্" রাষ্ট্র দখলও সম্ভব হয়েছিল সান্দের অত্যাচার ও শাসন-সংঘাতের কারণেই (দেখুন ৪২, পৃ. ৬২-৮২)। চীনা ঐতিহাসিক ফানভেন-লানের মতে, সম্পদ আত্মসাতের ক্ষেত্রে "সান্"দের তুলনা নেই (দেখুন ২১, পৃ.-৭১)। এসবই প্রাথমিক পর্যায়ের শ্রেণিসমাজের লক্ষণ, যেখানে গোষ্ঠীকর্তৃক উৎপাদিত উদ্বৃত্ত দ্রব্য ভগবানের হস্তে অর্পণের নামে সাধারণ ভোগ তহবিলের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে শাসকগোষ্ঠীরই করায়ত্তে চলে যেত। সুতরাং শ্রেণিহীন সমাজ থেকে শ্রেণিসমাজে উত্তরণের আদিপর্বে চীনে যা ঘটেছিল (সারার্থের বিচারে) তা অন্যান্য দেশেরই অনুরূপ, এক্ষেত্রে নীতিগত কোনো ব্যতিক্রম লক্ষণীয় নয়।

অভিজাত "সান্" মর্যাদা বংশপরম্পরায় রক্ষিত কি না? উৎপাদনের প্রধান উপায়– ভূমির মালিক কে ছিল? গোষ্ঠী, অভিজাত সম্প্রদায়, নাকি রাষ্ট্র? ফসল ওঠানোর দায়িত্ব কে বহন করত? দাসদের সাহায্যে সুবিধাভোগী স্তর, নাকি গোষ্ঠী? অভিজাতদের আয়ের প্রধান উৎসটি কী? রাষ্ট্রীয় তহবিল নাকি অন্য কিছু? অভিজাতদের অস্পৃশ্য ক্রিয়াকর্ম কে করত? চীনা ইতিহাস সম্পর্কে যে ভাণ্ডার এ পর্যন্ত সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে উল্লিখিত প্রশ্নসমূহের উত্তর প্রদান এখনো সম্ভব নয়।

প্রত্নতাত্ত্বিক পুরানিদর্শনের ভিত্তিতে পুরাকালীন চীনের আর্থসামাজিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সরাসরি উপসংহারে উপনীত হওয়ার ব্যাপারটি অনেকেই (বিশেষত, এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতির প্রবক্তারা) অতিমাত্রায় সহজ করে থাকেন। যেমন আজ থেকে প্রায় তিন হাজার বছর আগের এমন বহু শবাধার পাওয়া গেছে, যেখানে শাসক-অভিজাতদের শবদেহের পাশে বহু সাধারণ মানুষের শবদেহ ও হাড়গোড় লক্ষ করা যায়। কোনো কোনো চৈনিক গবেষক মনে করে থাকেন, ঐসব মানুষ হলো 'দাস', আর তৎকালীন সমাজব্যবস্থা হলো দাসব্যবস্থা। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, ঐসব সাধারণ মানুষ হলো যুদ্ধবন্দী, আর যেহেতু দাসশ্রমের কোনো চাহিদা ছিল না তাই তাদের হত্যা করা হতো। সুতরাং তৎকালীন সমাজ কোনোক্রমেই দাসব্যবস্থা

নয়। চৈনিক গবেষকদের কেউ কেউ আবার ব্যাপারটিকে ভারতীয় সতীদাহ প্রথার সাথে তুলনা করে তাকে "আত্মীয়দাহ প্রথা" হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তাদের মতে, ব্যাপারটি স্রেফ ধর্মীয়, কারণ যুদ্ধমৃত আত্মীয়দের ভবিষ্যৎজগতে মঙ্গলকামনা করেই যুদ্ধবন্দীরা স্বেচ্ছায় কবরে যেতে রাজি থাকত (দেখুন, ২৫, পৃ. ২০; ২৭, পৃ. ২৮-৩৬)। উল্লিখিত উপসিদ্ধান্তসমূহ স্বল্পযৌক্তিক। তবে বেশ কৌতূহলোদ্দীপক।

সান্ সমাজের শ্রেণিকাঠামোসংক্রান্ত প্রশ্নেও চীনবিশারদেরা দ্বিধাবিভক্ত। যেমন চৈনিক গবেষক সান্ ইউ-এ এবং রুশ গবেষক স্টেপুগিনার-এর মতে, "সান্" যুগ হলো শ্রেণিহীন আদিম সাম্যবাদী যুগ (দেখুন ২৫; ২৭)। অন্যদিকে গবেষকদের ব্যাপকাংশের ধারণায় যেহেতু সান্ যুগে সামাজিক-শ্রেণিগত ও সম্পদগত বৈষম্য লক্ষ করা যায় এবং ইতিমধ্যে হস্তলেখনী প্রথা চালু হয়েছে সুতরাং "সান্" যুগের চীন হলো শ্রেণিভিত্তিক সমাজ (দেখুন ৪২, পৃ. ৬৭-৭৬)। প্রয়োজনীয় তথ্যাভাব হেতু আপাতত যা বলা সম্ভব তা হলো– প্রথমত, "সান্" যুগের চীন হলো হয় আদিম সাম্যবাদের শেষের দিকের, নয় শ্রেণিবিভক্ত সমাজের প্রাথমিক পর্বের সমাজব্যবস্থা; দ্বিতীয়ত, "সান্" যুগের ব্যাপক জনসমষ্টি প্রধানত গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনপদ্ধতি মেনে চলত। সম্ভবত পারিবারিক যোগসূত্র বা বন্ধনই গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনপদ্ধতির ভিত্তি হিসেবে কাজ করত। তৃতীয়ত, গোষ্ঠীনেতা বা গোষ্ঠীপ্রধান কর্তৃক গোষ্ঠী রীতিনীতির মাধ্যমে ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা অমূলক নয় (এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত দেখুন, ২২, পৃ. ৬০)।

রাজনৈতিক অর্থনীতির দৃষ্টিতে "সান্" যুগের শেষ পর্বের চীন অবশ্যই শ্রেণিবিভক্ত সমাজব্যবস্থার বাহক। শুধু তা-ই নয় "গোষ্ঠীসম্পর্কের আচ্ছাদনে" সেকালে শ্রেণিরাষ্ট্রকাঠামোর উদ্ভবও অমূলক নয়। আর সান্ যুগের শেষের দিকে চীনের আর্থসামাজিক ব্যবস্থা যদি তা-ই হয় সেক্ষেত্রে তৎপরবর্তী "পশ্চিম চৌ" (খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের শুরুর দিকে) যুগের চীন যে অধিক মাত্রায় শ্রেণিভিত্তিক তা সন্দেহাতীত। কিন্তু "পশ্চিম চৌ" এবং তৎপরবর্তী "চুন্‌চিউ" রাজ্যের আর্থসামাজিক বৈশিষ্ট্য মূল্যায়নে গবেষকেরা মাত্রাতিরিক্ত দ্বিধাবিভক্ত এবং তাদের মূল্যায়ন মাপকাঠিটিও অধিকতর বিস্তৃত। যেমন "পশ্চিম চৌ" আমলের চীনকে তোকে-ই যখন আদিম সাম্যবাদী ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য করছেন (দেখুন, ১৩) তখন দুমান্ ও বাই-সোত্তই-এর মতে, তা হলো দাস সমাজ (দেখুন, ১৬, পৃ. ২২; ৪২, পৃ. ৮৪), আর ফান্‌ভেন-লান ও ফিজজিরাল্ড-এর মতে, সেটাই সামন্তবাদী ব্যবস্থার সাক্ষ্য বহন করে (দেখুন ২১, পৃ. ৭৮-৮২; ৩৩, পৃ. ৫৫-৭৩)।

যদিও সান্ যুগের তুলনায় "পশ্চিম-চৌ" যুগসংক্রান্ত তথ্যের আধিক্য বিদ্যমান, তথাপি শেষোক্ত যুগসংক্রান্ত যত বেশি তথ্য, তত ভিন্ন তার মূল্যায়ন। যেমন "পশ্চিম চৌ" ও "চুন্-চিউ" যুগের চীনে যে দাসদের অস্তিত্ব ছিল এ ব্যাপারে চীনবিশারদের প্রায় সবাই একমত। কিন্তু দাস বুঝতে কোন চিত্রলিপি ব্যবহার করা হতো, সে বিষয়ে তাদের অনেকেই একমত নন। যেমন ভূমির সাথে সম্পর্কিত অধিকাংশ জনসংখ্যা বোঝাতে ব্যবহৃত হতো চিত্রলিপি 'চজুন'। আর এই 'চজুন' বলতে কেউ বোঝাচ্ছে 'দাস', কেউ বা 'কৃষক', আবার কেউ 'সাধারণ মানুষকে' (অনেকে বলছেন 'আস্তাকুড়ের মানুষ')। তদুপরি স্বাধীন শ্রমজীবী ও দাসশ্রমিকের শ্রমের আন্তসম্পর্কের পরিমাণ ও গুণগত দিকসংক্রান্ত প্রশ্নাদি এখন পর্যন্ত সমাধান হয়নি।

"পশ্চিম চৌ" ও "চুন্-চিউ" আমলের চীনে যে ক্লান (আত্মীয়তার বন্ধনভিত্তিক) পদ্ধতির প্রচলন ছিল এবং কোনো কোনো ক্লান যে বিশেষ সুবিধা ভোগ করত– সে বিষয়ে প্রচুর তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়। তদুপরি সমসাময়িককালে "জি-জিয়ান্" পদ্ধতি (কুয়া পদ্ধতি) যে চীনের ভূমি ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রীয় ভূমি ব্যবহার পদ্ধতি ছিল সে ব্যাপারেও তথ্যের কোনো ঘাটতি নেই। 'জিন-টিয়ান্' পদ্ধতি অনুযায়ী কৃষিভূমি ৯ ভাগে বিভক্ত করা হতো। ৮টি পরিবার ভিন্ন ভিন্নভাবে ৮টি খণ্ড জমি চাষাবাদ করত। ৯ নম্বর কৃষিজমিটি থাকত মাঝখানে, সেটা ঐ ৮টি পরিবার যৌথভাবে চাষ করত এবং যৌথাবাদকৃত জমির ফসল সঞ্চিত হতো রাষ্ট্রীয় তহবিলে। অতএব যদিও গোষ্ঠীসমাজ ও গোষ্ঠীভিত্তিক ভূমিকর্ষণ পদ্ধতির অস্তিত্ব জানা যায়, তথাপি সব কৃষিজমি যে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীনে ছিল সে ব্যাপারে কোনো সঠিক তথ্যপ্রমাণ নেই। উল্লেখ্য, যারা সমসাময়িক চীনে রাষ্ট্রীয় মালিকানার প্রাধান্যের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন (অর্থাৎ এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি ধারণার প্রবক্তারা) তারা মূলত, "চৌ"-যুগের লোকগাঁথাকেই বিশ্বাসের ভিত্তি হিসেবে ধরে নেন। এ রকমই একটি লোকগাঁথা হলো যে, "মর্তে জমি নেই যা রাষ্ট্রের নয়, জমিতে কেউ নেই এবং কিছু নেই যা রাষ্ট্রের নয়" (দেখুন, ১০, পৃ. ১৭৩)। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রীয় ভূ-মালিকানা নির্ধারিত হতে পারে শুধু সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তে, যখন "চৌ"রা "সান্দের" রাজত্ব দখল করল অর্থাৎ তথাকথিত রাষ্ট্রীয় ভূ-মালিকানা হলো উত্তরণপর্বের ঘটনামাত্র, যা ঐতিহাসিকভাবে তুলনামূলক স্বল্পস্থায়ী ব্যাপার। দেশ জয়ের পর বিজয়ীরা দখলকৃত দেশের ভূ-সম্পত্তিকে সাধারণ সম্পত্তি বা যৌথমালিকানাধীন সম্পত্তি হিসেবে দেখত এবং ঐসব সম্পত্তি বিতরণের (ব্যক্তি, গোষ্ঠী, দলসমষ্টি যার কাছেই হোক) একমাত্র মালিক হলো–রাষ্ট্রশাসকেরা। কিন্তু বাস্তবত যা ঘটে, তা হলো এই– বিতরণকৃত জমির মালিকানা আগের মতোই "সান্" যুগের গোষ্ঠীর হাতেই চলে যায় এবং বিজয়ীরা যা

পায়, তা হলো পরাজিতদের শ্রমশক্তি আত্মসাতের অবাধ অধিকার। চৌ'দের বিজয়ের অপেক্ষাকৃত স্বল্পকালের ব্যবধানেই রাষ্ট্রীয় ভূ-মালিকানা থেকে দুই ধরনের মালিকানাপদ্ধতির উৎপত্তি ঘটে। তা হলো গোষ্ঠীর প্রকৃত মালিকানা এবং সুবিধাভোগী পরিবারসমূহের নামমাত্র মালিকানা।

উপরন্তু "পশ্চিম চৌ" (খ্রী. পূ. ১১০০-৭২২) ও "চুন্-চিউ"দের (খ্রী. পূ. ৭২১-৪৮১) আমলে যে উল্লিখিত দুই ধরনের মালিকানাপদ্ধতির পাশাপাশি তৃতীয় রূপের মালিকানাপদ্ধতির প্রচলন ছিল, সে সম্পর্কেও পরোক্ষ তথ্য পাওয়া যায়। আর তা হলো– কোনো কোনো গোষ্ঠীসভ্যের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন কৃষিজমি। অপেক্ষাকৃত অনুর্বর এবং অতীতে কর্ষিত হতো না এমন ধরনের কৃষিভূমি বা অতীতে গোষ্ঠীর আওতাভুক্ত ছিল না, সেগুলোই হলো উল্লিখিত ব্যক্তিমালিকানার আওতাধীন। ব্যক্তিমালিক কর্তৃক কর্ষিত এসব কৃষিভূমিতে গোষ্ঠীভিত্তিক উৎপাদনসম্পর্কের প্রতিফলন ক্রমান্বয়ে কমে আসছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-চতুর্থ শতাব্দীর ভূমি ও কৃষিসংস্কারও উল্লিখিত ব্যক্তিমালিকানার অস্তিত্ব প্রমাণ করে। আর "ন্যাচারাল ইকনোমির" আওতায় ব্যক্তিমালিকানার শক্তি বৃদ্ধিই সম্ভবত সেই প্রক্রিয়ার অর্থনৈতিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে, যার ফলে "চৌ"দের বর্বর সাম্রাজ্যের পতনের মাধ্যমে চীনে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়। উল্লেখ্য, "চৌ" আমলের ব্যক্তিমালিকানা আধুনিক বুর্জোয়া আইনশাস্ত্রে যে ব্যক্তিমালিকানার কথা বলা হয় তার সমার্থক নয়। তা ছাড়া ঐসব ভূমিকর্ষণকারী সরাসরি উৎপাদকের সামাজিক শক্তি ও মর্যাদার মাত্রা যে কী সেটাও সুস্পষ্ট নয়। তারা কি স্পার্টাক হিলোতাসদের মতো, নাকি আধা দাস, নাকি স্বাধীন কৃষকদের সমতুল্য? ঐসব উৎপাদকের উদ্বৃত্ত দ্রব্য কেমন পদ্ধতিতে আত্মসাৎ হতো? ফসল কর্তনের সাথে সাথে তা কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা হতো এবং পরে গোষ্ঠীসভ্যদের মধ্যে বিতরণ করা হতো, নাকি উৎপাদক ও নিচু স্তরের শোষকদের মধ্যে ভাগাভাগির উচ্ছিষ্টাংশ কেন্দ্রীয় তহবিলে চালান করা হতো? এসব প্রশ্নের যথেষ্ট তথ্যভিত্তিক কোনো উত্তর এখনো দেওয়া সম্ভব নয়। তবে এটা সত্য যে, ফসল কর্তনের পরপর পুরোটাই যদি সরাসরি কেন্দ্রীয় তহবিলে চালান হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে শোষণের মাত্রা ছিল নিয়ন্ত্রণেরই পরিচায়ক। এক্ষেত্রে সরাসরি উৎপাদকশ্রেণি অবশ্যই দারিদ্র্যসীমার নিম্নে বাস করতে বাধ্য থাকত। উল্লিখিত ব্যাপারে বিস্তারিত জানা না গেলেও "পশ্চিম-চৌ" আমলের বহু স্তরবিশিষ্ট রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অস্তিত্ব থেকে অনুমান করা যায় যে, তৎকালে উৎপাদকের ওপর সরাসরি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। সুতরাং "পশ্চিম-চৌ" ও "চুন্ চিউ" আমলের

চীনের আর্থসামাজিক অবস্থাসংক্রান্ত অসম্পূর্ণ তথ্যের ভিত্তিতে যা বলা সম্ভব, তা হলো এই যে,

১. প্রায় সব ঐতিহাসিক কর্তৃক স্বীকৃত 'দাসদের' অস্তিত্ব (পাঁচ জন দাস = এক ঘোড়া + এক বান্ডিল সিল্ক),

২. গোষ্ঠী ও পরিবারভিত্তিক সামাজিক সংগঠনের যথেষ্ট ভূমিকা, এবং

৩. উৎপাদকদের ওপর মাত্রাতিরিক্ত সরাসরি উৎপীড়ন (দেশ জয়, বহু স্তরবিশিষ্ট রাষ্ট্রীয় কাঠামো)।

বিভিন্ন রাজনৈতিক-অর্থনীতিবিদ উল্লিখিত উপাদানসমূহ থেকে বিভিন্ন ধরনের উপসংহারে উপনীত হয়ে থাকেন (দেখুন- ২২, পৃ. ২১৭-২১৮; ৭, পৃ. ২৪৯-২৫৩; ৮, পৃ. ৬২-৬৫; ৯, পৃ. ৫১-৬৯)। সোভিয়েত চীন বিশারদ ভাসিলিয়েভের মতে, "গোষ্ঠী ও শোষকদের মধ্যের সম্পর্কের" নিরিখে "চৌ" আমলের চীনের আর্থসামাজিক ব্যবস্থা হলো– "প্রাথমিক পর্বের সামন্তবাদী ব্যবস্থা" আর "দাস প্রতিষ্ঠানসমূহের বিকাশপ্রবণতা"র বিচারে তা হলো "প্রাথমিক পর্বের দাসব্যবস্থা" (দেখুন ২২, পৃ. ২১৯)। "চৌ"-আমলের চীন প্রসঙ্গে ভাসিলিয়েভের উপসংহারে রাজনৈতিক অর্থনীতির মর্মার্থ বিচারে ফারাকটি যথেষ্ট, সময়গত ব্যবধানও যথেষ্ট এবং বিচারের মানদণ্ডও বিতর্কিত। আর পদ্ধতিতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে যা বলা উচিত তা হলো এই যে, সামন্তবাদী উৎপাদনসম্পর্কের উদ্ভবকালে ভূমির ওপর ব্যক্তিমালিকানা সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সব উপাদানই সতেজ হওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়; কারণ সামন্তবাদই মনুষ্যসভ্যতার ইতিহাসের প্রথম পর্ব, যখন ভূমির ওপর ব্যক্তিমালিকানা সমগ্র সামাজিক সম্পর্কের প্রধানতম ভিত্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। কিন্তু দাস সমাজ, এমনকি যেখানে অর্থ-পণ্য সম্পর্কও যথেষ্ট মাত্রায় বিকশিত, সেখানে গোষ্ঠীভিত্তিক সামাজিক সম্পর্কের বহু উপাদানই সক্রিয় ও সতেজ থাকে। পুরাকালীন চীনা সমাজ সম্ভবত এই দ্বিতীয় পথেরই সাক্ষ্য বহন করে।

চৈনিক আর্থসামাজিক ইতিহাসে "চৌ"-পরবর্তী প্রায় ৫০০ বছরব্যাপী যে বৃহৎ পর্ব তা হলো– হান্ পর্ব (খ্রীষ্টপূর্ব ২০৬– খ্রীষ্টাব্দ ২২১)। চৈনিক বিকাশের এই পর্বে অর্থ-পণ্য সম্পর্কের পাশাপাশি বিকশিত হতে থাকে উৎপাদনের উপায়ের ব্যক্তিগত মালিকানা (বিস্তারিত দেখুন, ২০, পৃ. ৯৪-৯৮; ৭, পৃ. ১৬-৪৬; ৩৯, পৃ. ৯২-১০৯; ৪২, পৃ. ১৬২-১৭৩)। সরাসরি উৎপাদকের উৎপাদনের উপায় থেকে ক্রমাগত বিচ্ছিন্ন হওয়াটা "হান্" আমলে দ্রুতগতিতে গোষ্ঠীসমাজ ভেঙ্গে পড়ারই লক্ষণমাত্র। বিভিন্ন উৎসের ভিত্তিতে

প্রমাণিত হয় যে, এই আমলেই দাসদের পাশাপাশি খুদে-প্রান্তিক ভূ-মালিকদের মজুরিশ্রমিকে রূপান্তর ঘটে এবং মজুরিশ্রমিকদের সামাজিক মর্যাদা ছিল প্রায় দাসদের সমতুল্য। অবশ্য দাস ও দাসতুল্য মজুরিশ্রমিকদের আন্তঃসম্পর্ক ও পরিমাণবাচক দিকসমূহ কেমন ছিল, অভিজাতদের ভূমি কারা কর্ষণ করত, শোষকদের আয়ের প্রধান উৎসটি কী ছিল (কোন ধরনের শ্রমশক্তি)(?)– এসব প্রশ্নের তথ্যনির্ভর কোনো উত্তর এখনো দেওয়া সম্ভব নয়। খ্রীষ্টাব্দ প্রথম শতাব্দী থেকেই "হান্" সম্রাট ঘোষণা করেছিলেন যে, রাষ্ট্রই সব ভূমির মালিক। "হান্" আমলেই রাষ্ট্রীয় নির্দেশে "ভাগচাষ" প্রথা প্রবর্তিত হয়। এই প্রথানুযায়ী যেমন ধনী কৃষক তেমনি সাধারণ কৃষকের কাছেও আবাদযোগ্য জমি দেওয়া হতো। চীনা গবেষক বাই-সোন্উই-এর মতে, "কুইন-হান্ পর্বে সামন্তসম্পর্ক পরিপক্বতা লাভ করে। তার মতে, গুরুত্বক্রমানুসারে ভূ-মালিকানার অধীনস্তক্রমতা ছিল নিম্নরূপ: সম্রাট→ বংশপরম্পরায় ভূ-অভিজাত→ শক্তিশালী পরিবারসমূহের ভূ-মালিকানা→ বাণিজ্যিক ভূ-মালিক।... সেইসাথে মাঝারি ও ক্ষুদ্র ভূ-মালিক" (দেখুন, ৪২, পৃ. ১৬৮, ১৭২), এবং "কুইন-হান্ যুগে কৃষকেরা (রেজিস্টিকৃত কৃষক) কৃষি রাজস্ব ও বিভিন্ন ধরনের মাথাপিছু ধার্যকৃত করের (poll tax) সাথে সাথে বেগার শ্রমদান ও সামরিক কাজে সেবাদানে বাধ্য থাকত। অভিজাতদের নিমিত্তে কৃষকদের প্রদেয় এই ভূমি-রাজস্ব হলো রাষ্ট্রীয় করেরই অন্য রূপমাত্র। এই ভূমি রাজস্ব দেওয়া হতো পণ্যরূপে এবং মাথাপিছু ধার্যকৃত কর হলো বেগার শ্রমের অপর রূপ" (দেখুন, ৪২, পৃ. ২০, ১৭২-১৭৩)।

"হান্" আমলে প্রবর্তিত রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে ভাগচাষ প্রথার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে তান্ সাম্রাজ্যে (খ্রীষ্টাব্দ ৬১৮-৯০৭)। সুতরাং "রাষ্ট্রীয় ভূ-মালিকানার" নিয়ামক ভূমিকার প্রশ্নে তান্ আমলের ভূমিব্যবস্থা বিশেষ বিশ্লেষণের দাবিদার। তবে এক্ষেত্রেও মনে রাখতে হবে যে,

প্রথমত, ভাগচাষের অর্থ ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমানাধিকার নয় (অভিজাত ও আমলাদের ভাগ সাধারণ কৃষকদের ভাগের চেয়ে বহু গুণ বেশি);

দ্বিতীয়ত, ভাগচাষ কোনোক্রমেই ভূমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানাকে দূরীভূত করেনি। উল্লেখ্য, "তান্" আমলে ভাগচাষ প্রথার আয়ুষ্কাল ১৫০ বছরের অধিক নয়। কারণ ভাগচাষের জন্য ভূমি বিতরণের নির্দিষ্ট সময়ান্তে উত্তরাধিকারস্বত্ব ও ভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার শর্তসহ সম্পূর্ণ ব্যক্তিমালিকানা পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইতিমধ্যে খ্রীষ্টাব্দ সপ্তম শতকের মাঝামাঝি নাগাদ

"তান্" সাম্রাজ্যের ঐক্য বিনষ্ট হয় এবং সাধারণ কৃষকদের ভোগাধিকারভুক্ত জমি আইনের মাধ্যমে জমিদারদের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

প্রাক্-পুঁজিবাদী চীনে তিন হাজার বছরে আর্থসামাজিক ব্যবস্থার ভিত্তিকাঠামোর প্রধান উৎপাদন উপাদান ভূ-মালিকানা ও তৎসম্পর্কিত বিষয়ে প্রধান যেসব পরিবর্তন লক্ষ করা যায়, সেগুলো ঐতিহাসিক ক্রমানুযায়ী নিম্নরূপ:

১. খ্রীষ্টপূর্ব একাদশ শতকে "চৌ"দের দ্বারা "সান্" সাম্রাজ্য দখল ও ভূমি-পুনর্বণ্টন;

২. খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-চতুর্থ শতকে অর্থনৈতিক সংস্কার, ফলাফলে ব্যক্তিমালিকানার প্রবৃদ্ধি ও গোষ্ঠীর বিলুপ্তি প্রক্রিয়ার ত্বরান্বয়ণ;

৩. খ্রীষ্টাব্দ তৃতীয়– সপ্তম শতকে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গোষ্ঠী ও ব্যক্তিমালিকানাধীন ভূমি বণ্টনের মাধ্যমে ভাগচাষ প্রথা প্রবর্তনের পদক্ষেপ;

৪. খ্রীষ্টাব্দ অষ্টম শতকে ভাগচাষ প্রথার বিলুপ্তির মাধ্যমে বৃহৎ ভূস্বামীদের আবির্ভাব;

৫. খ্রীষ্টাব্দ ত্রয়োদশ শতকে মঙ্গোলীয়দের চীন বিজয়ের পর রাষ্ট্রীয় ভূ-তহবিলের সম্প্রসারণ; এবং

৬. খ্রীষ্টাব্দ পঞ্চদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্যক্তিমালিকানা ও পণ্য-অর্থ সম্পর্কের উত্তরোত্তর বিস্তৃতি।

সুতরাং, এতক্ষণের আলোচনা ভিত্তিকাঠামোর বৈশিষ্ট্যের দৃষ্টিতে প্রাক্-পুঁজিবাদী চীনের বিকাশ তথাকথিত "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতির" অস্তিত্বের বিপরীতে মার্কসীয় "আর্থসামাজিক ব্যবস্থার" তত্ত্বকেই সঠিক প্রমাণিত করে। কারণ–

প্রথমত, যদিও চৈনিক ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে (যেমন বিদেশিদের দ্বারা চীন জয় অথবা কৃষক যুদ্ধ) কৃষিতে ব্যক্তিগত খাতের তুলনায় রাষ্ট্রায়ত্ব খাতের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়, তথাপি খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতক থেকে ১৯৪৬-১৯৫২-র কৃষি বিপ্লব পর্যন্ত চীনে জমিদারদের উত্তরাধিকারস্বত্ব ও ক্রয়-বিক্রয়ের অধিকারসহ বৃহদায়তন ভূ-মালিকানা বহাল ছিল।

দ্বিতীয়ত, উল্লিখিত তথ্যাবলী থেকে সুস্পষ্ট যে, প্রত্যেক ঐতিহাসিক যুগে উৎপাদনের প্রধান উপায়– ভূমির ওপর মালিকানার দৃষ্টিতে রাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রের ভূমিকা হ্রাস পাচ্ছে এবং সেইসাথে তুলনামূলক দীর্ঘকালব্যাপী ব্যক্তিগত মালিকানা বিকশিত হচ্ছে। পরবর্তী ধাপে আর্থসামাজিক সংঘাতের ফলে আবারও রাষ্ট্রীয় ভূমিকা গুরুত্ব পাচ্ছে। শুধু তা-ই নয় চীনা ইতিহাসে ভূ-মালিক হিসেবে রাষ্ট্রের তুলনায় ব্যক্তিগত খাতটি দীর্ঘস্থায়ী। সংঘাত পর্বে ব্যক্তিমালিকানা বিলুপ্ত হচ্ছে না, তার শুধু রূপ পরিবর্তন ঘটছে। রাষ্ট্রিক মালিকানা শুধু সামাজিক সংঘাত ও বিদেশি দখলদারদের আমলেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সুতরাং উল্লিখিত বিকাশচক্রদ্বয়কে উৎপাদনের উপায়ের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানাখাতের বিকাশেরই দুটি স্তর হিসেবে দেখা সম্ভব। প্রথম চক্রের শুরুতে রাষ্ট্রীয় খাতের গুরুত্ব স্বাভাবিক প্রক্রিয়া; কারণ, আদিম সাম্যবাদী ব্যবস্থা পরবর্তী আর্থসামাজিক ব্যবস্থায় উত্তরণের সময় ব্যক্তিগত খাতের বিকাশ থাকে সর্বনিম্ন মাত্রায়। উপরন্তু সেটা থাকে সামাজিক সম্পত্তির আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত। পরবর্তী ধাপসমূহের শুরুতে রাষ্ট্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণ সম্ভবত ব্যক্তিগত মালিকানার রূপ পরিবর্তন ঘটে। এই ধাপে রাষ্ট্র একশ্রেণির শোষকের হাত থেকে অন্য শ্রেণির শোষকের হাতে ভূ-সম্পত্তি হস্তান্তরের মাধ্যম হিসেবে ভূমিকা পালন করছে মাত্র (সেইসাথে তা হচ্ছে আর্থসামাজিক ব্যবস্থা পরিবর্তনের বাহক)।

তৃতীয়ত, আলোচিত কালপর্বে শ্রমশক্তির মালিকানার বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে তথ্যের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও যা বলা সম্ভব তা হলো এই যে, অন্তত খ্রীষ্টাব্দ প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত চীনে দাসশ্রম বিকাশ লাভ করেছিল এবং পরবর্তী সময়ে দাসশ্রম ও দাস-সমতুল্য শ্রমশক্তি ক্রমান্বয়ে 'সাধারণ মানুষ' ও 'কৃষকে' রূপান্তরিত হয়, অতীতের ভূ-কর্ষণকারী স্বাধীন গোষ্ঠীকৃষক ও দাসদের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয় সেই 'নির্ভরশীল কৃষকশ্রেণি', যারাই হলো মধ্যযুগীয় চীনের প্রধান উৎপাদনশীল শ্রেণি (দেখুন, ১৭, পৃ. ২১৮)।

সুতরাং প্রাক্-পুঁজিবাদী চীনের ভিত্তিকাঠামোসংক্রান্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে,

প্রথমত, যেমন ভূ-মালিকানা তেমনি শোষণের রূপ পরিবর্তনের বিভিন্ন ধরণ প্রমাণ করে যে, প্রাচীন যুগ থেকে মধ্যযুগীয় চীনে এমন কিছু পরিবর্তন হয়, যা অবশ্যই পরিবর্তনশীল আর্থসামাজিক ব্যবস্থারই পরিচায়ক। এই পরিবর্তনের ভিত্তি হলো ভাগচাষ প্রথা, যার উৎপত্তিকাল খ্রীষ্টীয় তৃতীয়-সপ্তম শতক। সুতরাং এ সময়কালকেই দাস ও সামন্তবাদী আর্থসামাজিক ব্যবস্থার ঐতিহাসিক সীমারেখা হিসেবে গণ্য করা সম্ভব।

দ্বিতীয়ত, পুরাকালীন ও মধ্যযুগীয় চীনে 'রাষ্ট্রীয় খাত→ ব্যক্তিগত খাত→ রাষ্ট্রীয় খাত→ ব্যক্তিগত খাত' ধরনের বিকাশটি সাধারণ চক্রিয় নয় শঙ্খবৃত্তাকার ঊর্ধ্বমুখী বিকাশেরই লক্ষণ। কারণ, অত্যন্ত শক্তিধর গোষ্ঠীসম্পর্কের শক্তিশালী উচ্ছিষ্ট ও বিকাশমান দাস শোষণপদ্ধতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজ উত্তরিত হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থায়, যেখানে শোষণের চরমতম রূপসমূহ তুলনামূলকভাবে উচ্ছেদিত হচ্ছে এবং স্বাধীন কৃষক রূপান্তরিত হচ্ছে নির্ভরশীল কৃষকে। পরবর্তী সময়ে দাসব্যবস্থার বিকাশ পরিপূর্ণতা লাভ করেনি। অতঃপর শোষণের অন-অর্থনৈতিক রূপের ভিত্তিতে তার অর্থনৈতিক রূপটি অধিকতর দ্রুতগতিতে বিকশিত হয়েছে।

ঘ. প্রাক্-পুঁজিবাদী চীনে উপরিকাঠামো: "সেন্‌সি"-রাষ্ট্র, মতাদর্শ ও দর্শন

১. "সেন্‌সি"-রাষ্ট্র

যেসব সমাজবিদ পুরাকালীন চীনে এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতির অস্তিত্ব প্রমাণ করেন, তারা তাদের বক্তব্যের সমর্থনে বিশেষ শাসকশ্রেণি "সেন্‌সি"র উপস্থিতিকে দ্বিতীয় প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। এ বিষয়ে উল্লিখিত চীন বিশারদেরা যেসব প্রত্যয় ব্যবহার করেন, সেগুলো হলো "ফেনোমেন সেন্‌সি", "সেন্‌সির গোপন তথ্য" ইত্যাদি। তাদের মতে, প্রাক্-পুঁজিবাদী চীনের ব্যাপক ঐতিহাসিক কালপর্বে

সম্পদ অথবা উৎপাদনের উপায়ের ওপর মালিকানা নয় বরং উচ্চশিক্ষার ডিগ্রিই সমাজে "সেন্-সি"দের ক্ষমতাভিত্তি হিসেবে কাজ করত।

"সেন্সি" কী? চিত্রলিপি "সেন" অর্থ "কোমরবন্ধ", যা ক্ষমতার পরিচায়ক। "সেন্" পদবি তারাই অর্জন করত, যারা রাষ্ট্রীয়ভাবে আয়োজিত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ও কৃতকার্য হওয়ার পরে বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুগে বিভিন্ন নামে পরিচিত যেমন "সিয়ান সেন্" অর্থাৎ গ্রামীণ ক্ষমতা; অথবা 'জুলিন্' অর্থাৎ কনফুসিয়ান। আর আধুনিককালে অতিপরিচিত "সেন্সি" হলো "সি" অথাৎ 'বিজ্ঞানী ব্যক্তিত্ব' ও "সেন্" অর্থাৎ 'ক্ষমতার বেল্ট'-এর সাথে সংযুক্তি। আধুনিককালে দুই ধরনের "সেন্সি"র কথা বলা হয়ে থাকে; লিয়েসেন্ অর্থাৎ প্রতিক্রিয়াশীল "সেন্সি" এবং 'কাউমিন সেন্সি' অর্থাৎ 'প্রগতিশীল "সেন্সি" অর্থাৎ সেইসব প্রগতিশীল জমিদার, যারা চীনা প্রাক্-বিপ্লবকালে পুঁজিবাদী পথে কৃষিবিকাশের সমর্থক ছিলেন। উল্লেখ্য, পশ্চিমা সাহিত্যে ব্রিটিশ "জেনট্রি" ও চীনা 'সেন্সি'কে সমার্থক ধারণা হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। বাস্তবত, ব্রিটিশ "জেনট্রি"র সরাসরি ভিত্তি হলো সম্পদ ও ভূমির ওপর মালিকানা আর চৈনিক 'সেন্সি'র অর্থনৈতিক ভিত্তি ব্রিটিশ "জেনট্রি"দের মতো ততটা সুস্পষ্ট নয় (বিস্তারিত দেখুন, ১৬, পৃ. ১৫-৩২)।

ঐতিহাসিক তথ্যে প্রমাণিত যে পুরাকালীন ও মধ্যযুগীয় চীনের সমগ্র পর্বজুড়েই যে "সেন্সি"দের অস্তিত্ব ছিল তা সঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে "সেন্সি" ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে খ্রীষ্টাব্দ প্রথম শতকে। আর খ্রীষ্টাব্দ সপ্তম থেকে দশম শতকে, যখন থেকে রাষ্ট্রীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা আমলাতান্ত্রিক পদমর্যাদা প্রাপ্তির জন্য অত্যাবশ্যকীয় শর্ত হিসেবে দেখা দেয়, তখন থেকেই "সেন্সি"রা বিশেষ সুবিধাভোগী স্তর হিসেবে গণ্য হতে থাকে। "তান্" রাজবংশের দ্বিতীয় সম্রাট লি-সিমিন্ (খ্রীষ্টাব্দ ৬২৬-৬৪৯) রাজ্য পরিচালনায় বুদ্ধিজীবী শ্রেণিকে আকৃষ্ট করার ব্যাপারে বিশেষভাবে মনোযোগী ছিলেন; দুই স্তরবিশিষ্ট মিনজিং ও জিং-সি ডিগ্রির প্রচলন তারই আমলে (দেখুন, ৪২, পৃ. ২১০-২১১)। সুন্ ও মিন্ সাম্রাজ্যে (যথাক্রমে খ্রীষ্টাব্দ দশম-দ্বাদশ ও চতুর্দশ-সপ্তদশ শতক) সেন্সির বিকাশ ঘটে সর্বোচ্চ মাত্রায়। আর মঙ্গোলীয় "ইউআন্" আমল (খ্রীষ্টাব্দ ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতক) হলো "সেন্সি"দের পতনের যুগ।

উল্লেখ্য, চীনের আর্থসামাজিক ইতিহাসে সেন্সিরা কোনো সময়ই শাসকশ্রেণির একক প্রতিনিধি ছিল না। এমনকি চীনে যখন আমলা পদের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ব্যাপক রূপ পরিগ্রহ করে সেই মিন্ সাম্রাজ্যেও আত্মীয়স্বজন ও অভিজাতরাই বংশপরম্পরায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকাঠামোর সর্বোচ্চ পদসমূহে (সম্রাটের পর) অধিষ্ঠিত

থাকত। আর মাঞ্চুরিয়ানদের চীন দখলের পর উল্লিখিত পদসমূহের অধিকাংশ ও তৎপরবর্তী গুরত্বপূর্ণ পদসমূহ মাঞ্চুরীয় অভিজাতেরাই দখল করে বসে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকাঠামোর দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের আমলার পদসমূহ বণ্টিত হতো সেন্‌সিদের মধ্যে এবং তাদের সংখ্যা ছিল কয়েক হাজার। উল্লেখ্য, অধিকাংশ সেন্‌সিই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে উচ্চতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করত। উচ্চতর যোগ্যতা অর্জনে যেসব বিষয়ে জ্ঞানার্জন ছিল অত্যাবশ্যক সেগুলো হলো: দর্শনশাস্ত্র, রাজনীতি, যুদ্ধবিদ্যা, প্রযুক্তি ও পুরাকালীন অভিজ্ঞতার সারবস্তু। মধ্যযুগের শেষের দিকে অর্থ দিয়ে উচ্চতর ডিগ্রি ক্রয় করা সম্ভব ছিল। অবশ্য এই ডিগ্রিপ্রাপ্তদের মান-মর্যাদা তুলনামূলক স্বল্প। সাধারণত হঠাৎ করে ধনী হয়ে যাওয়া ব্যক্তিরাই এই ডিগ্রি ক্রয় করতেন এবং আশা করতেন, যেন তাদের বংশধররা ভবিষ্যতে শিক্ষার সব স্তর পার হয়ে সত্যিকার সেন্‌সির মর্যাদা পায়। অতীতের আমলা ও আমলাদের আত্মীয়স্বজনও সেন্‌সি গোষ্ঠীভুক্ত বলে বিবেচিত হতো।

রাজধানী, অঙ্গরাজ্যের কেন্দ্রস্থলসহ প্রশাসনিক বিভাগসমূহে শাসকশ্রেণির প্রতিনিধি হিসেবে সেন্‌সিরা অবস্থান করত। প্রত্যেক প্রশাসনিক বিভাগে কয়েক শত সেন্‌সি বাস করত। সেন্‌সিদের সাংগঠনিক কেন্দ্র হলো 'সে সি-ইউ-এ' অর্থাৎ একধরনের বিশেষ 'কম্যুনিটি সেন্টার', যা যুদ্ধকালীন অবস্থায় সৈন্য সংগ্রহকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো। যেসব আমলা কেন্দ্র থেকে আসতেন স্থানীয় 'সে সি ইউ-এ'র অন্তর্গত সেন্‌সিরাই ছিল তাদের ভরকেন্দ্র। কেন্দ্রাগত আমলারা স্থানীয় অবস্থা ও ভাষাগত জটিলতা সম্পর্কে প্রায়শ অবগত থাকতেন না। কেন্দ্রাগত আমলা কর্তৃক কোনো ব্যক্তিকে শক্তি হিসেবে জেলে প্রেরণের নির্দেশ অথবা অন্য যেকোনো ধরনের শাস্তির জন্য সেন্‌সির স্বাক্ষরিত একখানা কাগজই ছিল যথেষ্ট। কৃষিতে সেচকার্য দেখাশোনা করাসহ সেন্‌সিরা যেসব দায়িত্ব পালন করত তা হলো– রাজস্ব সংগ্রহ ও যুদ্ধ অথবা কৃষক বিদ্রোহের সময় সেনাবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধিতে সম্রাটকে সহায়তা করা ইত্যাদি।

বৌদ্ধ ধর্ম, কনফুসীয় মতবাদ ও দাওসি মতবাদের মিশ্র রূপ হলো চীনের চিরাচরিত ধর্ম। আর কনফুসীয় মতবাদ– প্রাক্-পুঁজিবাদী চীনের অধিকাংশ সময়ের স্বীকৃত সরকারি মতবাদ। সেন্‌সিরাই শত ধরনের গোঁড়ামী, চিরায়ত ধ্যানধারণাসংবলিত জ্ঞানসহ কনফুসীয় মতবাদের বাহক। সাধারণ সৈনিকদের তুলনায় সেন্‌সিদের দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়েও যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষণীয়। সেন্‌সিরা যথেষ্ট মাত্রায় আয়কর মওকুফ পেতেন। তাদের পোশাকও ছিল ব্যতিক্রমী। পুরাকালে সেন্‌সিদের কোমরে থাকত চওড়া কটিবন্ধ, পরবর্তীকালে তাদের মাথায় থাকত লম্বা চোঙাওয়ালা

বৃহৎ টুপি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সেন্‌সিদের বাহ্যিক পরিচিত বাহক হলো হয় লম্বা গাউন অথবা নীল কলারযুক্ত একধরনের কোট-প্যান্ট।

সেন্‌সিদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অংশগ্রহণ। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটিই প্রধান। কারণ উচ্চশিক্ষার যোগ্যতাসম্পন্ন সবাই সেন্‌সি পদমর্যাদার অধিকারী ছিল না। যেমন 'সিদাফু' অর্থাৎ বিজ্ঞানী-বুদ্ধিজীবী, যারা ক্ষমতার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত নয়। আবার এমনও ছিল, যখন উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতাহীন ব্যক্তি রাষ্ট্রক্ষমতার কাছাকাছি অবস্থান করত। যেমন অতীতের আমলাদের আত্মীয়স্বজন (যারা উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ছিল না)। উল্লেখ্য, যদিও ১৯০৫ সালে চীনা সম্রাট পুরাতন পরীক্ষাপদ্ধতি বাতিল ঘোষণার মাধ্যমে অতীতের উচ্চতর শিক্ষাগত ডিগ্রি বাতিল ঘোষণা করলেন, তথাপি ১৯৪৯ সাল নাগাদ সাধারণ্যে "সেন্‌সি" ধারণাটি প্রচলিত ছিল। সুতরাং সেন্‌সি যতটুকু উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতার ব্যাপার নয় ততোধিক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ব্যাপার, আর পুরাতন চীনে "রাষ্ট্রক্ষমতা ও শিক্ষা" প্রায় সমার্থক ধারণা হিসেবেই স্বীকৃতি পেত।

প্রাক্-পুঁজিবাদী চীনে যারা উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনের জন্য পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতো, তাদের দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা সম্ভব। 'প্রথম ধরনের' শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষার কেবল প্রথম পর্ব অতিক্রম করতে সক্ষম হতো। তাদের বলা হতো "সেনুআনিয়" অথবা "সুশাইয়া"। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ উচ্চতর শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের শতকরা ৯০ জনই হলো 'সুশাই' গোষ্ঠীভুক্ত (প্রায় ১০ লক্ষ)। 'সেনুআনিয়া' ডিগ্রিধারী আমলা পদের যোগ্য বিবেচিত অনেকেই গোষ্ঠীসেবামূলক চাকরি অথবা শিক্ষকতায় নিয়োজিত থাকত। শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত 'সুশাই'দের বাৎসরিক গড় আয় ছিল ১০০ লিয়ান (তৎকালীন চীনা মুদ্রার একক)। সুশাইদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরাই ছিলেন সেন্‌সি গোষ্ঠীর প্রকৃত প্রতিনিধি। তাদের "গুনসেন্, সিজিওজিনি এবং জিন্‌সি" নামে আখ্যায়িত করা হতো। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ এই গ্রুপের সংখ্যা ছিল প্রায় ১১ হাজার। তাদের গড় বাৎসরিক আয় প্রথমোক্তদের তুলনায় প্রায় ৫৪ গুণ অধিক (৫,০০০ লিয়ান)। দ্বিতীয় গ্রুপের প্রকৃত সেন্‌সিদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তারা শুধু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতারই বাহক নয় সেই সাথে বৃহৎ ভূস্বামীও। যেহেতু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাই সেন্‌সিদের প্রকৃত পরিচিতিবাহক। সুতরাং সুশাই অথবা সেনুআনিয়ারা কোনোক্রমেই "সেন্‌সি" নয়। বিখ্যাত চিন বিশারদ হু পিনু-টি-এর মতেও সুশাইদের সেন্‌সি গোষ্ঠীভুক্ত বিবেচনা করা সঠিক নয়; তা প্রকৃত অবস্থাকে বিকৃত করে (দেখুন, ১৩)।

চীন বিশারদ চান-চুন্-লির মতে, অধিকাংশ সেন্সিই ছিল বৃহৎ ভূস্বামী। তাদের কৃষি আয়ের পরিমাণ গড়ে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রদেয় আমলাদের বেতনের প্রায় সমান। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মোট আবাদি জমির শতকরা ২৫ ভাগ অথবা ২২৫ মিলিয়ন মু (১০০ মু = ৪২ একর) জমির মালিকানা ছিল সেন্সিদের হাতে, যার মধ্যে ২০০ মিলিয়ন মু-এর জমির মালিক হলো ৩০-৬০ হাজার সেন্সি (এখানে কিছু সুসান্ও অন্তর্ভুক্ত); আর বাকি ২৫ মিলিয়ন মু-এর মালিক ছিল কয়েক লক্ষ সুশাই। এদের চান্-চু-লি "নিচু স্তরের সেন্সি" হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন (দেখুন ৩০-৩১)। উল্লেখ্য, সমসাময়িককালের প্রায় ৬ লক্ষ শিক্ষকের জন্য শিক্ষকতা পেশাই ছিল আয়ের প্রধান উৎস। সুতরাং প্রাক্-পুঁজিবাদী চীনে রাষ্ট্রীয় আমলাতান্ত্রিক পদমর্যাদা ও কৃষিভূমির মালিকানাসহ সেন্সি এবং শাসকগোষ্ঠীর সেবক, কিন্তু সরাসরি আমলা নয় এমন সুশাইয়া গ্রুপভুক্ত সাধারণ বুদ্ধিজীবীর সমার্থক ধরে নেওয়া সঠিক নয়। উল্লিখিত দুই গ্রুপের মধ্যে রাজনৈতিক-অর্থনীতিগত দিক থেকে সুস্পষ্ট সীমারেখা বিদ্যমান।

সুতরাং সেন্সিরা যেমন ছিল একাধারে অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী (ভূ-মালিক), তেমনি অন্যদিকে অন-অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগের হাতিয়ারেরও বাহক (যেমন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকাঠামোর কাছাকাছি অবস্থান; ক্ষমতার নিকটতম হওয়ার উপায় হিসেবে শিক্ষাগত যোগ্যতা; শাসকগোষ্ঠীর মতাদর্শের একচেটিয়া বাহক ইত্যাদি)। উল্লেখ্য, সেন্সিরা স্থানীয় ক্ষমতার বাহক। অর্থাৎ পুরাকালীন চীনের তুলনায় মধ্যযুগীয় চীনে রাষ্ট্রক্ষমতার অপেক্ষাকৃত স্বল্প কেন্দ্রায়ন এবং ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসনের গুরুত্ব বৃদ্ধি অর্থাৎ মধ্যযুগীয় চীনে সেন্সিদের গুরুত্ব বৃদ্ধি। ইউরোপীয় সামন্ত যুগে গীর্জাভিত্তিক শাসকদের তুলনায় সেন্সিদের মতাদর্শগত পার্থক্য হলো এই যে, কনফুসীয় মতবাদে পুষ্ট সেন্সিরা চিরাচরিত ধর্মীয় উপাদানের পরিবর্তে নীতিশাস্ত্রকে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করত।

উল্লিখিত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, চীনের চিরাচরিত ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্বে আবির্ভূত প্রচুরসংখ্যক সেন্সি যত জটিল প্রক্রিয়ারই বাহক হোক না কেন, তারা ছিল প্রাক্-পুঁজিবাদী চীনে শাসকশ্রেণির একটি অংশমাত্র। আর সম্রাটের আত্মীয়স্বজনসহ স্বল্পসংখ্যক বংশগত অভিজাতরা সেন্সিদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত উচ্চতর পদমর্যাদায় আসীন থাকতেন। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ভূ-মালিক অষ্টতারকাখচিত মাঞ্চুরীয় যোদ্ধারাও প্রাক্-পুঁজিবাদী চীনে (মাঞ্চুরীয় সাম্রাজ্যে) রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদার প্রশ্নে সেন্সি-পরবর্তী সুবিধাভোগী স্তর হিসেবে পরিগণিত হতো। তৎপরবর্তী স্তরের বাহক হলো সুশাইয়ারা। অর্থাৎ প্রাক্-পুঁজিবাদী চীনে রাষ্ট্রক্ষমতার বাহকদের

অধীনস্থক্রমানুযায়ী বন্দোবস্তটা মোটামুটি নিম্নরূপ: সম্রাট→ সম্রাটের আত্মীয়স্বজনসহ বংশগত অভিজাত গোষ্ঠী→ সেন্‌সি→ অষ্টতারকাখচিত মাঞ্চুরীয় যোদ্ধাগোষ্ঠী→ গোষ্ঠীসেবক 'সুশাইয়া'। তদুপরি ঊনবিংশ শতাব্দীতে উল্লিখিত কয়েকটি সুবিধাভোগী স্তরের বাইরে আরও একটি স্তরের উল্লেখ করা সম্ভব, তারা হলো তখনো উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত নয় অথচ কৃষকদের মধ্যে থেকে গজিয়ে ওঠা স্থানীয়ভাবে প্রতিপত্তিশালী ব্যাপক শোষকশ্রেণি "তামাটে অভিজাত"। বিংশ শতাব্দীতে (১৯৪৯ সাল নাগাদ) এদের বলা হতো "তুখাও" অর্থাৎ স্থানীয় লুটেরা। বিংশ শতাব্দীতে "তুখাও'রা "সেন্‌সি"দের সমতুল্যে রূপান্তরিত হয়। আর সাধারণ মাঝারি কৃষক ও বৃহৎ ভূস্বামীদের মধ্যবিত্ত স্তরকে বিংশ শতাব্দীতে বলা হতো "ফুনুন্" অর্থাৎ ধনী কৃষক।

রাজনৈতিক-অর্থনীতিবিদদের কেউ কেউ আবার "রাষ্ট্রই শ্রেণি" ধারণাটি প্রবর্তনের মাধ্যমে প্রমাণে সচেষ্ট হন যে, সেন্‌সিরা সেই ধরনের সমাজের আদর্শ প্রতিনিধি, যেখানে রাষ্ট্রের প্রশাসনযন্ত্র ও শাসকশ্রেণি সমার্থক এবং রাষ্ট্রই একমাত্র শোষক (দেখুন, ১৬)। আর এ ধারণা যে ভ্রান্ত তা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত। কারণ, সেন্‌সিদের সবাই রাষ্ট্রক্ষমতার অঙ্গীভূত ছিল না, ছিল না রাষ্ট্রীয় আমলা পদের অধিকারী। সেইসাথে এটাও সত্য যে, বংশপরম্পরায় অভিজাতরাই ছিল উচ্চপদস্থ সরকারি আমলাদের প্রধান বাহক। আবার এও সত্য যে, সেন্‌সিরা রাষ্ট্রক্ষমতাবহির্ভূত হয়ে বিকশিত হতে অক্ষম। সেন্‌সিরা সরকারি প্রশাসনযন্ত্রের ভিত্তি ও "রিজার্ভ আর্মি" হিসেবে পরিগণিত হতো। এটাও সত্য যে, চৈনিক সমাজে সেন্‌সিরাই একমাত্র শোষক ছিল না এবং শোষকদের সবাই যে সরকারি প্রশাসনযন্ত্রের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত তা-ও নয়।

২. মতাদর্শ ও দর্শন

প্রাক্-পুঁজিবাদী চীনে মতাদর্শগত দিক থেকে যেসব দার্শনিক ধারার গুরুত্ব সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য, সেগুলো হলো: "কনফুসীয়", "দাওসি", "মোইজম", "আইনবাদ" ও "বৌদ্ধধর্মীয়" মতাদর্শ।[৪৬] চীনে মতাদর্শগত সংকটের কালপর্ব হলো মোটামুটিভাবে

[৪৬] "কনফুসীয়" মতবাদ মানবতা ও নৈতিকতাসংক্রান্ত ধারণার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হলেও "কনফুসীয়"রা মনে করতেন যে, রাষ্টপরিচালক হলো পিতা আর জনগণ তার সন্তান। অন্যদিকে 'মোইস্টরা' হলো আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পক। তাদের ধারণায় আদর্শ রাষ্ট্র হলো সেই রাষ্ট্র, যেখানে 'সবাই সমান'। "দাওসি" মতবাদের প্রবক্তাদের মতে, তারা মানুষ ও মনুষ্যসমাজ-সংক্রান্ত বিকাশধারার বাহক ('দাও' অর্থ পথ)। 'আইনবাদীরা' পুরাকালীন ও মধ্যযুগে সবচেয়ে' প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যানধারণার বাহক। আইনবাদী ধ্যানধারণার অন্যতম প্রবক্তা হলেন সান্ ইয়ান্, যিনি বলতেন "পুস্তক আগুনে ফেল, আর বিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবীদের কবরে পাঠাও" ("ফেন সু কেন্

খ্রীষ্টীয় তৃতীয় থেকে সপ্তম শতক পর্যন্ত। আর এ বিষয়ে উত্তরণকাল আরো বিস্তৃত, তা হলো খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতক থেকে খ্রীষ্টাব্দ দ্বাদশ শতক পর্যন্ত। এ সময়েই বৌদ্ধ দর্শনের প্রসার ও তার সাথে সংস্কারযুক্ত কনফুসীয় ও দাওসি মতবাদের সম্মিলনে একক 'যুগপৎ' ধর্মের অভ্যুদয় ঘটে। বিখ্যাত গবেষক বার্নালের মতে, চীনে ব্রোঞ্জ যুগ থেকে লৌহ যুগে অনুপ্রবেশের ফলে মতাদর্শগত যে শূন্যস্থান সৃষ্টি হয়, উল্লিখিত মতাদর্শসমূহ কোনো না কোনোভাবে হয় তৎকালীন শোষণব্যবস্থার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করত অথবা সমসাময়িক শাসনপদ্ধতির সমালোচনার মাধ্যমে নতুন ধরনের শোষণপদ্ধতি চালুর ফর্দ দিত (বিস্তারিত দেখুন, ১১, পৃ. ৩৩-৩৫; ১৮, পৃ. ১৫-৩৬; ৩১, পৃ. ৭০-৭১; ৭৯-৯৭)। উল্লেখ্য, কনফুসীয় ও দাও মতবাদ খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম দশকে হান্ আমলেই নতুন ধর্মীয় কাঠামোর ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সেইসাথে রাষ্ট্রক্ষমতা ও বলপ্রয়োগসংক্রান্ত চরম প্রতিক্রিয়াশীল আইনবাদী "সান্-ইয়ান" মতবাদও (সিন্ সম্রাটের উপদেষ্টা সান্-ইয়ান) কিছুটা পরিবর্তন ও পরিবর্ধনসহ সংস্কারযুক্ত কনফুসীয় মতবাদের সাথে সংযুক্ত হয়। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের দিকেই উল্লিখিত মতাদর্শধারার সাথে সম্পৃক্ত হয় ভারতাগত প্রথম বিশ্বধর্ম– বৌদ্ধধর্ম। উল্লেখ্য, খ্রীষ্টীয় নবম শতক থেকে চীনে (মঙ্গোলীয়দের আগ্রাসনকাল ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতক ব্যতীত) বৌদ্ধধর্মের পরিবর্তে কনফুসীয় মতবাদই সরকারি মতাদর্শ হিসেবে স্বীকৃতি পেত। আর সামাজিকভাবে গৃহীত মতাদর্শ বা ব্যাপক জনগোষ্ঠীর একক ধর্ম ছিল উপরোল্লিখিত 'যুগপৎ ধর্ম' (যা মূলত কনফুসীয়, দাওসি মতবাদ ও বৌদ্ধ ধর্মের মিশ্র রূপ)।

সুতরাং প্রাক্-পুঁজিবাদী চীনে মতাদর্শ ও দর্শন বিকাশের ক্ষেত্রেও গুণগতভাবে একই ধরনের স্তর বিন্যাস করা সম্ভব, যা উৎপাদনের উপায়ের ওপর মালিকানা বিশ্লেষণেও অনুভূত হয়। উল্লিখিত স্তর বিন্যাসটি সামাজিক সংঘর্ষের ইতিহাস বিশ্লেষণ-উদ্ভূত উপসংহারের সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ। প্রাক্-পুঁজিবাদী চীনে মতাদর্শ ও দর্শন বিকাশে যে স্তর বিন্যাস করা সম্ভব তা হলো নিম্নরূপ:

জু")। খ্রীষ্টপূর্ব ২১৩ সালে প্রধানমন্ত্রী লি সি এ-মর্মে আইন জারি করলেন যে, কুইন যুগের ঐতিহাসিকদের রচনা-ব্যতীত যা আছে সবকিছু ডিক্রি জারীর ৩০ দিনের মধ্যে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। অন্যথায় শাস্তি হলো মৃত্যু। ডিক্রি জারীর পরেও সমালোচকেরা তাদের সমালোচনাকার্য অব্যাহত রাখলে লি সি প্রায় ৪৬০ জন বুদ্ধিজীবীকে জীবন্ত অবস্থায় সমাধিস্থ করে, (দেখুন, ৪২, পৃ. ১২৬-২৭; ৩৯, ৭১)। আইনবাদীদের মতে, "রাষ্ট্রক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যক্তি নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী, আর জীবনের বৃহৎ থেকে ক্ষুদ্র সব কিছুই আইন দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত" (বিস্তারিত দেখুন, ১১, পৃ. ৭০-৭১, ৭৯-৯৭; ৩৪; ৩৮)।

১. প্রাচীন কাল– এ স্তরের সময়কাল খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দ অথবা প্রাক্-দর্শনকাল। এ সময়ে জনগণের আদিম-সাম্যবাদী ধ্যানধারণা ও দর্শনের সেই ধারার বিকাশ ঘটে, যা ভবিষ্যৎ মতাদর্শগত বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করে।

২. মধ্যযুগ ও প্রাক্-বিপ্লবী নয়া যুগ– এ স্তরের সময়কাল যথাক্রমে খ্রীষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় সহস্রাব্দের প্রারম্ভকাল ও খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় সহস্রাব্দ পর্যন্ত। এ যুগে কনফুসীয়, দাওসি, আইনবাদী ও বৌদ্ধধর্মের সম্মিলনে আবির্ভূত হয় সেই 'যুগপৎ ধর্ম', যা পরে পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

ঙ. প্রাক্-পুঁজিবাদী চীনে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ

প্রাক্-পুঁজিবাদী চীনে উৎপাদনের উপায়ের মালিকানা ও উপরিকাঠামোর বিকাশ-ইতিহাসে যে স্তর বিন্যাস পাওয়া যায় তা কি উৎপাদিকা শক্তি বিকাশ-ইতিহাসের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ? সমাজবিকাশের মার্কসীয় ধারানুযায়ী তা সাযুজ্যপূর্ণ হতেই হবে; কারণ, উৎপাদিকা শক্তির বিকাশই শেষাবধি এক আর্থসামাজিক ব্যবস্থার অন্যটিতে উত্তরণের প্রধান ভিত্তি।

প্রাচীন যুগের চীনের উৎপাদিকা শক্তির বিকাশধারা সম্পর্কে এখন অবধি যা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তার সংশ্লেষিত রূপ হলো এই যে, সান্-ইন্ (খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতক), পশ্চিম-চৌ (খ্রীষ্টপূর্ব দ্বাদশ থেকে অষ্টম শতক), ও পূর্ব-চৌ (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহ– 'লে-গো') আমল হলো 'ব্রোঞ্জ যুগ' ('বৈষম্যের ব্যক্তিগত রূপ')। পরবর্তী পূর্ব-চৌ অথবা 'লে-গো' আমলের শেষাংশ ও পূর্ব-চৌ 'জাং-গো' (অথবা 'লড়াকু রাষ্ট্র') হলো 'লৌহ যুগের' শুরু। খ্রীষ্টপূর্ব একাদশ শতক থেকে মধ্যযুগের শেষাবধি পর্যন্ত চীনে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ অব্যাহত ছিল– এ ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিতর্ক পরিলক্ষিত হয় না। তবে ঐ বিকাশ ছিল বিতর্কমূলক এবং তা কখনো কখনো পশ্চাৎমুখী রূপ পরিগ্রহ করে (যেমন খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ-পঞ্চম শতকে এবং কখনো হান্ সাম্রাজ্যের পতনের পর দুর্বল চীনে বিদেশি বর্বরদের আক্রমণকালে)। কিন্তু লৌহ যুগে প্রবেশের পর যখন লোহার লাঙ্গলসহ কৃষি শ্রমযন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে (খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-চতুর্থ শতক) কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়, তখন থেকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। সমসাময়িককালে দ্রুত মাত্রায় বিকশিত হতে থাকে শহর ও গ্রামের শ্রমবিভাজন, পণ্য-অর্থসম্পর্ক (অর্থের উদ্ভব ঘটে খ্রীষ্টপূর্ব ৫২৪ সালে); কর্ষণযোগ্য অথচ অতীতে চাষাবাদ হতো না এমন জমি অধিক মাত্রায়

আবাদের আওতায় আনা হয়; শহরের প্রবৃদ্ধি ও বাণিজ্যের প্রসার ঘটে এবং ধীরে ধীরে সামাজিক-শ্রেণিগত সংঘর্ষও বিকশিত হতে থাকে (দেখুন ছক ৭)।

প্রাক্-পুঁজিবাদী চীনের ব্রোঞ্জ থেকে লৌহ যুগে প্রবেশের সময়কালকেই কেউ কেউ আর্থসামাজিক ব্যবস্থার উত্তরণকাল হিসেবে গণ্য করে থাকেন। যেমন হো-মো-জো মনে করেন যে, "খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-চতুর্থ শতকে দাস রাষ্ট্রের সামন্তবাদী রাষ্ট্রে উত্তরণ ঘটেছে" (দেখুন, ২৮, পৃ. ৪১)। হো-মো-জো'র এহেন ধারণার সম্ভাব্য প্রধান কারণ হতে পারে এই যে, খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-চতুর্থ শতকে চীনে রাজস্বসংস্কারের সাথে সাথে দর্শনের নতুন ধারা আবিষ্কৃত হয়। তিনি মনে করতেন যে, উৎপাদিকা শক্তি, অর্থনৈতিক ও মতাদর্শগত বিপ্লব একই সাথে ঘটাটাই স্বাভাবিক। অবশ্য প্রাক্-পুঁজিবাদী চীনের সামাজিক সংঘর্ষের প্রধান রূপসমূহের ইতিহাস কোনোক্রমেই হো-মো-জো'র বক্তব্যের স্বপক্ষে প্রমাণ দেয় না। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-চতুর্থ শতকের চীনে কোনো সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত হয়নি। উপরন্তু উৎপাদিকা শক্তির ক্ষেত্রে বিপ্লব ও সামাজিক বিপ্লব কোনো অবস্থাতেই হুবহু একই সময়ে সংঘটিত হয় না। প্রাচীনকালের ক্ষেত্রে এ বক্তব্য ততোধিক সত্য। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, দাস-যুগীয় রোমান সমাজের সামন্ত যুগে প্রবেশের ইতিহাস হলো ৫০০ বছরের সামাজিক শ্রেণিসংঘর্ষের ইতিহাস। সুতরাং, প্রাক্-পুঁজিবাদী চীনে আর্থসামাজিক ব্যবস্থার রূপান্তর খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-চতুর্থ শতকে উৎপাদিকা শক্তির পরিবর্তনের কয়েক বছর পরে ঘটেছে, সেটাই স্বাভাবিক। আর সেটা ঘটেছে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকগুলোর দিকে।

চ. উপরিকাঠামোর পরিবর্তন: অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ ও রাষ্ট্র

প্রাক্-পুঁজিবাদী চীনে উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদনসম্পর্কের ক্ষেত্রে গত তিন হাজার বছরে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তার সংশ্লেষিত রূপের বহিঃপ্রকাশই হলো বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন মাত্রার সামাজিক সংঘর্ষ। আর অন্যান্য বিষয়ে তথ্যের বিপরীতে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও সামাজিক সংঘর্ষবিষয়ক তথ্যের ঘাটতি নেই বলা চলে। এক্ষেত্রে পদ্ধতিতাত্ত্বিক বিবেচনায় প্রধান সমস্যা হলো প্রচুর তথ্য থেকে বিশ্লেষণের জন্য সঠিক তথ্য বাছাইয়ের সমস্যা। আর এ সমস্যা সমাধানের জন্য চীনা ইতিহাসের গত তিন হাজার বছরে সংঘটিত অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও সামাজিক সংঘর্ষপ্রকাশক ঘটনাসমূহ থেকে বেছে নেওয়া হয়েছে প্রধান প্রধান ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থান, গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয় অভ্যুত্থান, সুবিধাভোগী শ্রেণির বিদ্রোহ ও বিদেশি আগ্রাসন (দেখুন, ছক ৭)। উল্লিখিত ব্যাপক গণ-আন্দোলন, গুরুত্বপূর্ণ অভ্যুত্থানসমূহের অধিকাংশই মূলতঃ কৃষক 'আন্দোলনের চরিত্র বহন করে এবং ঐসব সামাজিক সংঘর্ষসমূহের প্রধান লক্ষ্য কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা সম্ভব, যেগুলো হলো: (১) রাজবংশের পতন ঘটানো; (২) ব্যক্তিগত ভূমি

মালিকানার অধিকার আদায়; (৩) ভূস্বামীদের ওপর কৃষকদের যে মুচলেকাবদ্ধতা বা দাসত্ব –তার শর্ত শিথিলকরণ; (৪) "কর্ভি" প্রথা বাতিলকরণ অথবা সৈন্য হিসেবে চাকরির শর্ত শিথিলকরণ; এবং (৫) শাসক শ্রেণির অর্থনৈতিক ও আইনগত সুবিধাদি বিলুপ্ত ঘোষণা করা ইত্যাদি (বিস্তারিত দেখুন, ৪০, পৃ. ১৯৩)। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুবিধাভোগী শ্রেণির বিদ্রোহের প্রধান লক্ষ্য হলো একদল শোষকের অন্য দল শোষকের দ্বারা ক্ষমতাচ্যুত করা এবং নিজেদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রধান বাহকে রূপান্তরিত করা।

প্রাক্-পুঁজিবাদী চীনের সর্বশেষ তিন হাজার বছরের সামাজিক সংঘর্ষের তথ্যের ভিত্তিতে যে সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক বিকাশসূত্র উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব– এ ব্যাপারে বুর্জোয়া ঐতিহাসিকদের অধিকাংশই সন্দেহ পোষণ করেন। এ প্রশ্নে প্রদেয় ছক-৭-এর তথ্যে আপাতদৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয় যে, খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে পরবর্তী পর্যায়ে চীনে প্রায় ২০০ বছর পরপর ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত চীনে প্রায় ৯টি ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থান ও দুবার সুবিধাভোগী শ্রেণির বিদ্রোহের তথ্য জানা যায়। উল্লিখিত সাধারণ গাণিতিক হিসাব থেকে যদিও আর্থসামাজিক দ্বন্দ্বের জটিলতা, গভীরতা ও গুণগত পার্থক্য ইত্যাদি উদ্‌ঘাটিত হয় না, তথাপি যা আঁচ-অনুমান করা যায় তা হলো নিম্নরূপ:

প্রথমত; খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের কৃষক বিদ্রোহ, খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে গোপন সংগান্ "সাদা পদ্মের" নেতৃত্বে গণবিদ্রোহ; ঊনবিংশ শতকে তাইপিনদের বিদ্রোহ ইত্যাদি প্রমাণ করে যে, খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে শতকপ্রতি একটি করে ব্যাপক মাত্রার গণবিদ্রোহ সংঘটিত হতে শুরু করে। আর এই কালপর্বেই চীনের ইতিহাসে শুরু হচ্ছে সেই সংকটকাল (মরণোন্মুখ সামন্তবাদ, ঔপনিবেশিক শোষণ ইত্যাদি), যা ঊনবিংশ শতকের পরে সমাধা হয়;

ছক ৭: প্রাক্-পুঁজিবাদী চীনে গত তিন হাজার বছরে সংঘটিত প্রধান সামাজিক সংঘর্ষসমূহ

সময়কাল	সামাজিক সংঘর্ষের ধরন/প্রকৃতি
খ্রীষ্টপূর্ব (শতক)	
একাদশ	-
দশম	-
নবম	-
অষ্টম	-
সপ্তম	-
ষষ্ঠ	-
পঞ্চম	-
চতুর্থ	-
তৃতীয়	ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থান
দ্বিতীয়	-
প্রথম	-
খ্রীষ্টাব্দ (শতক)	
প্রথম	ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থান
দ্বিতীয়	ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থান
তৃতীয়	বৈদেশিক আগ্রাসন
চতুর্থ	বৈদেশিক আগ্রাসন
পঞ্চম	বৈদেশিক আগ্রাসন
ষষ্ঠ	বৈদেশিক আগ্রাসন

সময়কাল	সামাজিক সংঘর্ষের ধরন/প্রকৃতি
খ্রীষ্টাব্দ (শতক)	
সপ্তম	ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থান
অষ্টম	সুবিধাভোগী শ্রেণির বিদ্রোহ
নবম	ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থান
দশম	বৈদেশিক আগ্রাসন, সুবিধাভোগী শ্রেণির বিদ্রোহ
একাদশ	গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয় অভ্যুত্থান,
দ্বাদশ	বৈদেশিক আগ্রাসন, গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয় অভ্যুত্থান
ত্রয়োদশ	বৈদেশিক আগ্রাসন
চতুর্দশ	ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থান
পঞ্চদশ	-
ষষ্ঠদশ	-
সপ্তদশ	ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থান
	বৈদেশিক আগ্রাসন
অষ্টাদশ	ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থান
ঊনবিংশ	ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থান

উৎস: যেসব উৎসের তথ্যের ভিত্তিতে ছক প্রস্তুত করা হয়েছে সেগুলো হলো ১৭, *পৃ.* ২১৯; ১, *পৃ.* ১৩১-৩৮; ১৪, *পৃ.* ৩-৩২; ৩৫; ৩৬; ৩৪; ৪২; ৩৩; ৩৯।

দ্বিতীয়ত, খ্রীষ্টপূর্ব একাদশ থেকে তৃতীয় শতক পর্যন্ত চীনের ইতিহাসে কোনো ব্যাপক গণবিদ্রোহ ও বিদেশি আগ্রাসন ঘটেছে এমন কোনো সত্যনির্ভর তথ্যের নজির নেই। অর্থাৎ ধরে নেওয়া যায় যে, খ্রীষ্টপূর্ব একাদশ থেকে তৃতীয় শতক পর্যন্ত চীনে বিদ্যমান

উৎপাদনসম্পর্ক সমসাময়িক উৎপাদিকা শক্তির চরিত্র ও বিকাশস্তরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। সুতরাং প্রাক্-পুঁজিবাদী চীনের আর্থসামাজিক ব্যবস্থার উত্তরণসংক্রান্ত ধারণার জন্য বিশ্লেষণ করতে হবে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে (চেন্‌সেন, ও উ-কুয়ান্-এর নেতৃত্বে বিদ্রোহ) খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সামাজিক সংঘর্ষের তথ্যাবলী;

তৃতীয়ত; খ্রীষ্টীয় তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত সংঘটিত বিদেশিদের বর্বর আক্রমণ সম্ভবত এই প্রমাণ করে যে, খ্রীষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে যথাক্রমে 'লাল-ভ্রু' ও 'হলুদ পট্টি'র বিদ্রোহের ফলে (বিস্তারিত দেখুন ৪২, পৃ. ১৪৫-১৬২; ৩৬, পৃ. ২৭৯-২৮২; ১, পৃ. ১৩৬-১৩৮) চীনের অভ্যন্তরীণ অবস্থা এমনই দুর্বল হয় যে তা বিদেশিদের আক্রমণ প্রতিহতকরণে সক্ষম নয়। উপরন্তু, হান্ সাম্রাজ্যের পতনের পর চীনের কেন্দ্রীভূত শক্তিশালী রাষ্ট্র ছোট ছোট বহু রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়; এবং

চতুর্থত; খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় ও প্রথম শতকে এবং খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ এবং ষষ্ঠদশ শতকে চীনে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সংঘর্ষ পরিলক্ষিত হয় না। উল্লিখিত সময়কালকে তৎকালীন আর্থসামাজিক ব্যবস্থার "স্থিতিশীলতার যুগ" বলা হয়। আবার কেউ কেউ খ্রীষ্টীয় দশম থেকে চতুর্দশ শতক পর্যন্ত সময়কালকে উল্লিখিত যুগপর্যায়ের সাথে সংযুক্ত করে থাকেন। শেষোক্তদের যুক্তি অনুযায়ী এমনকি খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থান তৎকালীন শোষণব্যবস্থার বিরুদ্ধে পরিচালিত ছিল না, বরং তার মূল লক্ষ্য ছিল বিদেশি বর্বরদের আক্রমণ প্রতিহত করা (দেখুন, ১৭, পৃ. ২২০)। প্রকৃতপক্ষে সমসাময়িককালে সামাজিক সংঘর্ষ শুরু হয় দেশীয় ও মঙ্গোলীয় ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে, আর শেষাবধি তা মঙ্গোলীয়দের বিরুদ্ধে একটি জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়।

প্রাক্-পুঁজিবাদী চীনের তিন হাজার বছরে পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক কাঠামো, উপরিকাঠামো, উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ও সামাজিক সংঘর্ষসমূহের পরিণতিকে আর্থসামাজিক ব্যবস্থা উত্তরণের দৃষ্টিতে দেখলে বলা যায় যে, ঐতিহাসিক সময়কালের

নিরিখে তা খুঁজতে হবে খ্রীষ্টীয় প্রথম থেকে ষষ্ঠ শতকে (যার মধ্যবিন্দু খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতক)। আর খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের শুরু থেকে তৃতীয় শতক পর্যন্ত সময়কাল হলো চৈনিক আর্থসামাজিক ব্যবস্থার প্রথম স্থিতিশীলতার যুগ এবং খ্রীষ্টীয় নবম থেকে ত্রয়োদশ (এমনকি অনেকের মতে ষষ্ঠদশ) শতক পর্যন্ত দ্বিতীয় স্থিতিশীল যুগ। সুতরাং প্রাক্-পুঁজিবাদী চীনের তিন হাজার বছরে সংঘটিত সামাজিক সংঘর্ষের প্রধান রূপসমূহের বিশ্লেষণে দুই সমাজব্যবস্থার– দাসব্যবস্থা ও সামন্তবাদ-এর নমুনা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। এমনকি সামাজিক সংঘর্ষের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে ব্যবহৃত রাজনৈতিক স্লোগানও (যা মতাদর্শের বাহক) তার সাক্ষ্য বহন করে। যেমন বংশগত সুবিধাভোগী শ্রেণিদের বিরুদ্ধে চীনের প্রথম ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থান (খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক; দেখুন, ছক ৮) ছিল দাসদের অভ্যুত্থান (দেখুন, ১৯, পৃ. ৮৬-৮৭); অভ্যুত্থানকারীদের প্রধান অভিযোগ হলো "সম্রাট; অভিজাত, সেনাধ্যক্ষ ও মন্ত্রীরা কি একটি ভিন্ন মানবপ্রজাতি?" গণ-আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে হান্ সম্রাট লিউ বান্ গোষ্ঠীনেতাদের সাথে এ মর্মে চুক্তি সই করতে বাধ্য হলেন যে, "হত্যার শাস্তি হত্যা (দাসমালিকেরা দাসদের হত্যা করতে পারত– আবুল বারকাত), অন্যকে আহত করা বা অন্যের সম্পত্তি লুণ্ঠন করা– শাস্তিযোগ্য অপরাধ (দাসমালিকেরা দাসদের যথেচ্ছ শাস্তি প্রদান করত– আবুল বারকাত)। পরবর্তী সময়ে "লাল-ভ্রূ" বিদ্রোহীদের প্রধান স্লোগান হলো শুরুর দিকের হান্ সাম্রাজ্যে সামন্তবাদবিরোধী (খ্রীষ্টাব্দ ১৮-২৭ সাল)। তৎপরবর্তী ১৮৪ খ্রীষ্টাব্দের 'হলুদ পাগড়ির' বিদ্রোহ ছিল ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে কৃষকদের শ্রেণিসংগ্রাম কিছুটা ধর্মীয় আদর্শসহ। পরবর্তীকালীন ছয় রাজবংশবিরোধী বিদ্রোহ ও অভ্যুত্থানসমূহ হলো (খ্রীষ্টাব্দ ৩০০ থেকে ৫২৮) সুস্পষ্টভাবে শাসকগোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও কৃষকদের 'কর্ভি' প্রথাবিরোধী আন্দোলনের পরিচায়ক। আর সুই সম্রাটবিরোধী আন্দোলন নিঃসন্দেহে কৃষক সেনাবাহিনীর ব্যাপক ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ (খ্রীষ্টাব্দ ৬১০-৬২৪)। শেষের দিকের তান্ সাম্রাজ্যে ভিক্ষুক ও কৃষকদের বিদ্রোহ হলো সামন্তবাদের উত্তরণকালীন প্রক্রিয়ার বাহক (খ্রীষ্টাব্দ ৮৭৪-৮৮৪)। উল্লিখিত কৃষক আন্দোলনসমূহের তুলনায় উচ্চতর রূপের আন্দোলন সংঘটিত হয় খ্রীষ্টাব্দ দশম শতকে, সান্ আমলে। কারণ এ সময়ের প্রধান স্লোগান ব্যক্তিসত্তাগত-নির্ভরতা নয়, অর্থনৈতিক নির্ভরতাবিরোধী সাম্যের স্লোগান, যা নিঃসন্দেহে সামন্তবাদবিরোধী, সেই সাথে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ (বিদ্রোহের সময়কাল খ্রীষ্টাব্দ ৯৯৩-১১৩৫ সাল)। সমসাময়িক ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থানে অভ্যুত্থানকারীদের মধ্যে যে স্লোগান উদ্বুদ্ধকারক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে তা হলো: "ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান নির্মূল করতে হবে" (দেখুন, ২৫, পৃ. ২২৬, ৩২৬; ৩৬, পৃ. ১৫০-১৫২, ৮৯-৯০)। মঙ্গোলীয়বিরোধী গণ-আন্দোলন যদিও শুরু হয় দেশীয় ও বিদেশি ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে, তথাপি শেষাবধি তা মঙ্গোলীয় ভূস্বামী ও রাষ্ট্রক্ষমতাবিরোধী

সংগ্রামে রূপান্তরিত হয় (খ্রীষ্টাব্দ ১৩৫১-১৩৬০)। আর মিন্ সাম্রাজ্যের বিদ্রোহসমূহ "পড়ন্ত সামন্তবাদের সংকট" বাহকমাত্র (খ্রীষ্টাব্দ ১৪২০-১৫১২, ১৬২৭-১৬৪৫)। ঊনবিংশ শতাব্দীর তাইপিনদের বিদ্রোহ হলো প্রাক্-আধুনিক যুগের সর্ববৃহৎ গণ-আন্দোলন, "গণতান্ত্রিক বিপ্লব।" তাইপিন বিদ্রোহে ১৫ বছরে প্রায় ১ কোটি বিদ্রোহী প্রাণ হারান (খ্রীষ্টাব্দ ১৮৫১-১৮৬৮) আর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবপূর্ব বক্সার আন্দোলন (১৮৯৮ সাল) নিঃসন্দেহে সাম্রাজ্যবাদী বিরোধী আন্দোলনের শুরু, যার পরবর্তীকালে চীনা সমাজে সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদ বিকাশের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তা সাম্রাজ্যবাদের বেষ্টনীতে বিকশিত হয়।

উল্লিখিত তথ্যাদির আংশিক বিশ্লেষণে চীনা ঐতিহাসিক 'সান্ ইউ' এই উপসংহারে উপনীত হন যে, খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত চীনের আর্থসামাজিক ব্যবস্থা হলো প্রধানত "দাসযুগীয়" এবং খ্রীষ্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতক থেকে তা হলো সামন্তবাদী। তিন হাজার বছরে সংঘটিত সামাজিক সংঘর্ষসমূহের গতি-প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশ্লেষণে সুস্পষ্ট যে, প্রাক্-পুঁজিবাদী চীনের ইতিহাসে দুটি স্তর বিদ্যমান অর্থাৎ পুরাকালীন চীন, যা প্রধানত দাসযুগীয় চীন ও মধ্যযুগীয় চীন অর্থাৎ বৈশিষ্ট্যগতাবে সামন্তবাদী চীন। উল্লেখ্য, প্রাক্-পুঁজিবাদী চীনে উৎপাদনের উপায়ের ওপর মালিকানাসম্পর্কের বিকাশও উপরোক্ত স্তর বিন্যাসের স্বপক্ষে সমর্থন জোগায়। বিশ্লেষণে প্রমাণিত হয় যে, পুরাকালীন যুগের শেষ ও মধ্যযুগের শুরুর ঐতিহাসিক সীমারেখা হলো খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক। প্রাক্-পুঁজিবাদী চীনের রাজনৈতিক উপরিকাঠামোর পুনর্গঠনকাল হলো খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতক থেকে নবম শতক পর্যন্ত (ছক ৮ দ্রষ্টব্য)। আবার রাজনৈতিক উপরিকাঠামোর পুনর্গঠনকালটি চীনে ভাগচাষ প্রথার অভ্যুদয়, বিকাশ ও উচ্ছেদকালের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ।

ছক ৮: প্রাক্-পুঁজিবাদী চীনের তিন হাজার বছরের আর্থসামাজিক ইতিহাসের বিভাজন

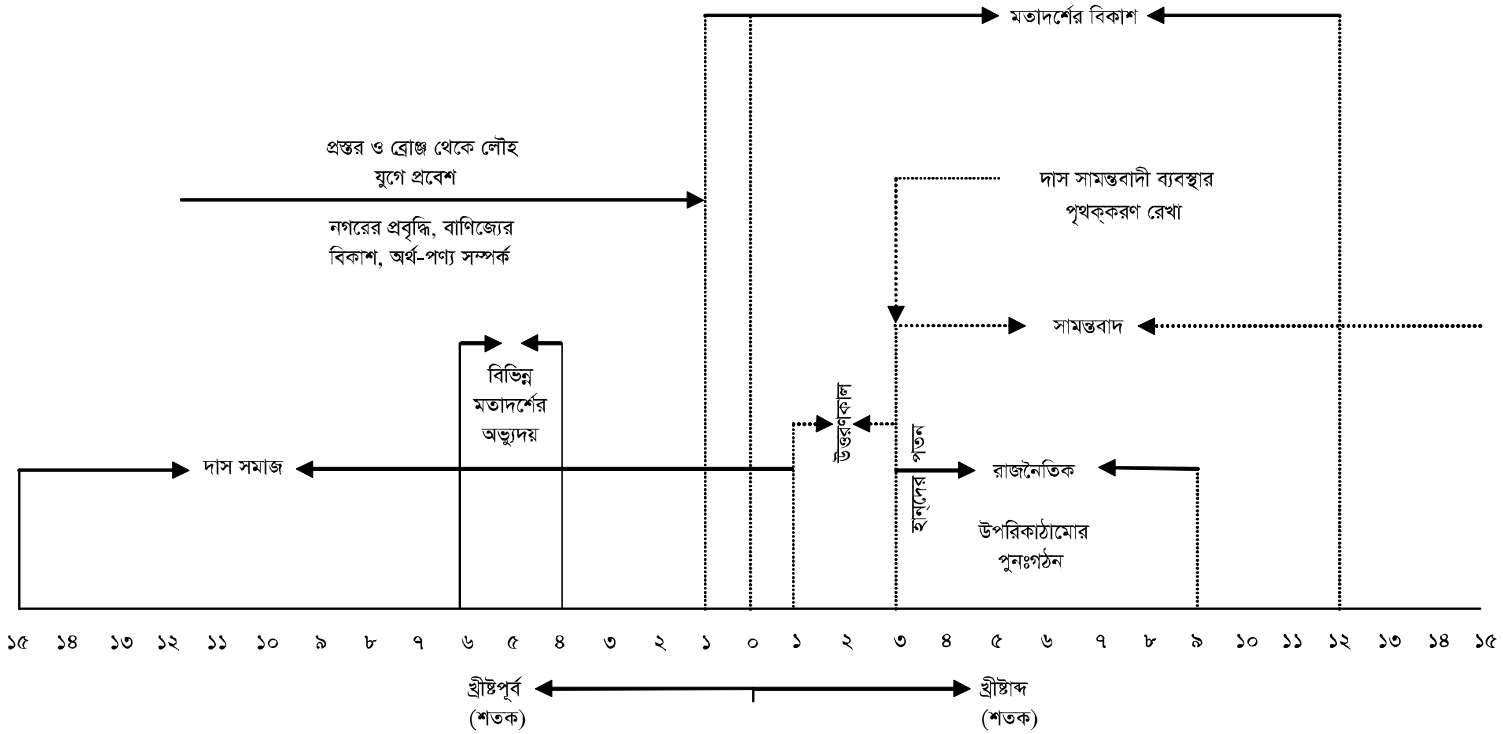

উপসংহার

উৎপাদনের উপায়ের ওপর মালিকানা, রাজনৈতিক উপরিকাঠামো ও বিশেষ শাসকগোষ্ঠী 'সেন্‌সিদের বৈশিষ্ট্য', মতাদর্শের বিকাশ, উৎপাদিকা শক্তির চরিত্র ও অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণের ভিত্তিতে প্রাক্-পুঁজিবাদী চীনের তিন হাজার বছরের আর্থসামাজিক ব্যবস্থাসংক্রান্ত যেসব উপসংহারে উপনীত হওয়া সম্ভব সেগুলো হলো নিম্নরূপ:

প্রথমত, উল্লিখিত সময়কালে চীনের আর্থসামাজিক ব্যবস্থা কোনোক্রমেই এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতিভিত্তিক নয়। কারণ, তাত্ত্বিকেরা 'এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি'র অন্তর্গত যেসব বৈশিষ্ট্যকে প্রধান হিসেবে ধরে নেন, তা চীনে অবশ্যই নির্ধারক ভূমিকা পালন করেনি;

দ্বিতীয়ত, উল্লিখিত সময়কালে চৈনিক আর্থসামাজিক ব্যবস্থায় প্রথমে দাস উৎপাদন পদ্ধতি ও পরবর্তীকালে সামন্তবাদী উৎপাদন পদ্ধতি নির্ধারক ভূমিকা পালন করে (যার বিভিন্ন উপাদান দেখুন ছক ৮-এ); এবং

তৃতীয়ত, চৈনিক আর্থসামাজিক ব্যবস্থায় দাস সমাজের বিলুপ্তির ও সামন্তবাদী উৎপাদন পদ্ধতির নির্ধারকতার ঐতিহাসিক কালপর্ব হলো খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতক। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকই হলো চীনে পুরাকালীন যুগের সমাপ্তি ও মধ্যযুগের শুরুর ঐতিহাসিক সীমারেখা।

প্রবন্ধে ব্যবহৃত পুস্তক ও রচনাবলী

বাংলা ভাষায় রচিত পুস্তক ও রচনাবলী

১. করোভকিন, ফিওদর., পৃথিবীর ইতিহাস: প্রাচীন মূল, মস্কো, প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৩।

২. বারকাত, আবুল., "বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতি– বিতর্ক, পদ্ধতিগত সমস্যা ও সমাধান", *সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্র (জর্নাল)*, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ঢাকা, ১৯৮৪।

৩. বারকাত, আবুল., "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি– সোভিয়েত প্রাচ্যগবেষণার দুই পর্ব", *'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা'*, দ্বাবিংশ সংখ্যা: জুন ১৯৮৫।

৪. বারকাত, আবুল., "মার্কসীয় ও অমার্কসীয় অর্থনীতি চিন্তা– শ্রেণিস্বার্থ ও বাস্তব তথ্য", *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, চতুর্বিংশ সংখ্যা: ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬।

৫. বারকাত, আবুল., "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে মার্কস ও এঙ্গেলসের ধারণার বিকাশ– একটি মূল্যায়ন", *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, ষড়ুবিংশ সংখ্যা: ১৯৮৬।

রুশ ভাষায় রচিত পুস্তক ও রচনাবলী

৬. এঙ্গেলস, ফ., মার্কস-এঙ্গেলস রচনাসমগ্র, খণ্ড ৩৯, মস্কো, ১৯৭০।

৭. ক্রুকভ, ম. ভ., পরিবারভিত্তিক গোষ্ঠীর বিলুপ্তি ও শ্রেণিভিত্তিক সমাজের উদ্ভব, মস্কো, ১৯৬৮ (*"Razlazenia rodobova stroia e formirovania klasobova ovsectva"*).

৮. ক্রুকভ, ম. ভ., চীনা পরিবারভিত্তিক সমাজ পদ্ধতি, মস্কো ১৯৭২ (*"Systema rodstva Ketaisev"*).

৯. ক্রুকভ, ম.ভ., পুরাকালীন চীনের সামাজিক সংগঠনের রূপসমূহ, মস্কো, ১৯৬৭ (*"Formi socialnoi organizasii derievnikh Ketaisev"*).

১০. খখলভ, ল. ন., "চীনে সমাজ ও রাষ্ট্র", প্রবন্ধ সংকলন, প্রথম প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭৪ (*"O tak nazibaiemoi berkhovnoi sobstvennasti emperatora na zemlieu vi Ketaie, po matirialam Ketaiskikh estochnikov XVIII-XIX A. D")*.

১১. চানিসিয়েভ, আ. ন, পুরাকালীন দর্শনচিন্তার গতি-প্রকৃতি, মস্কো, ১৯৮১ (*"Kurs leksi po derevnoi filosofi"*).

১২. জুকভ. ই. ম (সম্পাদক)., বিশ্ব-ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার তত্ত্বগত সমস্যাবলী, মস্কো, ১৯৭৯ (*"Theoretichiskie problemi ceomirnostoricheskova processa"*).

১৩. তোকেই, ফ., সমাজব্যবস্থার তত্ত্ব। মার্কসের তাত্ত্বিক ক্রিয়াকাণ্ডে সামাজিক রূপসমূহের বিশ্লেষণ, মস্কো, ১৯৭৫ (*"Theori obsectvennikh formacii. Problemi analiza obsectvennikh form vi theoreticheskoi nasslectvi Karla Marksa"*).

১৪. দিলশিন, ল. প (সম্পাদক)., চীনের সমাজ ও রাষ্ট্র, মস্কো, ১৯৮১ (*"Obsectva-e-gosudarstava vi Kitae").*

১৫. দুমান, ল. ই., ইন্ যুগে দাস ব্যবস্থার ভূমিকা (খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্দশ-একাদশ শতকের তথ্যের ভিত্তিতে রচিত), এশিয়ার জনগণ ইনস্টিটিউটের সংক্ষিপ্ত সংবাদ পরিক্রমা, ৫৩তম প্রকাশনা, মস্কো, ১৯৬২ (*"O roli rabstva vi epokhu Enn, Sbornika XIV-XI B.C"*).

১৬. নিকিফোরভ, ভ. ন., পুরাকালীন চীনে শাসকশ্রেণির বৈশিষ্ট্য। (সংকলন) "চীনের ইতিহাস ও কৃষ্টিতে সামাজিক রীতিনীতির ভূমিকা", মস্কো, ১৯৭২ (*"Specifika gaspodstvueiseva klassa vi starom Ketai, Sbornikh "Role tradisi vi estori-e-kultura Ketaia"*).

১৭. নিকিফোরভ, ভ. ন., প্রাচ্য ও বিশ্ব ইতিহাস, মস্কো, ১৯৭৭ (*"Vostok-e-Ceomirnaya Estoria"*).

১৮. পামেরানসেভা. আ. ই., প্রকৃতি, সমাজ ও কৃষ্টি সম্পর্কে পরিপক্ব দাওসি্ মতবাদ, মস্কো, ১৯৭৯ (*"Pogdnie daoczi O prirode obsestve-e-eskustve"*)

১৯. পেরেলোমোভ, ল. স., "চীনে খ্রীষ্টপূর্ব ২০১-২০২ সনের যুদ্ধে চালিকাশক্তির প্রকৃতি প্রসঙ্গে, মস্কো, "এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণ", সংখ্যা ১ ১৯৬২. (*"O priorode duvizuiosikh sil Ketai, 209-202. B.C"., Narodi-Azi-i-Afriki).*

২০. পেরেলোমোভ, ল. স., "চীনে খ্রীষ্টপূর্ব ২০৮-২০৭ সনের কৃষকবিদ্রোহ প্রসঙ্গে", *সোভিয়েত প্রাচ্য গবেষণা* (জর্নাল); তৃতীয় সংখ্যা, ১৯৫৬ ("*Kristianskie vostaniavi Ketai, vi 208-207, B. C.*").

২১. ফান্-জেন্ লান., চীনের পুরাকালীন ইতিহাস: আদিম সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা থেকে সামন্তবাদী কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব পর্যন্ত, মস্কো, ১৯৬৮ (*"Drevnaya*

estoria Ketaia ot pervobitnova obsinnova stroia do obrazovania centralizannova feodalnova gosudarstva").

২২. ভাসিলিয়েভ, ল. স., পুরাকালীন চীনের কৃষিতে উৎপাদনসম্পর্ক ও গোষ্ঠীব্যবস্থা, মস্কো, ১৯৬১ ("*Agrarnie otnosenia e obsena vi derevniem Ketai"*).

২৩. মার্কস, কার্ল., মার্কস-এঙ্গেলস রচনাসমগ্র., খণ্ড ২৩, মস্কো, ১৯৭০।

২৪. লেনিন, ভ. ই., "দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বিপর্যয়"। লেনিন রচনাসমগ্র, খণ্ড ২৬; পঞ্চম সংস্করণ, মস্কো, ১৯৮০।

২৫. সান্, ইউ-এ, চীনের ইতিহাস প্রসঙ্গে প্রাচীনকাল থেকে আফিমের যুদ্ধ পর্যন্ত, মস্কো, ১৯৫৯ ("*Ocherki Estori Ketaia: es derevnosti do Opiumnih voin "*).

২৬. স্মর্লিন, গ. ইয়া., "সামন্ত যুগে সংঘটিত কৃষকবিদ্রোহ সম্পর্কে চীনা ঐতিহাসিকদের বিতর্ক", মস্কো, *এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণ*, (জর্নাল), দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৯৬২ ("*Ketaiskie estoriki o Kristianskikh boinakh b peeriodi feodalisma vi-Ketai", Narodi-Azi-i-Afriki).*

২৭. স্টেপুগিনা, ট. ভ., "খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্দশ-দ্বাদশ শতকে চীনের সামাজিক-অর্থনৈতিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে", *পুরাকালীন ইতিহাস পত্রিকা*, দ্বিতীয় সংখ্যা, মস্কো ১৯৫০ ("*Khe voprosu o socialno-ekonomichiskikh otnoseniakh vi Ketai vi XIV-XII-B. C.").*

২৮. হো-মো-জো, পুরাকালীন চীনের দার্শনিকদের প্রসঙ্গে, মস্কো ১৯৬১, ১৯৬৫ ("*Filosofi derevnova Ketaia "*)

ইংরেজি ভাষায় রচিত পুস্তক ও রচনাবলী

২৯. Bernal, J. D., Science in History, vol, 1. Emergence of Science; Penguin Books, 1969.

৩০. Chang, Chung-Li., The Income of Gentry, Seattle, 1955.

৩১. Chang, Chung-Li., The Chinese Gentry, Seattle, 1955.

৩২. Creel, H. G., Chinese Thought from Confucius to Mao-Tse Tung, N. Y. 1960.

৩৩. Fitzgerald, C. P., China: A Short Cultural History, London, The Cresset Press, 1950.

৩৪. Gernet, Jacques., A History of Chinese Civilization, London, Cambridge University Press, 1982.

৩৫. Goodrich, L. Carrington., A Short History of the Chinese People, New York, Harper and Row, 1963.

৩৬. Harrison, James. P., The Communists and Chinese Peasant Rebellions: A Study in the Rewriting of Chinese History, London, Victor Gollancz, Ltd, 1970.

৩৭. Ho-Ping-Ti., The Ladder of Success in Imperial China, New York, London, 1962.

৩৮. Hsu-Cho-Yun, Ancient China in Transition: An Analysis of Social Mobility, 722-222 B. C; Stanford, Stanford University Press, 1968.

৩৯. Levenson, Joseph. R and Schurmann, Franz., China: An Interpretive History: From the Beginnings to the Fall of Han. University of California Press, 1960.

৪০. Lindsay, J., "Stages of Social Development", *Marxism Today*, No. 9. London, 1961.

৪১. Rudyard, Kipling., Selected Prose and Poetry of Rudyard Kipling. Garden City Publication Co, N. Y., 1937.

৪২. Shouyi, Bai (Ed.)., An Outline of China, Beijing, 1982.

প্রবন্ধ ৬

আমেরিকার পুঁজিবাদ বিকাশের ইতিহাস প্রসঙ্গে: একটি মার্কসীয় বিশ্লেষণ

প্রসঙ্গকথা: *এ প্রবন্ধটির রচনাকাল ১৯৮৭-৮৯, আর প্রকাশকাল ১৯৯০। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল* ***ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকায়*** *(সাইত্রিশ সংখ্যা, জুন ১৯৯০, আষাঢ় ১৩৯৭, পৃ. ১-২১)। আমেরিকায় পুঁজিবাদী আর্থসামাজিক ব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশকে পরিবর্তনশীল উৎপাদন পদ্ধতির নিরিখে না দেখে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা চিহ্নিত করা হয় "ব্যতিক্রমধর্মী, শান্তিধর্মী এবং শ্রেণিবন্ধুত্বের অনন্য মডেল" হিসেবে। অনেকেই দীর্ঘকাল "অনন্য মডেলসংশ্লিষ্ট" এসব কথাবার্তা বিশ্বাস করেছেন। আর ১৯৩০-এর দশকের মহামন্দা শুরুর সময় থেকেই বলা চলে বিশ্বাসভঙ্গ শুরু। এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদের যে স্তরে উপনীত এবং যা করছে (করেছে এবং নিকট ভবিষ্যতে যা করবে)– তা থেকে মনে হয় আমেরিকায় (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে) পুঁজিবাদের উদ্ভব ও বিকাশের পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন। এ প্রবন্ধটি সেদিক থেকে কার্যকর সহায়ক হতে পারে।*

ভূমিকা

চিরায়ত পুঁজিবাদী অর্থনীতির ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে বুর্জোয়া তাত্ত্বিকেরা পুঁজি ও শ্রমের দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গটি যেমনভাবে স্বীকার করে থাকেন, আমেরিকার পুঁজিবাদের ইতিহাস রচনায় তেমনটি স্বীকার করেন না। আমেরিকার অর্থনৈতিক ইতিহাসের বুর্জোয়া রচয়িতারা যা প্রমাণ করতে সচেষ্ট তা হলো– আমেরিকায় পুঁজিবাদ বিকাশে কোনো শ্রেণিসংগ্রামের অস্তিত্ব নেই, নেই সেখানে শ্রেণিবৈপরীত্য এবং পুঁজিবাদ সেখানে সব স্তরেই প্রগতিশীলতার বাহক। আর চিরায়ত পুঁজিবাদী মডেলের পুঁজিপতির বিপরীতে আমেরিকার পুঁজিপতি প্রগতি, গণতন্ত্র ও মুক্তির বাহকমাত্র।

বুর্জোয়া তাত্ত্বিকেরা বিভিন্ন রূপক কাহিনী রচনার মাধ্যমে যা প্রমাণ করতে চান তা হলো আমেরিকার পুঁজিবাদী বিকাশ ব্যতিক্রমধর্মী, শান্তিধর্মী এবং শ্রেণিবন্ধুত্বের অনন্য মডেল। যেমন থমসন ও জোনসের মতে, আধুনিক আমেরিকার প্রাক্-ইতিহাস অর্থাৎ ঔপনিবেশিক আমলের আমেরিকার ইতিহাস হলো "নৈতিকতা, সামাজিক সাম্য ও সমানাধিকারের ইতিহাস। তা রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মুক্তির ইতিহাস (দেখুন, ২, পৃ. ১৮)।

আবার সেলিগম্যানের ভাষায় "ঔপনিবেশিক আমলের আমেরিকা গণতন্ত্রের সূতিকাগার, কারণ অর্থনৈতিক সাম্য সেখানে প্রাধান্য বিস্তার করে ছিল।"

আমেরিকায় পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির বিকাশের জটিল কার্যকারণসম্পর্ক সম্বন্ধে বস্তুনিষ্ঠ ধারণা পেতে হলে তার গত ৫০০ বছরের অর্থনৈতিক ইতিহাসকে কয়েকটি পর্বে বিভাজন করা পদ্ধতিতাত্ত্বিক দিক থেকে যুক্তিসিদ্ধ। পলিটিক্যাল ইকোনমির নিরিখে আমেরিকার গত ৫০০ বছরের বিকাশধারাকে ৪টি পর্বে শ্রেণিবদ্ধ করা যেতে পারে।[৪৭] সারবস্তুসহ এসব পর্ব নিম্নরূপ:

---

[৪৭] অর্থনৈতিক ইতিহাসের স্তরবিভাজনের (বা কালবিভাজন অর্থাৎ Periodisation) ক্ষেত্রে বুর্জোয়া তাত্ত্বিকেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পলিটিক্যাল ইকোনমিক মানদণ্ড প্রয়োগ করেন না। আমেরিকার অর্থনৈতিক ইতিহাসের কালবিভাজনের ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে বুর্জোয়া অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদরা আর যে মানদণ্ডই ব্যবহার করুন না কেন, ইতিহাসকে উৎপাদনসম্পর্ক ও উৎপাদিকা শক্তির দ্বান্দ্বিক বিকাশের নিরিখে দেখেন না। আমেরিকার অর্থনৈতিক ইতিহাসের বুর্জোয়া ধারা কালবিভাজনের ক্ষেত্রে যেসব মানদণ্ড ব্যবহার করে সেগুলো হলো: নিছক সালভিত্তিক কালানুক্রম (সাধারণ chronology), অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিভিত্তিক কালবিভাজন, উপরিকাঠামোর পরিবর্তন-নির্দেশক ঘটনাভিত্তিক কালবিভাজন, অর্থনৈতিক সেক্টরের উন্নয়নের স্তরভিত্তিক কালবিভাজন ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, আলবার্ট নিয়েমি আমেরিকার অর্থনৈতিক ইতিহাসকে নিম্নলিখিত সাতটি পর্বে বিভক্ত করেছেন: (১) ঔপনিবেশিক ও প্রারম্ভিক জাতীয় বিকাশ পর্ব, (২) প্রবৃদ্ধি, বিকাশ ও গৃহযুদ্ধ, (৩) প্রযুক্তি, শিক্ষা ও ফাইন্যান্স, (৪) কৃষি ও প্রাকৃতিকসম্পদ, (৫) মনুষ্যসম্পদ, (৬) ব্যবসা, সরকার ও বণ্টন, (৭) ১৯২০ থেকে অর্থনৈতিক বিকাশপ্রবণতা ও সংকট (বিস্তারিত দেখুন, ৯)। রবার্টসন ও ওয়ালটন আমেরিকার অর্থনৈতিক ইতিহাসকে ৪টি প্রধান পর্বে বিভক্ত করেছেন: (১) ঔপনিবেশিক যুগ (২) বৈপ্লবিক, প্রারম্ভিক জাতীয়তাবাদী ও অ্যান্টিবেলাম যুগ (১৭৭৬-১৮৬০), (৩) একত্রীকরণ যুগ (১৮৬১-১৯১৪), এবং (৪) আধুনিক যুগ (১৯১৫ থেকে বর্তমান অবধি; বিস্তারিত দেখুন ১৩)। প্রিমাক ও উইলিস অবশ্য ঐতিহাসিক কালবিভাজনের ক্ষেত্রে মাইক্রো-ইকনোমিক মাপকাঠি প্রয়োগ করে উক্ত ইতিহাস বিশ্লেষণে প্রায় কুড়িটি পর্বের অবতারণা করেছেন (বিস্তারিত দেখুন, ২৩)। সুতরাং এ কথা সুস্পষ্ট যে বুর্জোয়া অর্থনৈতিক ইতিহাসে এমন কোনো ধারা নেই, যা আমেরিকার অর্থনৈতিক ইতিহাস বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে উৎপাদনসম্পর্ক ও উৎপাদিকা শক্তির দ্বান্দ্বিক ঐক্যের প্রতি নজর দিয়েছে। অথনৈতিক ইতিহাসের সারবস্তু বিশ্লেষণে উৎপাদনসম্পর্ক ও উৎপাদিকা শক্তির উপাদানসমূহকে যে আদৌ

প্রথম পর্ব: ঔপনিবেশিক আমল।
সপ্তদশ শতকের শুরুর দিক থেকে ১৭৭৫-১৭৮৩ সময়কালের স্বাধীনতা যুদ্ধের শুরু পর্যন্ত সময়কে ঔপনিবেশিক পর্ব হিসেবে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এই পর্বের প্রধান অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য হলো "পুঁজিবাদের প্রাথমিক পুঁজি সঞ্চয়ন"।

দ্বিতীয় পর্ব: স্বাধীনতা যুদ্ধ থেকে শুরু করে ১৮৬১-১৮৬৫ সালের গৃহযুদ্ধ পর্যন্ত।
এই পর্বের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে যা অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় সেগুলো হলো– শিল্প বিপ্লব, দাস ও পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের লড়াই, এবং শেষাবধি, পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির বিজয়।

তৃতীয় পর্ব: গৃহযুদ্ধ থেকে শুরু করে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত।
এই পর্বে আমেরিকার অর্থনীতি তার প্রাক্-মনোপলি স্তরের সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটাতে সমর্থ হয়েছে এবং সাম্রাজ্যবাদী (মনোপলি) স্তরের উত্তরণের সব শর্ত পূরণ করেছে।

চতুর্থ পর্ব: সাম্রাজ্যবাদের পর্ব এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯১৪) থেকে পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের সময় পর্যন্ত।

আমেরিকার পুঁজিবাদ বিকাশের সারবস্তু যেহেতু তার অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রথম তিনটি পর্ব বিশ্লেষণ করলেই পাওয়া যায় সে কারণেই বর্তমান প্রবন্ধের প্রধান লক্ষ্য উল্লিখিত তিনটি পর্বের সামাজিক অর্থনৈতিক উপাদানসমূহ খুঁটিয়ে দেখা। আর এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগতভাবে মার্কসীয় উৎপাদনপদ্ধতি তত্ত্বের আওতাভুক্ত প্রত্যয় ও সূত্রসমূহকে প্রয়োগ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, যেহেতু সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদী উৎপাদনপদ্ধতির সর্বোচ্চ স্তর, সেহেতু আমেরিকার অর্থনৈতিক ইতিহাসের সাম্রাজ্যবাদী স্তরকে (চতুর্থ পর্ব) বিশ্লেষণের আওতাভুক্ত করা হয়নি।

বিচার করা হয়নি, সেটিও পুরোপুরি ঠিক নয়। আসলে অনেক ক্ষেত্রেই ওইসব উপাদানকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা হয়েছে। উপাদানসমূহের অভ্যন্তরীণ সংযোগ পদ্ধতিগতভাবেই স্বীকৃত হয়নি।

প্রথম পর্ব: ঔপনিবেশিক অর্থনীতি – পুঁজিবাদের প্রাথমিক পুঁজির জন্ম রহস্য

বুর্জোয়া অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদেরা আমেরিকার ঔপনিবেশিক আমলের ইতিহাসে যে বিষয়টি আদৌ বিবেচনা করতে আগ্রহী নন তা হলো, উপনিবেশ স্থাপনের সঙ্গে পুঁজির প্রাথমিক সঞ্চয়নের সম্পর্ক স্বীকার করা। যেমন ইতিহাসবিদ স্যানডার্সের মতে, ১৪৯২ থেকে ১৭৮৯ সালের মধ্যবর্তীকালীন আমেরিকার ইতিহাস হলো "বর্ণবৈষম্যের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান" (দেখুন, ৩, পৃ. ৫, ২২)। শ্যাননের মতে, "আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপনের সামাজিক-ঐতিহাসিক কারণ হলো– ভৌগলিক স্থানান্তর অথবা ইউরোপের বহির্গমন, সম্প্রসারণ ইত্যাদি" (দেখুন, ৪, পৃ. ১-২)। আবার সেফার্ড ও স্যামুয়েলসন মনে করেন, "ঔপনিবেশিক বাণিজ্য– উপনিবেশ ও মেট্রোপলিসের মধ্যে ভারসাম্যাবস্থা সৃষ্টি করেছিল" (দেখুন, ৫)। প্রকৃতপক্ষে "ভৌগলিক স্থানান্তর" অথবা "বাণিজ্যে বিপ্লব" হলো পুঁজিবাদের প্রাথমিক পুঁজি সঞ্চয়নের এমন একটি মুহূর্ত যা পুরাতন উৎপাদন পদ্ধতিতে বুর্জোয়াসম্পর্ক বিকাশের ক্ষেত্রকে প্রশস্ত করে মাত্র।

ঔপনিবেশিক আমলে প্রাথমিক পুঁজি সঞ্চয়নই হলো প্রধান ঘটনা, অর্থাৎ উৎপাদককে উৎপাদনের উপায় থেকে বিচ্ছিন্ন করার ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াটি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতোই আমেরিকাতেও ঘটেছিল শ্রম ও পুঁজির সংঘাতের প্রক্রিয়ায় এবং তা কখনো তথাকথিত শান্তিপূর্ণ উপায়ে ঘটেনি।[৪৮] শান্তির প্রশ্নই ওঠে না,

---

[৪৮] ঔপনিবেশিক আমলের প্রাথমিক পুঁজি-সঞ্চয়ন প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে আমাদের ধারণা অসম্পূর্ণ হবে যদি প্রাক্-ঔপনিবেশিক আমল ও ঔপনিবেশায়নের মূল লক্ষ্য উহ্য থাকে। উল্লেখ্য, খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত উন্নত ইউরোপীয়রা আমেরিকা মহাদেশ সম্পর্কে তেমন কিছুই জানত না। পঞ্চদশ শতকে স্পেন, ফ্রান্স, ব্রিটেন ও পর্তুগালে প্রাথমিক পুঁজির বিকাশকে ত্বরান্বিত করা ও বাজার বিস্তারের স্বার্থেই "নুতন পৃথিবী"র অনুসন্ধান করতে হলো। এ অনুসন্ধানে স্পেনের রাজার প্রথম অনুমতি পেলেন ক্রিস্টোফার কলম্বাস। ১৪৯২ সালে কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করলেন ঠিকই কিন্তু তিনি ভাবলেন তাঁর আবিষ্কৃত অঞ্চল হলো ইন্ডিয়া, তাই ওই এলাকার বাসিন্দাদের নাম দিলেন 'ইন্ডিয়ান'। উল্লেখযোগ্য তথ্য হলো এই যে, কলম্বাসের সমগ্র ভ্রমণের ব্যয়ভার বহন করেছিলেন স্পেনীয় বণিক সম্প্রদায় ও জাহাজমালিক গোষ্ঠী। তাঁদের মূল উদ্দেশ্য ছিল কলম্বাস তাদের "নতুন পৃথিবী"র সোনাদানা, অর্থকরী ফসল ও দাস হওয়ার যোগ্য দরিদ্র ব্যক্তি ইত্যাদি সম্পদ সম্পর্কে তথ্য দেবেন। কিন্তু কলম্বাস যেহেতু "নতুন পৃথিবী"তে উল্লিখিত সম্পদ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য তথ্যাদি পরিবেশনে ব্যর্থ হয়েছিলেন তাই স্পেনের রাজা কলম্বাসকে দেওয়া সব পদবি ফিরিয়ে নিলেন এবং ভ্রমণজনিত দায়দেনা মেটাতে গিয়ে কলম্বাস কপর্দকশূন্য হয়ে সবার অজ্ঞাতে অতি দরিদ্রাবস্থায় মৃত্যুবরণ করলেন। পরবর্তীকালে ইতালীয় অনুসন্ধানবিদ আমেরিগো ভেসপুচ্চি প্রমাণ করলেন যে কলম্বাসই প্রথম যে পথে যে জায়গায় পৌঁছেছিলেন তা হলো দক্ষিণ আমেরিকা। আমেরিগোর নামানুসারেই এলাকার নাম হলো আমেরিকা। আমেরিগোর আমেরিকার বর্ণনা

কেননা এই প্রক্রিয়ার প্রধান দায়িত্বই হলো সরাসরি উৎপাদককে ক্রমেই অধিক হারে উৎপাদনের উপায়ের মালিকানা থেকে উচ্ছেদ করা। পুঁজির মালিক ও শ্রমের মালিকের মধ্যে যে বিচ্ছিন্নতা তা ত্বরান্বিত করাই এখানে পুঁজিবাদ বিকাশের প্রধান শর্ত। ঔপনিবেশিক আমেরিকায় সম্পদের মালিকানাজনিত বিচ্ছিন্নতা যে ইতিমধ্যে যথেষ্ট মাত্রায় পৌঁছেছিল তার উদাহরণ অনেক। যেমন সরকারি পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ১৭৭৪ সালের আমেরিকায় (ওই সময়ের মূল্য স্তর অনুযায়ী) গড়ে একজন স্বাধীন মানুষের সম্পদের পরিমাণ ছিল ৭৬ স্টার্লিং, যা ১৯৭৩ সালের মূল্যস্তর অনুযায়ী ২,৮৬০ (মার্কিন) ডলার।[৪৯] আর ওইসব স্বাধীন মানুষের মাথাপিছু আয়ের

ইউরোপের বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ সৃষ্টি করল। আমেরিগোর বর্ণনানুযায়ী, আমেরিকা বহু-উপজাতি নিয়ে গঠিত, জনসংখ্যার অধিকাংশের জীবনযাত্রার প্রধান উৎস শিকারবৃত্তি ও মাছ ধরা, সেখানে (মূলত হাইতি, কিউবা এসব অঞ্চলে) এমন কিছু ফসল আছে যা ইউরোপে নেই (তামাক, কোকো ইত্যাদি), সেখানে ইউরোপের মতো লাঙ্গল নেই, সেখানে ঘোড়ার প্রচলন নেই, লোহার অস্ত্র নেই, আগ্নেয়াস্ত্র নেই এবং সেখানকার মানুষেরা আদিম-গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন যাপন করেন (দেখুন, ২৪, পৃ. ১৯৭-২০৫)। কলম্বাস অবশ্য নতুন পৃথিবীর 'স্বর্ণ'-সম্পদের কথা বলেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে সোয়েটবার হিসেব করে দেখিয়েছেন যে ১৪৯৩-১৫২০ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজে মাত্র ২২ টন স্বর্ণ উত্তোলিত হয়েছিল। আর এটুকু সোনার জন্য যে লড়াই হয় তাতে হাইতির প্রায় সমগ্র জনসংখ্যাকেই মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল অর্থাৎ প্রতি টন সোনার জন্য যায় ১ লক্ষ জীবন। এ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য সমসাময়িক একজন রেড ইন্ডিয়ান নেতা তার স্থানীয়দের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, "তোমরা জেনে রাখো যে, সোনা হলো সাদা মানুষদের ভগবান। তোমাদের সব সোনাদানা তোমরা পানিতে ফেলে দাও। দেখবে সাদা মানুষেরা তাদের ভগবানকে পেতে ব্যর্থ হলে এদেশ ছেড়ে যাবে এবং আমরা শান্তিতে থাকতে পারব (দেখুন, ২৫, পৃ. ১০৭-১০৮)।" সোনাদানা পাওয়ার জন্য আমেরিকায় যেসব কলোনি স্থাপন করা হয়েছিল, ব্যবসায়ী ও বাণিজ্যিক কোম্পানিরাই ছিল সেগুলোর প্রধান হতো। ধর্মীয় চার্চকেও এ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছিল। স্বাধীনচেতা রেড ইন্ডিয়ানরা স্বৈরাচারী ঔপনিবেশিক শক্তির বশ্যতা স্বীকার করতে চাইত না দেখে ধর্মযাজকেরা রেড ইন্ডিয়ানদের "পশুতুল্য আত্মাহীন জন্তু" বলে আখ্যায়িত করতেন। ব্রিটিশরা প্রবল শক্তিধর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জোর করে পর্তুগিজ ও সুইডিসদের উৎখাত করেছিল (যেমন ১৬৬০-এর দশকে নিউ ইয়র্ক ও ডেলাওয়ার থেকে)। বাগিচা চাষের দাস, ভূমি দাস, রৌপ্য ও স্বর্ণখনিতে কাজ - মূলত এসব ক্ষেত্রে রেড ইন্ডিয়ানদের জোর করে কাজে লাগানো হতো। এসব কারণেই বহু রেড ইন্ডিয়ান নিজেদের পরিবারের সবাইকে হত্যা করেছিল, অনেকে পাহাড়ে-জঙ্গলে পালিয়ে বেঁচেছিল। শেষ পর্যন্ত যখন রেড ইন্ডিয়ানরা নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছিল তখনই ঔপনিবেশিক শক্তি আফ্রিকা থেকে নিগ্রো দাসদের আমদানি করল আমেরিকায়। মানুষ ব্যবসায় মুনাফার হার ছিল অত্যুচ্চ (দেখুন, ২৪, পৃ. ২০৯-২১০)।

[৪৯] সম্পদের এই হিসাব করা হয়েছে জনসংখ্যার বয়সকাঠামোর সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করে "প্রবেটেড ডেসিডেন্ট" এর ভিত্তিতে। সম্পদের অন্তর্ভুক্ত মৌলসমূহ হলো কৃষি, জমি, দাস, শ্রমিক, গৃহস্থালির কর্মচারী, পশু সম্পদ, কৃষিজ যন্ত্রপাতি, গৃহস্থালিকর্মের যাবতীয় দ্রব্য, ফসল ও দ্রুত পচনশীল

পরিমাণ হলো ১৭৭৪ সালে (১৯৭৩ সালের মূল্যে) ৫৭৩-৯৫৫ ডলার (দেখুন, ৬, পৃ. ১৬৯-২১২, ১১৬৫)। স্বাধীন মানুষের অত্যুচ্চ জীবনযাত্রার মানের পাশাপাশি ঔপনিবেশিক আমেরিকায় জনগণের সম্পদ ও আয়ের বণ্টন ছিল অতিমাত্রায় অসম। যেমন সারণি ১৩-এর তথ্যানুযায়ী নিউ ইংল্যান্ডবাসীদের সর্বোচ্চ সম্পদশালী ১০ শতাংশের মালিকানায় ছিল মোট সম্পদের ৩২ শতাংশ। অন্যদিকে নিউ ইংল্যান্ডের সবচেয়ে দরিদ্রদের ৫০ শতাংশের মালিকানায় ছিল মোট সম্পদের মাত্র ১১ শতাংশ এবং মধ্য কলোনির অনুরূপ ৫০ শতাংশের মালিকানায় ছিল মোট সম্পদের ২৩ শতাংশ। অর্থাৎ নিউ ইংল্যান্ডের মোট সম্পদের ৮৯ শতাংশ ও মধ্য কলোনির মোট সম্পদের ৭৭ শতাংশের মালিকানা ছিল ধনীদের করায়ত্ত। উল্লেখ্য যে, সম্পদের মালিকানাজনিত অসমতা ঔপনিবেশিক আমলে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন বোস্টনের করদাতাদের সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ ১৬৮৭ সালে বোস্টনের মোট সম্পদের ৪২ শতাংশের মালিক ছিল, তারাই ১৭৭১ সালে মোট সম্পদের ৫৭ শতাংশের মালিকে রূপান্তরিত হয়েছে (দেখুন ৭, পৃ. ৬৩)। দাসশ্রম, চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক ও আমদানি-রপ্তানি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সম্পদের মালিকানাজনিত অসমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণি ১৩: ১৭৭৪ সালে নিউ ইংল্যান্ড ও মধ্য-কলোনিতে সম্পদের বণ্টন

সম্পদের যোজিত অনুপাত	নিউ ইংল্যান্ড (শতকরা হার)	মধ্য-কলোনি (শতকরা হার)
সর্বদরিদ্র ১০ শতাংশ	১ শতাংশের কম	১ শতাংশের কম
সর্বদরিদ্র ২০ শতাংশ	১	২
সর্বদরিদ্র ৫০ শতাংশ	১১	২৩
সবচেয়ে ধনী ২০ শতাংশ	৬০	৪৭
সবচেয়ে ধনী ১০ শতাংশ	৪০	৩২

উৎস: জোনস, ১৯৭০, খণ্ড ২; জোনস, ১৯৭২, পৃ. ৯৮-১২৭।

দ্রব্যাদি, নিত্যব্যবহার্য ভোগ্যপণ্য ইত্যাদি। ক্যাশ অর্থ ও ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট হিসেবের আওতাভুক্ত নয়। অতি দরিদ্র শ্রেণির সম্পদের হিসাবে গরমিল আছে। আর তাই সম্পদের মালিকানায় অসমতা নির্দেশক তথ্যাদি প্রকৃত অবস্থার অবমূল্যায়ন করেছে। প্রকৃত অসমতা জোনসের হিসাবের অসমতার চেয়ে অধিক।

"ঔপনিবেশিক আমল সাম্যের যুগ, সৌভ্রাতৃত্বের যুগ, নৈতিক উচ্চমানের যুগ"– এ ধরনের যত গালগপ্পই বুর্জোয়া সমাজবিজ্ঞানীরা করে থাকুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে সে যুগ হলো প্রাথমিক পুঁজির উদ্ভবের যুগ। আর আমেরিকার অর্থনৈতিক ইতিহাস এই পুঁজি উদ্ভবের উৎসসংক্রান্ত যে সাক্ষ্য দেয় তা হলো– রেড ইন্ডিয়ানদের নিধন, দখলদারি যুদ্ধ, জবরদস্তি কাজ করানোর আধা-সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতি, দক্ষিণাঞ্চলীয় উপনিবেশে দাস ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত করা, মেহনতি মানুষকে শোষণ করা। সুতরাং এ সময়ে আমেরিকার ইতিহাস হলো শ্রেণি লড়াইয়ের ইতিহাস– যার এক প্রান্তে বৃহৎ ভূস্বামী আর অন্য প্রান্তে খুদে কৃষক, একদিকে দাস-মালিক আর অন্যদিকে দাস, একদিকে বৃহৎ মহাজন (কালোবাজারি ও দস্যু) আর অন্যদিকে কৃষককুল ও খুদে ব্যবসায়ী, একদিকে ম্যানুফ্যাকচারের মালিক আর অন্যদিকে খুদে পণ্য উৎপাদক ও শ্রমিক, একদিকে ব্রিটিশ শাসক ও আমলা বাহিনী আর অন্যদিকে ঔপনিবেশিক বৃহৎ জনগোষ্ঠী।

ঔপনিবেশিক আমেরিকার দাস ব্যবস্থার অর্থনৈতিক ফলদানক্ষমতা সম্পর্কে যত বিতর্কই থাকুক না কেন, এ ব্যবস্থা শ্রমশোষণভিত্তিক এবং তা ঔপনিবেশিক কাঠামোতে প্রাথমিক পুঁজি উদ্ভবে ধনাত্মক উপাদান হিসেবেই সক্রিয় ছিল। আমেরিকায় দাস শ্রমিকদের আমদানিসংক্রান্ত তথ্যাদি প্রমাণ করে যে দাসশ্রমে বিনিয়োগ অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনক ছিল। ১৬২০ থেকে ১৭০০ সাল পর্যন্ত গড়ে প্রতি ১০ বছরে আমেরিকায় আমদানিকৃত দাসের সংখ্যা ছিল ৫,০০০, আর ১৭০০ থেকে ১৭৮০ পর্যন্ত প্রতি ১০ বছরে গড়ে আমদানিকৃত দাসদের সংখ্যা ছিল ৩০,০০০। ১৮০৮ সালে দাসশ্রমিক আমদানি আইনত নিষিদ্ধ হওয়ার আগে আমদানিকৃত দাসদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় প্রতি ১০ বছরে গড়ে ১ লক্ষ পর্যন্ত। উল্লেখ্য, ১৮৬০ সাল নাগাদ দক্ষিণ আমেরিকার সমগ্র জনসংখ্যার (১ কোটি) ৪০ শতাংশই দাসদের নিয়ে গঠিত (দেখুন, ৮, পৃ. ২৫)। দাস মালিকানার ক্ষেত্রেও ঘনীভবন প্রক্রিয়া (process of concentration) কার্যকর ছিল। দক্ষিণাঞ্চলের ৪০ লক্ষ দাসের মালিক ছিল ৩.৮৫ লক্ষ ব্যক্তি। কিন্তু ৭২ শতাংশ দাসমালিকের মালিকানাধীন ছিল গড়ে ২০০ জন দাস অর্থাৎ মাত্র ১২ শতাংশ দাসমালিকের মালিকানায় ছিল ৫০ শতাংশ দাস (দেখুন, ৯, পৃ. ১১৩)। ঔপনিবেশিক আমেরিকায় দাসশ্রমে বিনিয়োগ যে অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক ছিল তার প্রমাণ এই যে, যেখানে সাধারণ বিনিয়োগে গড় লাভ ৬ শতাংশ সেখানে বাগিচা কৃষিতে পুরুষ দাসশ্রমের বিনিয়োগে গড়ে লাভ ছিল ৪.৫ থেকে ৮ শতাংশ ও উত্তম বাগিচা কৃষির ক্ষেত্রে ১০ থেকে ১৩ শতাংশ এবং মহিলা দাসশ্রমে বিনিয়োগজনিত লাভের পরিমাণ ৭.১ থেকে

৮.১ শতাংশ (দেখুন, ১০)। শুধু কৃষিক্ষেত্রেই নয় প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের বিকাশেও আমেরিকার অর্থনৈতিক ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্বে দাসশ্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল (দেখুন, ১১, পৃ. ১৩, ৩১)।

উল্লেখ্য, সমগ্র ঔপনিবেশিক আমলেই আমেরিকার অর্থনীতিতে কৃষিজমির তুলনায় শ্রমশক্তির সরবরাহ ছিল অতিমাত্রায় অপর্যাপ্ত। আর তাই সমগ্র সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীজুড়েই বিভিন্ন পদ্ধতিতে "কালো মানুষ"দের (দাস হিসেবে, চুক্তিবদ্ধ ভূ-শ্রমিক হিসাবে অথবা ভিনদেশি পলাতক হিসাবে কিংবা অন্যভাবে) আমেরিকায় আগমন ঘটে। আমেরিকায় সর্বপ্রথম দাস আমদানি করা হয় ১৬১৯ সালে এবং ১৬৯০-এর দশক পর্যন্ত দাস জনসংখ্যা ধীরগতিতে বৃদ্ধি পায়। তবে ১৭০০-১৭৮০ সময়ে ভার্জিনিয়া, মেরিল্যান্ড ও ক্যারোলিনায় দাসশ্রমের ব্যবহার অতি দ্রুত হারে বৃদ্ধি পায়। যেমন ১৬৪০, ১৬৯০, ১৭৫০ ও ১৭৮০ সালে মেরিল্যান্ডে কালো মানুষের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২০ জন, ২,১৬২ জন, ২৪,০৩১ জন ও ৮০,৫১৫ জন। আর উল্লিখিত সালসমূহে ভার্জিনিয়ায় কালো মানুষের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৫০ জন, ৯,৩৪৫ জন, ৬০,০০০ জন ও ২,২০,৫৮২ জন এবং ক্যারোলিনায় (উত্তর ও দক্ষিণ সম্মিলিতভাবে) কালো মানুষের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ০ জন, ১,৮০০ জন, ৪১,০০০ জন ও ১,৮৮,০০০ জন (দেখুন ৯, পৃ. ২২)। উল্লেখ্য যে আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলীয় সম্পদ যাতে দ্রুতগতিতে মেট্রোপলিসে চলে আসতে পারে সে কারণেই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকেরা বিভিন্ন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে আমেরিকায় দাসপ্রথাকে উত্তরোত্তর শক্তিশালী করেছিল। আর উত্তরাঞ্চলীয় কলোনিতে যেহেতু এমন কোনো দ্রব্য উৎপন্ন হতো না, যা সরাসরি মেট্রোপলিসের বাণিজ্যিক বিষয় হতে পারে, সে কারণেই ঔপনিবেশিক শাসকেরা "ত্রিভুজ বাণিজ্য" (তৃতীয়পক্ষ বাণিজ্য) উৎসাহিত করত।

যেসব আইনের প্রয়োগের ফলে ঔপনিবেশিক আমেরিকায় ব্রিটিশ পুঁজির স্বার্থ রক্ষা করা হয়, সেগুলোর মধ্যে ছিল নৌযান আইন (নেভিগেশন অ্যাকট), স্ট্যাম্প আইন, টাউনসেন্ড আইন, গুড় ও চিনি আইন, উল আইন, হ্যাট আইন, লৌহ আইন ইত্যাদি। নৌযান আইনের মাধ্যমে ব্রিটেনের ব্যালান্স-অব-পেমেন্ট ও ব্যালান্স-অব-ট্রেড সংহত করা এবং সেই সঙ্গে ঔপনিবেশিক আমেরিকার পুঁজি বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করা হয়েছে। নৌযান আইনের প্রধান বিষয়াদি ছিল নিম্নরূপ: আমেরিকার সঙ্গে ব্রিটেনের বাণিজ্য হবে ব্রিটেনের জাহাজে (উদ্দেশ্য— ব্রিটেনের ব্যালন্স-অব-পেমেন্ট সংহত করা); ইউরোপ থেকে আমেরিকায় যা কিছু আমদানি

হবে তা অবশ্যই ইংল্যান্ডের মাধ্যমে হবে (সেক্ষেত্রে উপরি কর বসানো হবে); "বিশেষ" তালিকাভুক্ত দ্রব্যাদি শুধু ইংল্যান্ডে আনা যাবে এবং কলোনি থেকে প্রক্রিয়াজাত দ্রব্যাদি ব্রিটেনের বাইরে বিক্রি করা যাবে না (উদ্দেশ্য– ব্রিটেনের প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প রক্ষা করা এবং কলোনিকে ব্রিটেনের প্রতিযোগী হতে না দেওয়া) এবং বিশেষ কয়েকটি দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্রিটেনকে বিশেষ কর প্রদান করা। লরেন্স হারপারের হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় যে, নৌযান আইনের কার্যকরিতার ফলে ১৭৭৩ সালে আমেরিকার নিট ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২৫ লক্ষ থেকে ৭০ লক্ষ ডলার পর্যন্ত (দেখুন, ১২, পৃ. ৩৭)।

ঔপনিবেশিক আমেরিকায় পুঁজিবাদী সঞ্চয়নের এই প্রক্রিয়ার একটি বৈশিষ্ট্য হলো তার দ্বিমুখী চরিত্র। অর্থাৎ ঔপনিবেশিক আমেরিকা একাধারে যেমন ব্রিটেন, স্পেন, হল্যান্ড ও ফ্রান্সের পুঁজিবাদের প্রাথমিক পুঁজি সঞ্চয়নের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে কাজ করেছে, অন্যদিকে তেমনি স্বয়ং আমেরিকার জাতীয় বুর্জোয়া সৃষ্টিতেও এই প্রক্রিয়া সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে। শুরুর দিকে এ প্রক্রিয়াটি ভিন্ন ভিন্ন (বিচ্ছিন্ন) প্রক্রিয়া নয়, একই প্রক্রিয়ার দুটি দিক মাত্র। কিন্তু ঔপনিবেশিক বিকাশ ও স্বাধীন মার্কিন বুর্জোয়া শ্রেণির উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাদের প্রাথমিক পুঁজি সঞ্চয়নের এ প্রক্রিয়া দুটি একে অন্যের সঙ্গে সঙ্গতিহীন, একে অন্যের শত্রুতে রূপান্তরিত হলো। সম্ভবত এই প্রক্রিয়াটিই শেষ পর্যন্ত আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের (১৭৭৫-১৭৮৩) প্রধান শর্ত সৃষ্টি করল।

ঔপনিবেশিক আমেরিকার অর্থনৈতিক ইতিহাসে কৃষকদের কাছে যে স্লোগানটি খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল তা হলো "স্বাধীন মানুষকে স্বাধীন জমি দাও"। ইউরোপের শিল্পবিপ্লব যাদের ভূমিহীনে রূপান্তরিত করেছিল তারা একখণ্ড ভূমি প্রাপ্তির আশায় আমেরিকায় পাড়ি জমিয়েছিল। যেমন ১৭৮৯-১৮১২ সালে ইউরোপ ত্যাগকারীর সংখ্যা যেখানে ২.৫ লক্ষ, সেখানে ওই সংখ্যা ১৮৩০ এর দশকে ৫ লক্ষ, ১৮৪০ এর দশকে ১৫ লক্ষ এবং ১৮৫০-এর দশকে ২৫ লক্ষ (দেখুন, ১৯, পৃ. ১২৪)। আমেরিকার ভূমিহীন ও ইউরোপে ভূমি হারিয়ে যারা আমেরিকায় এসেছিল, উভয় ভূমিহীন গোষ্ঠীরই বড় স্বপ্ন ছিল ভূমির মালিকানা লাভ (দেখুন, ১৩, পৃ. ৪০)। কিন্তু ভূমিহীনের হাতে ভূমি গেলে পুঁজিবাদী শিল্পকারখানায় মজুরিশ্রমিক হবে কারা? সুতরাং ভূমির লড়াইয়ে শেষপর্যন্ত ভূমিহীনের কোনো লাভ হলো না (দেখুন, ১৩, পৃ. ১৫৬)। স্বাধীনতা যুদ্ধ বা আমেরিকার জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ঠিকই সম্পন্ন হলো; কিন্তু জাতির মালিক হবেন কারা? প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের মালিকানায়

ছিল ভার্জিনিয়ায় ৯,৭৭৪ একর, কেনাভ নদীর তীরে ৩,০০৫ একর জমি, স্টেফান ফন রেনসেলারের মালিকানায় ৭ লক্ষ একর এবং অ্যাক্টরের মালিকানায় ৫০ হাজার একর জমি (দেখুন, ১৪, পৃ. ২২)। ভূমির লড়াই চলতে থাকল, ছোট-বড় বিদ্রোহ সংঘটিত হতে লাগল, এমনকি দানিয়েল সেইস্রে নেতৃত্বে কৃষকদের জোরপূর্বক ভূমিদখল ও পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষও স্বাভাবিক ঘটনায় রূপান্তরিত হলো।

দ্বিতীয় পর্ব: শিল্পবিপ্লব ও পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির ভিত্তি স্থাপন

আমেরিকার অথনৈতিক ইতিহাসে প্রথম পর্বে যেখানে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শোষকদের বিতাড়িত করে বুর্জোয়া বিকাশের প্রাথমিক শর্ত সৃষ্টি হলো, সেখানে দ্বিতীয় পর্বে বুর্জোয়া পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি নির্ধারক উৎপাদন পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হলো। আর এই রূপান্তরের প্রধান ভিত্তি শিল্পবিপ্লব। শিল্পবিপ্লবের ফলে পুঁজি ও শ্রমের দ্বন্দ্ব বিকশিত রূপ পরিগ্রহ করল। সুতরাং শ্রেণিস্বার্থের সংঘাত প্রকাশক শ্রমিকশ্রেণির অর্থনৈতিক, মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক লড়াই অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়াল।

ব্রিটেনসহ অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের মতোই আমেরিকাতেও শিল্পবিপ্লব শুরু হলো হালকা শিল্প থেকে। হ্যামিলটনের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৭৯১ সালে আমেরিকার প্রক্রিয়াজাতকরণ (ম্যানুফ্যাকচার) শিল্পে যে ১৭ ধরনের শিল্পপণ্য উৎপাদিত হতো তার ১৪টির উৎস হালকা শিল্প (দেখুন, ১৫)। পরবর্তীকালে বোগা হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, "বিনিয়োজিত পুঁজি, শ্রমিকের সংখ্যা ও উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য– সবদিক থেকেই বস্ত্রশিল্পের প্রাধান্য ছিলো সন্দেহাতীত" (দেখুন, ১৬, পৃ. ১৩৮)। বস্ত্রশিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন আবিষ্কার ও তার উৎপাদনী প্রয়োগ বস্ত্রশিল্পে শ্রমের উৎপাদনক্ষমতা কয়েক গুণ বৃদ্ধি করল। ১৮৩০ সালের শুমারি অনুযায়ী দেখা যায় যে, পেনসিলভানিয়ায় মোট ১৬১টি কারখানার ৫৭টিতে এবং ম্যাসাচুসেটসের ১৬৯টি কারখানার ৩৯টিতে বাষ্পচালিত ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়েছিল। সমসাময়িককালে ধাতুশিল্প, কয়লা উত্তোলন ও অন্যান্য ভারী শিল্প তখনো আদিম চিরাচরিত প্রযুক্তি থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি।

সুতরাং ভারী শিল্পে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য যে পুঁজির প্রয়োজনীয়তা তাকে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল ধরে হালকা শিল্পের মুনাফা সঞ্চয়নের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে। ঠিক এ সময়েই ব্যাংকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৮১১ থেকে ১৮১৬

সালের মধ্যে ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যাংকের সংখ্যা ৮৮ থেকে ২৪৬টিতে উন্নীত হলো, ১৮৩২ সালের তুলনায় ১৮৩৭ সালে ব্যাংকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল ৩২৯ থেকে ৭৮৮ তে, ব্যাংকপুঁজি বৃদ্ধি পেল ১১ কোটি থেকে ২৯ কোটি ডলারে এবং ঋণ প্রদানের পরিমাণ বৃদ্ধি পেল ১৩.৭ কোটি ডলার থেকে ৫২.৫ কোটি ডলারে (দেখুন, ১৬, পৃ. ১২৮)। এসবই বৃহৎ বুর্জোয়াদের পুঁজি ঘনীভবন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করল।

অবশ্যই উল্লেখ করা উচিত যে হালকা শিল্পের উদ্বৃত্ত মূল্যের পাশাপাশি "ভূমির কালোবাজারি"র প্রক্রিয়াটিও বৃহৎ বুর্জোয়াদের পুঁজি সঞ্চয়নে কম ভূমিকা পালন করেনি। এসবের পাশাপাশি ছিল দক্ষিণাঞ্চলীয় দাস ল্যাতিফ্যান্ডের শোষণ, যার ব্যাপকাংশ ব্যাংকের মাধ্যমে শিল্প ও বাণিজ্যে পাচার করা হয়েছিল। এগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল রেড ইন্ডিয়ান আদিবাসীদের ওপর নির্যাতন, অস্ত্রের ব্যবসা (আমেরিকায় বুর্জোয়াদের জন্য এ ব্যবসা নতুন নয়) এবং বলপূর্বক অন্যের দেশ দখল (১৮০৩ সালে লুজিয়ানা ও ১৮১০ সালে ফ্লোরিডা দখল)।

এসবের পাশাপাশি বিদেশি পুঁজিও আমেরিকার শিল্পবিপ্লবে কম ভূমিকা রাখেনি। যেমন ১৭৯১ সালে আমেরিকার প্রথম ন্যাশনাল ব্যাংকের শেয়ারের (প্রতিটির মূল্য ৪০০ ডলার) ৭২ শতাংশ এবং ১৮১৬ সালে দ্বিতীয় ন্যাশনাল ব্যাংকের ২৫ শতাংশ শেয়ারের মালিক ছিল বিদেশিরা। ১৮৩৭ সালে ন্যাশনাল ব্যাংকের মোট পুঁজির ২ কোটি ডলার এবং লুজিয়ানা প্রদেশে ২.১ কোটি ডলার পুঁজি মালিকানা ছিল ব্রিটিশদের (দেখুন, ১৭, পৃ. ১৯০, ১৯৫)।

আমেরিকার পুঁজিবাদী বিকাশে বহিরাগত (ইমিগ্রান্ট)-দের ভূমিকাও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৬১ সালে যেখানে আমেরিকার জনসংখ্যা ৩.১ কোটি, সেখানে ১৮৬১ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত শুধু বহিরাগতদের সংখ্যাই ১.৪ কোটি। বহিরাগতদের অনেকেই উচ্চ দক্ষমতাসম্পন্ন (ইউরোপীয়)। তাই নর্থ সঙ্গত কারণেই উল্লেখ করেছেন যে, "যেহেতু বহিরাগতরা উচ্চমাত্রার নৈপুণ্য নিয়ে এদেশে এসেছে সুতরাং আমরা মার্কিনরা এই পুঁজিটা বিনা পয়সায় পেয়ে গেলাম" (দেখুন ১৮, পৃ. ৬৯৪)।

শিল্পবিপ্লব কৃষিব্যবস্থার পরিবর্তন অনিবার্য করে তোলে। বস্ত্রশিল্পের উন্নতি তুলার চাহিদা বৃদ্ধি করে, পশম ও জুতা শিল্পের উন্নতি উল ও চামড়ার চাহিদা বৃদ্ধি করে, বৃহৎ শিল্পনগরী স্থাপন খাদ্যের চাহিদা বৃদ্ধি করে। সমসাময়িক আমেরিকার এগুলো বাস্তব ঘটনা। কিন্তু তা ঘটেছিল বহু প্রতিকূলতার মধ্যে। কারণ আমেরিকার কৃষিব্যবস্থা যে জটিল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল, তা হলো দক্ষিণাঞ্চলের কৃষিব্যবস্থা

দাসশ্রমভিত্তিক, আর উত্তরাঞ্চলে প্রধান ছিল পুঁজিবাদী ফার্ম এবং উত্তরাঞ্চলীয় এই পুঁজিবাদী চাষপ্রথা উত্তরোত্তর জনবিরল পশ্চিমের অভিমুখী হচ্ছিল।

পশ্চিমাঞ্চল ছিল জনবসতিহীন। আর তাই পুঁজিবাদী শোষণকবলিত উত্তর ও উত্তর-পূর্ব প্রদেশের শ্রমিকেরা খুদে কৃষিমালিক হওয়ার আশায় পশ্চিমের দিকে পা বাড়ালো। বহু ভূস্বামী ও ভূমি জোচ্চোরদের সঙ্গে কৃষক-শ্রমিকদের ভূমিকেন্দ্রিক লড়াই চরম আকার ধারণ করল। কৃষক-শ্রমিকদের চাপের মুখে সরকার কিছুটা হলেও নতি স্বীকার করল। ফলে একদিকে যেমন জমির দাম কমানো হলো, তেমনি সর্বোচ্চ মালিকানার সীমাও ১৮০০ সালের তুলনায় ১৮২০ সালে ৮ ভাগ কমানো হলো। আর ১৮৪১ সালে সরকার এমন একটি আইন জারি করল, যার ফলে জমিতে ইতিমধ্যে বসবাসরত ও আবাদরত কৃষকদের জমি ক্রয়ের ব্যাপারে প্রাধান্য দেওয়া হলো। এই ঘটনাটি আমেরিকার অর্থনৈতিক ইতিহাসে শ্রমজীবী মানুষের বিরাট রকমের নৈতিক-রাজনৈতিক বিজয় হিসেব বিবেচিত হয়ে থাকে।

কিন্তু এতকিছুর পরেও ভূমি-সমস্যার মৌলিক কোনো সমাধানই হয়নি। কারণ প্রথমত, যাদের ক্রয়ক্ষমতা ছিল, তারাই শুধু সরকারি খাসজমি (পশ্চিমের) ক্রয় করতে পারত; দ্বিতীয়ত, ভূমির কালোবাজারির মাধ্যমে উচ্চমানের উর্বর জমির মালিক হলো বুর্জোয়ারাই, এবং তৃতীয়ত, উত্তর ও উত্তর পূর্ব-অঞ্চল থেকে পশ্চিমের দিকে যাওয়ার সময়ে দাসদের সঙ্গে লড়াইয়ে অনেকে প্রাণ হারান।

আমেরিকার শিল্পবিপ্লবের ফলে ১৮৬০ সাল নাগাদ বৃহৎ শিল্প বুর্জোয়ারাই উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে প্রধান শক্তিতে রূপান্তরিত হন। উত্তরোত্তর স্বল্পসংখ্যক বুর্জোয়াদের হাতে পুঁজি পুঞ্জীভূত হতে থাকে। স্বাভাবিক কারণেই সেই সঙ্গে শ্রমিক আন্দোলনও বেগবান হয়ে ওঠে। ১৮৬০ সালে বস্ত্রশিল্পের সংখ্যা ১৮৪০ সালের তুলনায় ২০.৩ শতাংশ হ্রাস পায়, কিন্তু একই সময়ে বিনিয়োজিত পুঁজি বৃদ্ধি পায় ৯৩ শতাংশ এবং প্রক্রিয়াজাত তুলার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় প্রায় ৩.৩ গুণ।

তৃতীয় পর্ব: শোষণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুঁজি বৃদ্ধি

গৃহযুদ্ধের পরবর্তী ৩০-৩৫ বছরে (১৮৬৫-১৯০০) অর্থাৎ আমেরিকার অর্থনৈতিক ইতিহাসের তৃতীয় পর্বে শ্রমজীবী মানুষের ওপর পুঁজির শোষণবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে

পুঁজিপতিদের পুঁজি সঞ্চয়ন বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই সঙ্গে এই পর্বেই পুঁজিবাদের সাম্রাজ্যবাদী স্তরে অভিগমনের সব শর্তই পূর্ণতা পেয়েছে।[৫০]

১৮৫৯ থেকে ১৮৯৯ সাল পর্যন্ত আমেরিকার শিল্পসংক্রান্ত যে তথ্য সারণি ১৪-তে দেওয়া হলো সেখান থেকে সুস্পষ্ট যে, উল্লিখিত ৪০ বছরে শিল্পকারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৩.৬ গুণ, শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৪ গুণ, পুঁজিপতিদের পুঁজির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ৯.৭ গুণ এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ৬.৮ গুণ। অর্থাৎ তথ্য-বিশ্লেষণে পুঁজির ঘনীভবন (কনসেনট্রেশন) প্রক্রিয়া সুস্পষ্ট, কারণ উল্লিখিত সময়ে কারখানার সংখ্যার তুলনায় ২.৫ গুণ দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেয়েছে পুঁজি এবং শুধু তা-ই নয় শ্রমিকপিছু উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ১.৫ গুণ।

[৫০] এই পর্বে সাম্রাজ্যবাদী স্তরে অভিগমনের প্রধান যে শর্তটি পূরণ করা হয়ছে তা হলো, অবাধ প্রতিযোগিতামূলক বাজারব্যবস্থা একচেটিয়া পুঁজির (মনোপলি) জন্ম দিয়েছে, আবার একচেটিয়া কারবারের সৃষ্টিকর্তা অবাধ প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছে। পুঁজি, উৎপাদন ও শ্রমশক্তি এক বা একাধিক সেক্টরে কয়েকজনের হাতে পুঞ্জীভূত হয়েছে, সে কারণে তারা বাজারমূল্য নির্ধারণ এবং স্বল্প দামে কাঁচামাল ও শ্রমশক্তির মূল্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাসহ একচেটিয়া মুনাফা অর্জনে সমর্থ হয়েছে। প্রক্রিয়াটি অন্যান্য সেক্টরের তুলনায় শিল্পখাতে ঘটেছে দ্রুতগতিতে। উল্লেখ্য যে আমেরিকার মোট সংযোজিত মূল্যে শিল্পখাতের অবদান ১৯৫৯ সালে ৩৬ শতাংশ থেকে ৬৫ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে (দেখুন, ১৩, পৃ. ২৯৯)। আমেরিকায় পুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মুনাফার দৃষ্টিতেই "বৃহৎ শিল্প" অপটিমাম শিল্পে রূপান্তরিত হয়েছে এবং ক্ষুদ্র শিল্পের দেউলিয়া হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। শিল্পের পুঞ্জীভবন ও ঘনীভবনের এ প্রক্রিয়া "সমান্তরাল" (horizontal) এবং "উল্লম্বিক" (vertical)। একচেটিয়া সংগঠনের ট্রাস্ট-রূপ ও স্টক-মার্কেট এই প্রক্রিয়ায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। আমেরিকায় প্রাথমিক পর্যায়ের একচেটিয়া পুঁজিবাদী বৃহদায়তন শিল্পসমূহ হলো– ১৮৮২ সালে প্রতিষ্ঠিত নিউ জার্সির স্টান্ডার্ড অয়েল, মবিল অয়েল (১৮৮২), টেক্সাকো (১৯০২), স্টান্ডার্ড অয়েল অব ইন্ডিয়ানা (১৮৮১) ইত্যাদি। আমেরিকায় ১৯০০ সালে মোট ট্রাস্টের সংখ্যা যেখানে ১৮৫টি, সেখানে ১৯০৭ সালে তাদের সংখ্যা ২৫০টি। আমেরিকার একচেটিয়া পুঁজির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে ফিন্যান্স পুঁজি ও ফিন্যান্স পুঁজিপতি গোষ্ঠী। এসবই এমনসব প্রবণতার জন্ম দিয়েছে, যার ফলে বিশ্ববাজারকে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেওয়ার প্রক্রিয়ায় আমেরিকা সক্রিয়।

সারণি ১৪: ১৮৫৯ সালে থেকে ১৮৯৯ সাল পর্যন্ত আমেরিকার শিল্প-কারখানার হালচাল

সন	কারখানার সংখ্যা (হাজারে)	গড় বাৎসরিক শ্রমিকসংখ্যা (হাজারে)	পুঁজি (কোটি ডলারে)	উৎপাদনের মূল্য (কোটি ডলারে)
১৮৫৯	১৪০.৫০	১৩১১.২০	১০০.৯৮	১৮৮.৫৭
১৮৬৯	২৫২.১০	২০৫৩.৯০	১৬৯.৪৫	৩৩৮.৫৮
১৮৭৯	২৫৩.৮০	২৭৩২.৬০	২৭৯.০৮	৫৩৬.৯৬
১৮৮৯	৩৫৫.৪০	৪২৫১.৫০	৬৫২.৫১	৯৩৮২.৪০
১৮৯৯	৫১২.২০	৫৩০৬.১০	৯৮১.৩৮	১৩০০.০১

উৎস: ইউএস গভর্নমেন্ট প্রেস অফিস, ১৯১১, পৃ. ৪৩৯; শ্যানন, ১৯৪০, পৃ. ৪১২; রাইট ১৯৪১, পৃ. ৭০৭।

পুঁজিবাদের দ্রুত বিকাশের এই পর্বে আমেরিকার ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান বৃদ্ধি পেয়েছে। একদিকে যেমন দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, আবার অন্যদিকে তাদের শ্রমে সৃষ্ট কয়েকটি গোষ্ঠীর হাতে পুঞ্জীভূত হয়েছে বৃহৎ শিল্পকারখানা, ব্যাংক-পুঁজি, কৃষিফার্ম ও রেলব্যবস্থা। গৃহযুদ্ধের আগে যেখানে মিলিয়নিয়ারের সংখ্যা ছিল হাতে গোনা, সেখানে গৃহযুদ্ধের পরবর্তী ১০ বছরে বেশ কিছু মিলিয়নিয়ার ও মাল্টিমিলিয়নিয়ারের আবির্ভাব হলো। জন জেকব অ্যাস্টরের (আগেই তার উল্লেখ করা হয়েছে) সম্পত্তির পরিমাণ ১৮৪৮ সালে ২ কোটি ডলার থেকে ১৮৭৫ সালে ১০ কোটি ডলারে এবং ১৯০০ সাল নাগাদ ২২.৫ কোটি ডলারে উন্নীত হলো। ব্যবসায়ী ও শিল্প মালিক গেওলেট-এর সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ১৫ কোটি ডলার। নব্য কোটিপতি হিসেবে আরো আবির্ভূত হলেন রেইলএন্ডার, শেরমেরগন, লনগ্রয়োরস, ফিল্ড, রকফেলার, গ্রন্ড ইত্যাদি (দেখুন, ১৯, পৃ. ১২৯)।

ধনীদের সম্পদবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তুলনামূলকভাবে গরিবদের সম্পদ হ্রাস পেল। ১৮৭৩ সালের দিকে নিউইয়র্কে বেকার শ্রমিকের সংখ্যা দাঁড়াল ৪৩,৭৫০ জন; পেনসিলভানিয়ার প্রায় ২৫ হাজার রেলশ্রমিক কর্মচ্যুত হলো (দেখুন, ২০, পৃ. ২৯৯-৩০১)। ১৮৭১-১৮৭৫ সময়ে খুদে শিল্পের ২৫,৭৩৭টি দেউলিয়া হতে বাধ্য হয়। গ্রাম থেকে শহরে আসা মানুষের ভিড় বেড়ে গেলো। যেখানে ১৮৮০ সালে আমেরিকার জনসংখ্যার ২৯.৫ শতাংশ বাস করত শহরে, সেখানে ১৯০০ সালে তা বেড়ে দাঁড়াল ৪০.৫ শতাংশে। হোমস্টেড অ্যাক্ট চালু হওয়ার ১৮ বছর পরে ১৮৮০

সাল যেখানে কৃষিখামারের ৭৪ শতাংশ ছিল মালিক-খামার, সেখানে ১৮৯০ সালে তা হ্রাস পেল ৭১.৬ শতাংশে এবং ১৯০০ সালে ৬৪.৭ শতাংশে (দেখুন, ১৯, পৃ. ১২৪)।

শ্রম ও পুঁজির দ্বন্দ্বের পরিণাম: শ্রমশোষণ, শ্রমদিন ও পুঁজিবাদের দাসত্বশৃঙ্খল থেকে মুক্তির আন্দোলন

আমেরিকায় পুঁজিবাদী শিল্পকারখানা ও যোগাযোগব্যবস্থা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পশ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেইসঙ্গে শোষণের হার (উদ্বৃত্ত মূল্যের হার) বৃদ্ধি পায়।[৫১]

অলডরিচ কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৮৪০-১৮৬০ সালে আমেরিকায় গড় শ্রমদিন ১৩-১৩.৫ ঘণ্টা। ১৮৫০ সালের দিকে নিউইয়র্কের প্রেস শ্রমিকদের শ্রমদিন ছিল ১৬ ঘণ্টা। ১৮৪০-এর দশকে আমেরিকার শিল্পশ্রমিকদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে কমন্‌স লিখেছেন, "গ্রীষ্মকালে শ্রমদিন ১৩ ঘণ্টা, আর শীতকালে সুর্যোদয় থেকে রাত পর্যন্ত। ভোর সাড়ে চারটায় কারখানার ঘণ্টা বেজে উঠত, আর পাঁচটার মধ্যে মেয়েদের কর্মস্থলে দাঁড়িয়ে যেতে হতো। সবাই ঠিক সময়ে কাজে যোগ দান করল কি না তা দেখার দায়িত্ব ছিল সুপারভাইজারের। কয়েক মিনিট দেরি হলেই কঠোর

---

[৫১] মার্কসীয় ধারণানুযায়ী "শ্রম"ই হলো সম্পদের উৎস। আর পুঁজিবাদী বিকাশের প্রক্রিয়ায় শ্রম-শোষণই (উদ্বৃত্ত মূল্য) প্রাথমিক পুঁজি সঞ্চয়ন ও শিল্পবিপ্লবের মূল চালিকা। আসলে পুঁজিবাদে শ্রমিকের শ্রমদিন দুভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ হলো শ্রমদিনের সেই অংশ, যাতে শ্রমিক নিজের জন্য কাজ করে অর্থাৎ এই অংশের শ্রমের জন্য শ্রমিক মজুরি পায় (প্রয়োজনীয় শ্রমসময়)। দ্বিতীয় অংশ হলো শ্রমদিনের সেই অংশ, যেখানে শ্রমিক কাজ করে পুঁজির মালিকের জন্য অর্থাৎ দ্বিতীয়াংশে মালিকের জন্য শ্রমিক উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করে (উদ্বৃত্ত শ্রমসময়)। পুঁজিবাদের প্রাথমিক পর্যায়ে উদ্বৃত্ত শ্রমসময়টি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হয়ে থাকে এবং সৃষ্টি হয় "নিরঙ্কুশ উদ্বৃত্ত মূল্য"। এ কারণেই পুঁজিবাদের প্রাথমিক পর্যায়ে শ্রমদিনও অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ (যেমন দৈনিক ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬ ঘণ্টা)। এ প্রসঙ্গে ১৯৭১ সালে প্রকাশিত "এছনি ট্রোলপের আমেরিকা ভ্রমণকাহিনী"র একটি অংশ উদ্বৃত্ত করা যেতে পারে: "পৃথিবীতে আমেরিকার কারখানা সুপারভাইজার বা মালিকদের চেয়ে পিশাচ আমি আগে দেখিনি। শ্রমিকদের সম্পর্কে তাদের ধারণা এই যে শ্রমিকদের কর্মক্ষমতা অসীম এবং শ্রমদিনের কোনো সীমা না থাকলেও চলে। তাদের ধারণা— মানুষ কোনোরকম বিশ্রাম ছাড়াই যতক্ষণ ইচ্ছা কাজ করতে পারে। আমি দেখে আশ্চর্য হয়েছি যে শ্রমিকদের পঙ্গপালের মতো কারখানায় ঢোকানো হতো এবং মারধর করা হতো। আমি এসব দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছি, কারণ এসবই আমেরিকার ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্পর্কে আমার ধারণা সম্পূর্ণ উল্টে দিয়েছে।" (এই অংশটি আমেরিকার শ্রমিক আন্দোলনের মার্কসবাদী নেতা জোর্গের লেখা থেকে নেয়া)।

শাস্তি। সকাল ৭টার সময়ে নাস্তার জন্য আধঘণ্টা এবং দুপুর ১২টার সময়ে দুপুরের খাবারের জন্য আধঘণ্টা ছুটি দেওয়া হতো" (দেখুন, ২১, পৃ. ১৩২)। যে বস্ত্রশিল্পের বিকাশের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল শিল্পবিপ্লব, সেখানকার শ্রমিকদের অবস্থা বর্ণনা করতে যেয়ে কমনস লিখেছেন, "এটা সর্বজনবিদিত যে বস্ত্রশিল্পের অধিকাংশ শ্রমিক হলো ৬ থেকে ১৭ বছর বয়স্ক ছেলেমেয়েরাই। এমনকি সবচেয়ে দীর্ঘ গ্রীষ্মের দিনগুলোতে তাদের মাত্র আধঘণ্টা ছুটিসহ সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাজ করতে হতো। কারখানার মালিকেরা যদিও বা এসব শিশুশ্রমিকের শ্রমে সৃষ্ট সম্পদে হাবুডুবু খেতেন তথাপি মজুরি দিতেন এতই স্বল্প যে তাতে তাদের (শ্রমিকদের) খাবারের পয়সাও হতো না। এসব শিশুশ্রমিক এমন অবস্থায় বেড়ে উঠত, যাকে মরুভূমির আরবদের সঙ্গে তুলনা করা চলে। এদের ছয়জনের পাঁচজনই লিখতে ও পড়তে পারত না। যদি কোনো শিশু কারখানার কাজ ফেলে কখনো বা স্কুলে যেত সেক্ষেত্রে ঐ শিশুর সমগ্র পরিবারকেই কর্মচ্যুত করা হতো" (দেখুন ২১, পৃ. ৬১)।

সুতরাং পুঁজির প্রাথমিক সঞ্চয়ন ও শিল্পবিপ্লবের আমলের আমেরিকা কোনো অর্থেই অনুরূপ প্রক্রিয়ার ব্রিটিশ মডেলের (যা মার্কস "পুঁজি" গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করেছেন) সঙ্গে ভিন্নধর্মী নয়। আমেরিকার পুঁজিবাদী বিকাশে কোনো "মানবতাবোধ" বা "ব্যতিক্রমধর্মী" কোনো কিছু অনুসন্ধান করা বিজ্ঞানসম্মত নয়। ব্রিটেনের মতো আমেরিকাতেও শিল্পবিপ্লবের আমলে শিশু ও মহিলা শ্রমের ব্যাপক প্রসার লক্ষ করা যায়। যেমন- ১৮৩১ সালে রোড আইল্যান্ডের ৮,৫০০ শ্রমিকের ৩,৫০০ জনের বয়স ছিল ১২ বছর একই সময়ে নিউ ইংল্যান্ড, নিউইয়র্ক, নিউ জার্সি, পেনসিলভানিয়া, মেরিল্যান্ড ও ভার্জিনিয়ার সব শ্রমিকের ৫৮ শতাংশ মহিলা ও ৭ শতাংশ অনূর্ধ ১২ বছরের শিশু। ১৮৩২ সালে নিউ ইংল্যান্ডের কারখানা শ্রমিকদের ৪০ শতাংশেরই বয়স ছিল ১৬ বছরের নিচে (দেখুন ১৯, পৃ. ৩১)।

ইতোমধ্যে ১৮২০-১৮৩০-এর দশকেই আমেরিকার শ্রমিকশ্রেণি আত্মবিস্মৃত নীরব শ্রেণি থেকে আত্মসচেতন সরব শ্রেণিতে রূপান্তরিত হচ্ছিল। শ্রমিক ধর্মঘট ও ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। শ্রমিকশ্রেণি প্রথমে যে আন্দোলনটি শুরু করেছিল তার প্রধান দাবি ছিল "১০ ঘণ্টার শ্রমদিন"। যেমন ১৮২৭ সালে ফিলাডেলফিয়ার নির্মাণশ্রমিক, ১৮৩৩ সালে নিউইয়র্কের ছুতোর মিস্ত্রি ও জুতা কারখানার শ্রমিক, ১৮৪৫ সালে পিটসবার্গের শ্রমিক ও ১৮৪৬ সালে দক্ষিণ ব্রুকলিনের ডকশ্রমিকেরা ১০ ঘণ্টা শ্রমদিনের দাবিতে ধর্মঘট আহ্বান করে। ফিলাডেলফিয়া ও নিউইয়র্কসহ বেশ কয়েকটি শহরে শ্রমিকদের সংগঠন গড়ার কাজ

শুরু হয়ে গিয়েছিল। এসব সংগঠন তাদের কর্মসূচিতে শুধু অর্থনৈতিক দাবিদাওয়াই নয় (১০ ঘণ্টার শ্রমদিন, বিনেপয়সায় জমি, ব্যাংকের একচ্ছত্র অধিকার প্রতিরোধ ইত্যাদি), সেই সঙ্গে রাজনৈতিক দাবিও (পরোক্ষ নির্বাচন বাতিল করা, সর্বজনীন শিক্ষা চালু করা ইত্যাদি) অন্তর্ভুক্ত করেছিল।

উল্লেখ্য, আমেরিকার অর্থনৈতিক ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্বে শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলনের রাজনৈতিক মান যথেষ্ট উন্নত ছিল না। তার অন্যতম কারণ হলো ইউরোপ থেকে আগত শ্রমিকদের খুদে মালিক হওয়ার আকাঙ্ক্ষা এবং উত্তরোত্তর শ্রমিকের অধিক হারে পশ্চিমাভিমুখী অভিযান। আর তাই শ্রমিকদের ব্যাপকাংশ শ্রমিকশ্রেণির চেতনায় সমৃদ্ধ আন্দোলনে নয়, ভূমিপ্রাপ্তির আন্দোলনে অংশগ্রহণে প্রস্তুত ছিল। ১৮৪০ সালের "স্বাধীনতা পার্টি" এবং ১৮৪৮ সালে "স্বাধীন জমি পার্টি"তে সদস্যসংখ্যার বৃদ্ধি তারই পরিচায়ক।

আমেরিকার ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্বে শোষিতদের সশস্ত্র আন্দোলনের অন্যতম হলো দাস বিদ্রোহ। দাস ব্যবস্থাধীন আমেরিকাতে সর্বমোট ২৫০টি দাস বিদ্রোহের কথা জানা যায়। এসব দাস বিদ্রোহের মধ্যে যেগুলো আমেরিকার জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল সেগুলি হলো ওয়াইজের নেতৃত্বে ১৮২২ সালে দক্ষিণ ক্যারোলিনার দাস বিদ্রোহ, নাটা টার্নারের নেতৃত্বে ১৮৩১ সালে ভার্জিনিয়ার দাস বিদ্রোহ ও জন ব্রাউনের নেতৃত্বে ১৮৫৯ সালের দাস বিদ্রোহ।

গৃহযুদ্ধ পরবর্তী আমেরিকার অর্থনৈতিক বিকাশ যেমন একাধারে প্রাক্-মনোপলি পুঁজিবাদের দ্রুত বিকাশকাল, ঠিক তেমনি পুঁজিবাদী সমাজের সব দ্বন্দ্বেরও বিকাশকাল। পুঁজিবাদী শিল্পবিকাশের পাশাপাশি শ্রমিক শোষণের তীব্রতা বৃদ্ধি এবং শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষের বিক্ষোভও অব্যাহত থাকে। আমেরিকা এদিক থেকে ব্যতিক্রম নয়। বিশেষ করে আট ঘণ্টা শ্রমদিবসের দাবিতে ১৮৭৬ সালে পিটসবার্গ ও সেন্ট লুইয়ের ধর্মঘট এবং ১৮৭৭ সালে সানফ্রান্সিসকো ও পেনসিলভানিয়ার রেলশ্রমিকদের ধর্মঘট এদিক থেকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

গৃহযুদ্ধের পূর্ববর্তী সময়ে শ্রমিকদের সংগঠনগুলোর চরিত্র যেখানে আঞ্চলিক ছিল গৃহযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে সেগুলো জাতীয় পর্যায়ে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। ১৮৬৬ সালে ৬০টি ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের ৬০ হাজার সংগঠিত শ্রমিকের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ঢালাই কারখানার শ্রমিক উইলিয়াম সিলভিসের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে "ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়ন"। এই ইউনিয়নই সর্বপ্রথম ৮ ঘণ্টা শ্রমদিবসের দাবির সমর্থনে আমেরিকাব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তাব গ্রহণ করে। বালটিমোরে অনুষ্ঠিত

সংগঠনের প্রতিষ্ঠা সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, "আমেরিকার শ্রমিকশ্রেণিকে পুঁজিবাদের দাসত্বশৃংঙ্খল থেকে মুক্ত করার জন্য এই মুহূর্তে প্রথম ও প্রধান কাজ হলো এরূপ একটি আইন পাস করানো, যার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সব রাজ্যেই সাধারণ শ্রমদিবস হবে আট ঘণ্টা।" অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলো এই যে আমেরিকার ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়নের আট ঘণ্টা শ্রমদিবসের দাবি উত্থাপনের একমাস পরেই (১৮৬৬-এর সেপ্টেম্বরে) দাবিটি প্রথম আন্তর্জাতিকের জেনেভা কংগ্রেসের প্রস্তাবে "সারা দুনিয়ার শ্রমিকদের সাধারণ দাবি" হিসেবে গ্রহণ করা হয়। ১৮৬০-এর দশকে লেবার ইউনিয়নের আন্দোলনের ফলে যদিও বা রাষ্ট্রায়ত্ব কলকারখানায় আট ঘণ্টা শ্রমদিবসের আইন পাস হয় কিন্তু বাস্তবে আট ঘণ্টা শ্রমদিবস চালু হয়নি।

১৮৭০এর দশক— আমেরিকার শ্রমিক আন্দোলনের বিশেষ দশক। ১৮৭৪ সালে নিউইয়র্কে শ্রমিক জনসভায় পুলিশের গুলিবর্ষণ, ১৮৭৫ সালে পেনসিলভানিয়া অঞ্চলে কয়লা খনিশ্রমিকদের সংগঠনগুলোকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ এবং পরবর্তীকালে ১০জন শ্রমিকের মৃত্যুদণ্ড এবং ১৮৭৭ সালে রেল ও ইস্পাত কর্পোরেশনের লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের ধর্মঘট— এসবই শ্রমিক আন্দোলনকে একটি বিশেষ পর্যায়ে উন্নীত করে। ১৮৭০-এর দশকে যে সংগঠনটি আন্দোলনকে অদক্ষ শ্রমিকদের টেনে আনতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে তার নাম "নাইটস অব লেবার"। দক্ষ শ্রমিকদের সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে ১৮৮১ সালে গড়ে ওঠে "ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন"। পরবর্তীকালে এ সংগঠনের পরিবর্তিত নাম "আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার"। ১৮৮০-এর দশকের সব ধর্মঘট ও আন্দোলনের দাবি ছিল এক ও অভিন্ন: "আট ঘণ্টা শ্রমদিবস"। এই দশকে শ্রমজীবী মার্কিনরা শ্রমদিবস হ্রাসে সমর্থ হয়েছিল, তবে "আট ঘণ্টা শ্রমদিবসের" দাবি বাস্তবায়িত হয়নি।

উপসংহার

আমেরিকার অর্থনৈতিক ইতিহাসের স্বল্প তথ্যের ভিত্তিতে মার্কসের বিশ্লেষণই যথার্থ যে, "আমেরিকার আধুনিক ইতিহাস হলো পুঁজিবাদী সামাজিক উৎপাদনের দ্বন্দ্ব ও শ্রেণি লড়াইয়ের ইতিহাস" (দেখুন, ২২, পৃ. ৫২৬)। আর সামাজিক উৎপাদনের দ্বন্দ্ব ও শ্রেণিসংগ্রামের ভিত্তি স্থাপনকারী ক্ষেত্রসমূহ হলো— ঔপনিবেশিক শোষণের সমস্যা, দাসশ্রমের সমস্যা, ভূমি সমস্যা, মজুরি শ্রমিক উদ্ভবের সমস্যা, ইমিগ্রেশন সমস্যা, শ্রমদিনের সমস্যা, মজুরি সমস্যা, রাজস্ব খাজনা, মুদ্রা সমস্যা, কেন্দ্রীয় ব্যাংক গঠন, পণ্য-ট্যাক্স, জলাধার ও রেলওয়ে স্থাপন এবং পুঁজিবাদী একচেটিয়া কারবারের উদ্ভব।

আমেরিকার অর্থনৈতিক ইতিহাস প্রমাণ করে যে, তা বিপরীতধর্মী শ্রেণিসমূহের মধ্যে সামাজিক সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টির ইতিহাস নয়, "গণতান্ত্রিক" পুঁজিবাদ সৃষ্টির ইতিহাস নয়। আমেরিকায় শ্রমিকশ্রেণির জঙ্গি আন্দোলন কোনো দৈব ঘটনা নয়।

আমেরিকার অর্থনৈতিক ইতিহাসের বৈশিষ্ট্যই সেই বস্তুগত ভিত্তি সৃষ্টি করেছে যার ফলে আট ঘণ্টা শ্রম দিবসের আন্দোলন হয়েছে, মে দিবসের আন্দোলন জাতীয় চরিত্র লাভ করেছে, কিন্তু "আট ঘণ্টা শ্রম দিবস" বাস্তবায়িত হয়নি। ইউরোপের শ্রমিক শ্রেণি যেভাবে গড় উঠেছিল আমেরিকার শ্রমিকশ্রেণি সেভাবে গড়ে ওঠেনি। আমেরিকার শ্রমিকদের ব্যাপকাংশ এসেছিল ইউরোপ থেকে উচ্চ মজুরিতে কাজের আশায়, জমির মালিক হওয়ার আশায়। এক জায়গায় দীর্ঘদিন কাজ জোটেনি তাদের। পুঁজিবাদ বিকশিত হচ্ছিল দ্রুত, দ্রুত তা প্রাক্-মনোপলি থেকে মনোপলি স্তরে পৌঁছে গেল। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণি সেই হারে আত্মবিস্মৃত শ্রেণি থেকে রাজনীতিসচেতন শ্রেণিতে রূপান্তরিত হলো না। এগুলো হলো সেইসব ফাঁকফোকড় যার মধ্যে দিয়ে শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনে অনুপ্রবেশ ঘটেছে সুবিধাবাদ, পেটিবুর্জোয়া মতবাদ, সংস্কারবাদ, শ্রমিক অ্যারিসটোক্রেসির। যেমন শ্রমিক সংগঠন "নাইটস্ অব লেবারের" মতাদর্শগত ভিত্তি হলো পুজিবাদের ধীরে ধীরে সমবায় ব্যবস্থায় উত্তরণের পেটি বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি। "আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবারে"-এর প্রধান নেতৃদ্বয় হোমপার্স ও স্ট্রাসের ছিলেন সংস্কারবাদী এবং শ্রমিক আন্দোলনে বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি। ১৮৬০-এর দশকে শ্রমিকশ্রেণির ব্যাপকাংশের "গ্রিনবেকের" পার্টির সঙ্গে সংযুক্তির অর্থই হলো শ্রমিকশ্রেণি তার মুক্তির লক্ষ্যে নিজস্ব স্বাধীন রাজনৈতিক লাইনের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন নয়। পেটি বুর্জোয়া কল্পনাবিশারদ শ্রমিকনেতা আইরা স্টুয়ার্ড ও উইলিয়াম সিলভিস ট্রেড ইউনিয়নিজমের ঊর্ধ্বে উঠে শ্রমিকশ্রেণির শ্রেণিসংগ্রাম ও তার ঐতিহাসিক ভূমিকার সঠিক মূল্যায়ন করতে সমর্থ হননি। আমেরিকার শ্রমিকশ্রেণির এই দুইজন মহান নেতা ভাবতেন যে, "আট ঘণ্টার শ্রমদিবস প্রবর্তনই শ্রমিকশ্রেণির মুক্তির সব শর্ত পূরণ করবে"। প্রকৃত বিশ্লেষণে শ্রমদিবস হ্রাস শ্রমের মুক্তির পথে প্রথম পদক্ষেপমাত্র।

তথ্যনির্দেশ

১. M. ch. Thompson and M. Fr. Joes, *Economic Developmemt of the United State*. New York, 1939.

২. B. Seligman (ed). *Basis of Political Economy*. New York, 1938.

৩. J. B. Sanders *Early American History*–1492–1780. New York, 1941.

৪. F. A. Shanon, *Economic History of the People of the United States*. New York, 1934.

৫. J. F. Shepherd and S. Williamson, "The Coastal Trade of British North American Colonies – 1788-1772", *Journal of Economic History*, No. 33 (December 1972).

৬. Alice Hanson Jones, "Components of Private Wealth per Free Capita for the 13 Colonies by Region, 1774", U.S. Bureau of Census, *Historical Statitics, Colonial Times to 1970* (Seires Z) (Washignon D. C., 1976).

৭. James Henretta, "Economic Development and Social Structure in Colonial Boston", "*William and Mary Quarterly*, XXII: 1(January 1965).

৮. R. W. Fogel and S. I. Engerman, *Time on the Cross. The Economics of American Negro Slavery*. Boston, 1974.

৯. Albert W. Niemi, Jr. U. S. *Economic History* (2nd edn); Chicago, 1980.

১০. A. H Conrad and J. R. Meyer, "The Economics of Slavery in the Antebellum South," *Journal of Political Economiy*, April 1958.

১১. R. S. Starobin, *Industrial Slavery in the Old South*. New York, 1970.

১২. L. Harper, The Effect of the Navigation Acts on the Thirteen Colonies". R. B. Morriss (ed.), *The Era of the American Revolution.* New York, 1939.

১৩. M. R. Robertson and M.G. Walton, *History of the American Economy* (4th edn): New York, 1979.

১৪. G. Mayers, *History of American Billionaires* (Russian translation); Moscow, 1924.

১৫. Henry Cabot Lodge (ed.), *The Works of Alexander Hamilton.* New York, 1964.

১৬. A. L. Bogart, *Economic History of the USA* (Russian translation); Moscow, 1927.

১৭. B. F. Brandt. *Foreign Capital and Her Influence over the Economic Development* (Russian translation); Moscow, 1878.

১৮. D. North, *The Cambridge Economic History of Europe,* Vol. V. Cambridge, 1965.

১৯. L. B. Alter, Selected Works, *Bourgeiosie Political Econom of USA* (Russian translation); Moscow, 1971.

২০. A. Nevins, *Emergence of Modern America, 1865-1878.* New York, 1935.

২১. J. R. Commons (ed.), *A documentary History of American Industrial Society,* III. New York, 1958.

২২. K. Marx and F. Engels, *Collected Wories*, Vol 26. Moscow).

২৩. L. M. Primack and J. F. Willis, *An Economic History of the United State.* California, 1980.

২৪. Ye Agibalova and G. Donskoy, *History of the Middle Ages* (Moscow, 1988), pp 197-205.

২৫. A. Anikin, *The Yellow Devil–Gold and Capitalism.* Moscow, 1983.

গ্রন্থপঞ্জী

Agibalova, Ye., and Donskoy. G, *History of the Middle Ages. Moscow*: Progress Publishers, 1988.

Alter, L. B., *Selected Works. Bourgeiosie Politcal Economy of USA (in Russian: Ezbrannie Prizevedenie Bourgeiosnava Politichiskaya Ekonomia. Sch.* A). Moscow: Nauka, 1971.

Anikin, A., *The Yellow Devil– Gold and Capitalism*. Moscow: Progresss Publishers, 1983.

Bogart, A. L., *Economic History of the USA*. (in Russian: *Ekonomichiskaya Estoria Saedinnionnikh Statov*). Moscow, 1927.

Brandt, B. F., *Forieign Capital and her Influence over the Economic Development* (in Russian: Enostrannie Kapital, Ekh Veliania na Ekonomichiskoi Razvitia Strani), Moscow, 1898.

Conrad, A.H. and Meyer, J. R., "The Economics of Slavery in the Antebellum South". *Journal of Political Economy*, April 1958.

Commons., J. R. (ed.) *A Documentry History of American Industrial Soceity*. vol. VIII. New York, 1958

Harper, L., "The Effect of the Navigation Acts on the Thirteen Colonies". In Morriess. R. B. (ed.), *The Era of the American Revolution*. New York: Columbia University Press, 1939.

Fogel., R. W. and Engerman, S. L., *Time on the Cross. The Economics of American Negro Slavery*. Boston: Little, Brown & Company, 1974.

Henretta, James., "Economic Development and Social Structure in Colonial Boston", *William and Mary Quarterly* XXII: 1, January 1965.

Jones, Alice Hanson., "Wealth Estimates for the American Middle Colonies, 1774", *Economic Development and Cultural Change*, XVIII: 4, July 1970.

Jones, Alice Hanson., "Wealth Estimates for the New England Colonies, After 1770", *Journal of Economic History*, XXXII: 1, March 1972.

Jones, Alice Hanson., "Components of Private Wealth per Free Capita for the 13 Colonies by Region, 1774", US Bureau of Census, Historical *Statistics, Colonial Times to 1970*, Series Z. Washington, D. C.: U. S. Government Printing Office, 1976.

Lodge, Henry Cabot (ed.), *The Works of Alexander Hamilton*. New York, 1964.

Marx, K. and Engels. F., *Collected Works (in Russian: Polnoe Sobranenia Sochinianie*), Vol. 1. Moscow. 1924.

Mayers, G., *History of American Billionaires (in Russian: Estoria Amerikasnskikh Billionairob)*, Vol. 1. Moscow, 1924.

Nevins, A., *Emergence of Modern America*–1865–1878. New York, 1935.

Niemi, Jr. and Albert W., U. S. *Economic History*. Second edn; Chicago: Rand Mc.Nally College Publishing Company, 1980.

North, D., *The Canbridge Economic History of Europe*. Vol. VI. Cambridge, 1965.

Primack, L. M. and Willies. J. F., *An Ecnonomic History of the United States*. California: The Ben‡jvamin/Cunnings Publishing Company, Inc., 1980.

Robertson, M. R. and Walton, M. G., *History of the American Economy*. 4th edn; NY: Harcourt Brace Jovanovich, Inc, 1979.

Sanders, J. B. *Early American History – 1492-1789*. New York, 1941.

Seligman, B. (ed.), *Basis of Politcal Economy*, New York, 1938.

Shannon, F. A. *Economic History of the Peoples of the United States*. New York, 1934.

প্রবন্ধ ৭

বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতি: বিতর্ক, পদ্ধতিগত সমস্যা ও সমাধান

প্রসঙ্গকথা: *এই প্রবন্ধটির রচনাকাল ১৯৮১-৮৩, আর প্রকাশকাল ১৯৮৪। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল* ***সমাজ, অর্থনীতি, রাষ্ট্র জর্নাল****-এ (খণ্ড ১, সংখ্যা ১, জুলাই সেপ্টেম্বর ১৯৮৪, পৃ. ৬৩-১৩০)। প্রবন্ধের রচনাকাল ও প্রকাশকালীন সমসাময়িক সময়ে এ দেশের উৎপাদন পদ্ধতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস নিয়ে অ্যাকাডেমিক ও রাজনৈতিক মহলে বেশ তর্ক-বিতর্ক হচ্ছিল। আর এসব তর্ক-বিতর্কের সাথে বামপন্থী রাজনীতিকদের রাজনৈতিক রণনীতি ও রণকৌশলেরও সংশ্লেষ ছিল। তবে এসবের এক-দু দশক পরে "উৎপাদন পদ্ধতি" অনুসন্ধানের বিষয়টি স্তিমিত হয়ে যায়। আবার এই একবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে দেখা যাচ্ছে অনেকেই মনে করছেন যে আমাদের দেশের উৎপাদন পদ্ধতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন-এর বিষয়টি অনেক কারণেই গুরুত্বপূর্ণ। অন্তত এ কারণে হলেও ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত এ প্রবন্ধটি চিন্তার খোরাক জোগাতে সক্ষম।*

প্রবন্ধের লক্ষ্য

বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতি (Mode of Production) ও তার উপাদান প্রসঙ্গে বিতর্ক নতুন কিছু নয়। এ বিতর্কের বয়সকাল স্বাধীন বাংলাদেশের বয়সেরও অধিক। সন্দেহ নেই যে, উৎপাদন পদ্ধতির বিতর্কে ক্রমশই অধিক হারে অংশগ্রহণ করছেন দলমতনির্বিশেষে রাজনীতিবিদরা ও সামাজিক বিজ্ঞানের সব শাখা-প্রশাখার বিশেষজ্ঞরা। আজ অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে যে, "অনেক সময় সমস্যা সমাধানের চেয়ে, সঠিক প্রশ্ন উত্থাপনই ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ" হেগেলীয় এই উক্তিটি বাংলাদেশের বিদ্যমান উৎপাদন পদ্ধতিসংক্রান্ত বিতর্কের ক্ষেত্রে খুবই প্রযোজ্য।

কেন এই বিতর্ক? কেনই বা নির্ধারক উৎপাদন পদ্ধতি (dominant mode of production) নির্ধারণের চেষ্টা? বিতর্কের বর্তমান ধরনটা কীরূপ? মূল সমস্যাগুলো কোথায়? কীভাবে এসব সমস্যার সমাধান সম্ভব? এগুলো খুবই স্বাভাবিক প্রশ্ন। এসব প্রশ্নকে সামনে রেখে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণমূলক কিছু বক্তব্য উপস্থাপন করা এ প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য।

উৎপাদন পদ্ধতি– রাজনীতি ও গবেষণা

শুরুতেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আজকের যে ভৌগলিক আয়তন নিয়ে বাংলাদেশ গঠিত এখানে উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে বিতর্কের শুরু করেন বামপন্থী রাজনীতিবিদরা– প্রথমে কমিউনিস্ট পার্টি (১৯৫০-এর দশকে), তারপর 'চীনাপন্থীরা' (১৯৬০-এর দশকের শেষার্ধে যেমন আবদুল হক ১৯৬৮), পরবর্তী সময়ে বাম ও গণতন্ত্রীরা। এমনকি, আওয়ামী লীগও এ বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করে। কারণ, ক্ষমতাসীন দল হিসেবে উন্নয়নের পথ অনুসরণের সমস্যা তাদের সামনে ছিল প্রকট। আর সামাজিক বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞরা উৎপাদন পদ্ধতির বিতর্ক শুরু করেন মূলত ১৯৭০-এর দশকে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কেন বাম রাজনৈতিক মহলে উৎপাদন পদ্ধতি নিয়ে এত আগে বিতর্ক উত্থাপিত হয়েছিল। আমার দৃষ্টিতে এর পেছনে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত কমপক্ষে দুটি কারণ কাজ করেছে:

প্রথমত; মার্কসবাদীরা প্রত্যেক সমাজকে দেখেন নির্দিষ্ট সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার (Social-economic formation) নিরিখে। তাই যেকোনো সমাজব্যবস্থার (আদিম সাম্যবাদী, দাস, সামন্ত, পুঁজিবাদী, সাম্যবাদী) অর্থনৈতিক, সামাজিক, মতাদর্শগত, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য কার্যাবলীর বিশ্লেষণই মূল কথা। আর সমাজে বিদ্যমান উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা ছাড়া এসব বিষয়ে বিজ্ঞান সম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

দ্বিতীয়ত; উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা ব্যতীত যথার্থ রাজনৈতিক রণকৌশল নির্ধারণ সম্ভব নয়। সমাজের উৎপাদনসম্পর্ক (Production relation) ও উৎপাদিকা শক্তি (Productive force) সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা ছাড়া সঠিক উৎপাদন পদ্ধতি নির্ধারণ অসম্ভব।

দাস, সামন্ত ও পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা বিপরীতধর্মী শ্রেণিভিত্তিক সমাজব্যবস্থা। কোনোটিরই শ্রেণিভিত্তি আপনা-আপনি অবলুপ্ত হয় না। অবলুপ্ত হওয়া অথবা এক শ্রেণিভিত্তিক সমাজের পরবর্তী পর্যায়ে উত্তরণ হয়েছে সচেতন শ্রেণিসংগ্রামের মাধ্যমে তথা সামাজিক বিপ্লবের ফলে। এখানে শ্রেণিভিত্তিকতা হলো সামাজিক বিপ্লবের বস্তুনিষ্ঠ (objective) শর্ত এবং সচেতন মানুষের শ্রেণিসংগ্রাম ও তার সংগঠন হলো সামাজিক বিপ্লবের চেতনানির্ভর (subjective) শর্ত। সেটাই যদি ঐতিহাসিক বিকাশের মূল কথা হয়, তাহলে খুবই স্বাভাবিক যে নির্দিষ্ট সমাজের নির্ধারক উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা ছাড়া সঠিক বিপ্লবী হওয়া যায় না; আর তা না হলে বিপ্লবকে সঠিক পথে পরিচালিত করাও সম্ভব নয়। বস্তুত বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করাটাই সাচ্চা বিপ্লবীর ও বিপ্লবী সংগঠনের প্রধান দায়িত্ব।

সুতরাং ১৯৫০-এর দশকে নয়, তারও বহু আগে, এ শতাব্দীর ২০ দশকের দিকেও যদি এ দেশের বাম রাজনীতিবিদরা ব্রিটিশ শাসনাধীন বাংলার উৎপাদন পদ্ধতি নিয়ে ভাবনাচিন্তা করেন তাতেও আশ্চর্যের কিছু নেই (এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য: এম এন রায়-১৯৭২, রজনী পাম দত্ত-১৯৪৯, মুজাফফর আহম্মদ-১৯৭৭)।

উল্লেখ্য, ১৯৭০-এর দশকের আগে পর্যন্ত উৎপাদন পদ্ধতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে বাম রাজনীতিবিদগণ যতটুকু না মার্কসীয় অর্থনীতির প্রত্যয়সমূহ (categories) প্রয়োগ করেছেন তার চেয়ে অধিকতর গুরুত্বসহকারে ব্যবহার করেছেন রাজনৈতিক প্রত্যয়সমূহ। ক্ষেত্রবিশেষে উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধানের আগেই একটি "নির্ধারক উৎপাদন পদ্ধতি" (dominant mode of production) ঠিক করে নেওয়া হয়েছে। আর তাই ১৯৫০-১৯৭১ সময়কালে যথাযথ বিশ্লেষণ ছাড়াই "আধা সামন্তবাদ" (semi feudalism) ছিল মোটামুটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত উৎপাদন পদ্ধতি। তখন বিতর্কের বিষয়বস্তু ছিল ব্যাখ্যার ধরন, প্রকাশের ধরন ও রাজনৈতিক রণকৌশল। প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে অর্থনীতির চেয়ে রাজনীতির অগ্রাধিকার যে একটি গৌণ সমস্যা ছিল না তা আজকে সহজেই অনুমেয়। সম্ভবত এ কারণেই মার্কসীয় রাজনৈতিক অর্থনীতির (Political economy) বিষয়বস্তু, প্রত্যয় ও সূত্রাবলী এবং পদ্ধতি ইত্যাদি প্রশ্ন গুরুত্বসহকারে চর্চার বিশেষ নির্দেশ নিজেদের কর্মীদের প্রতি দেয় না এমন বাম সংগঠন আজ অনুপস্থিত।

উৎপাদন পদ্ধতিসম্পর্কিত বিতর্কের শুরুর দিকে আমাদের দেশে সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিশেষজ্ঞরা যে উদাসীন ছিলেন কিংবা উৎপাদন পদ্ধতি নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতেন না এটা দোষ-গুণের প্রশ্ন নয় (অনেকে প্রশ্নটা এভাবেই উত্থাপন

করে থাকেন)। প্রশ্ন হচ্ছে অনুকূল বাস্তব পরিবেশের অথবা পরিপ্রেক্ষিতের (contextual অর্থে)। কেননা ঔপনিবেশিক পরিবেশে উপরোক্ত মৌলিক বিষয়ে চিন্তাভাবনা করার অনুকূল পরিবেশ কদাচিৎ বিদ্যমান থাকে। তবু সে অবস্থারও ব্যতিক্রম লক্ষণীয় যেমন এম এন রায়, মুজাফ্‌ফর আহম্মদ, রজনী পাম দত্ত প্রমুখের রচনাবলী। সুতরাং আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, আমাদের অধিকাংশ পূর্বসূরী ও আজকের অর্থনীতিবিদরা জ্যা বাতিস্ত সেঁই, জন স্টুয়ার্ট মিল, কলিন ক্লার্ক, জন মেইনার্ড কেইনস্, হ্যারোড, ফ্রিডম্যান, রস্টো, স্যামুয়েলসন, টিনবারজেন এদের এক বা একাধিকের দৃষ্টিভঙ্গিকে সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত মনে করেন। সে রকম বিস্ময়ের কিছু নেই যদি সমাজবিজ্ঞানের কোনো বিশেষজ্ঞ যেমন পারসনস, মার্টন, ভেবলেন, ওয়েভার, ডাহরেনডফ, বেনডিক্স, লিপসেট, কলিনস, এটজিওনি, দানিয়েল বেল-এর সমাজদর্শনকে সবচেয়ে বিজ্ঞানসম্মত ভাবেন। অতীতে এটাই স্বাভাবিক ছিল। আর তাই উৎপাদন পদ্ধতির চেয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, নির্দিষ্ট সমাজব্যবস্থা ও শ্রেণিকাঠামোসংক্রান্ত মুখ্য সমস্যাবলীর চেয়ে গৌণ সমস্যাসমূহ অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞানে প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। আবার সামাজিক বিজ্ঞানের ব্যাপক অংশের চিরাচরিত ধারণায় মতানৈক্য দেখা দিচ্ছে। এটাও ঐতিহাসিক বিকাশের স্বাভাবিক ফল। কারণ ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি মানবসমাজের চিন্তাজগতে বিপ্লব ঘটিয়েছে মার্কসবাদ; আর সে সময়েই আমাদের সামন্ততান্ত্রিক সমাজে অনুপ্রবেশ ঘটেছে পুঁজিবাদের উপাদান। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের মধ্যেই বিশ্ব পুঁজিবাদের একক প্রাধান্য দূরীভূত হয়েছে; সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী সমাজব্যবস্থার আবির্ভাব ঘটেছে। তার স্বাভাবিক প্রভাব পড়েছে আমাদের তৎকালীন প্রথমসারির চিন্তাবিদদের ভাবনায় (এমনকি আংশিকভাবে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-চেতনায়)। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ব্রিটিশদের "বিভক্ত কর শাসন কর" ("Divide and Rule") নীতির ভিত্তিতে আমাদের মাতৃভূমিকে ঔপনিবেশ থেকে আধা ঔপনিবেশে রূপান্তর; ঠিক সমসাময়িককালে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক শ্রমবিভাগের আবির্ভাব; ১৯৬০-এর দশকে পরাধীন দেশসমূহের স্বাধীনতা অর্জন। ১৯৭০-এর শুরুতে আমাদেরও রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন এবং শুরু থেকেই উন্নয়নের পথ অনুসরণের সমস্যা। আজ সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদ-অনপেক্ষ উৎপাদনের (absolute production) দিক থেকে প্রায় সমান শক্তিধর। ইতিহাসই প্রকৃত সাক্ষী যে আজ সমাজতন্ত্র বিকাশমান, পুঁজিবাদ ক্ষয়িষ্ণু সমাজব্যবস্থা। বিকাশের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক শর্তসমূহের এরূপ অবস্থায় আমাদের দেশের সামাজিক বিজ্ঞানীদের এক উল্লেখযোগ্য অংশ উৎপাদন

পদ্ধতি অনুসন্ধান করবেন; সঠিক অনুসন্ধানের পদ্ধতি ও পথ বাতলাবেন এবং আরও কিছু অগ্রসর হলে যে এ প্রশ্নে "গবেষণা-রাজনীতি" সমন্বিত হবে সেটাই স্বাভাবিক।

উৎপাদন পদ্ধতি ও তৎসম্পর্কিত উপাদানসমূহ

উৎপাদন পদ্ধতি কী? তার উপাদানসমূহ কী কী? বিভিন্ন উপাদানের আন্তঃসম্পর্ক কেমন? উৎপাদন পদ্ধতির সাথে সমাজের উপরিকাঠামোর (superstructure) সংযোগ কোথায়? উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সম্পর্ক কী ধরনের? আর্থসামাজিক ব্যবস্থার চরিত্র উদ্‌ঘাটনে প্রাথমিক ও দ্বিতীয় পর্যায়ের আঙ্গিক উপাদানসমূহ নির্ধারণসংক্রান্ত প্রশ্নগুলো খুবই মৌলিক। আমাদের উৎপাদন পদ্ধতির বিতর্ক এখন এমন একটা চরম ও অমীমাংসিত স্তরে এসে পৌঁছেছে যে উপরোক্ত প্রশ্নসমূহের নবতর বিশ্লেষণ প্রয়োজন। উল্লেখ্য, চিরায়ত মার্কসবাদে মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লবের তত্ত্বের ওপর রচিত বই-পুস্তক, প্রবন্ধ, চিঠিপত্রে উল্লিখিত প্রশ্নসমূহের মীমাংসার পদ্ধতিসূত্র বিরাজমান। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য কার্ল মার্কসের "পুঁজি", 'রাজনৈতিক অর্থনীতির সমালোচনা প্রসঙ্গে", "অর্থনৈতিক পাণ্ডুলিপি ১৮৫৭-১৮৫৯"; ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসের "অ্যান্টি-ডুরিং" ও "পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি"; ভ ই লেনিনের "রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ', "তথাকথিত বাজার প্রসঙ্গে", "সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর" ইত্যাদি গ্রন্থে বিশ্লেষিত বিষয়াদি।

উল্লিখিত প্রশ্নাবলী চিরায়ত মার্কসবাদে কীভাবে একে অপরের সাথে সম্পর্কিত এবং উৎপাদন পদ্ধতির মূল উপাদানসমূহ, উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদনসম্পর্কের নির্ধারক উপাদানসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক স্ববিশ্লেষিত ছকের সাহায্যে দেখানো যেতে পারে (দেখুন, ছক-৯)।

ছক ৯: সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও তার কাঠামোগত উপাদানসমূহ

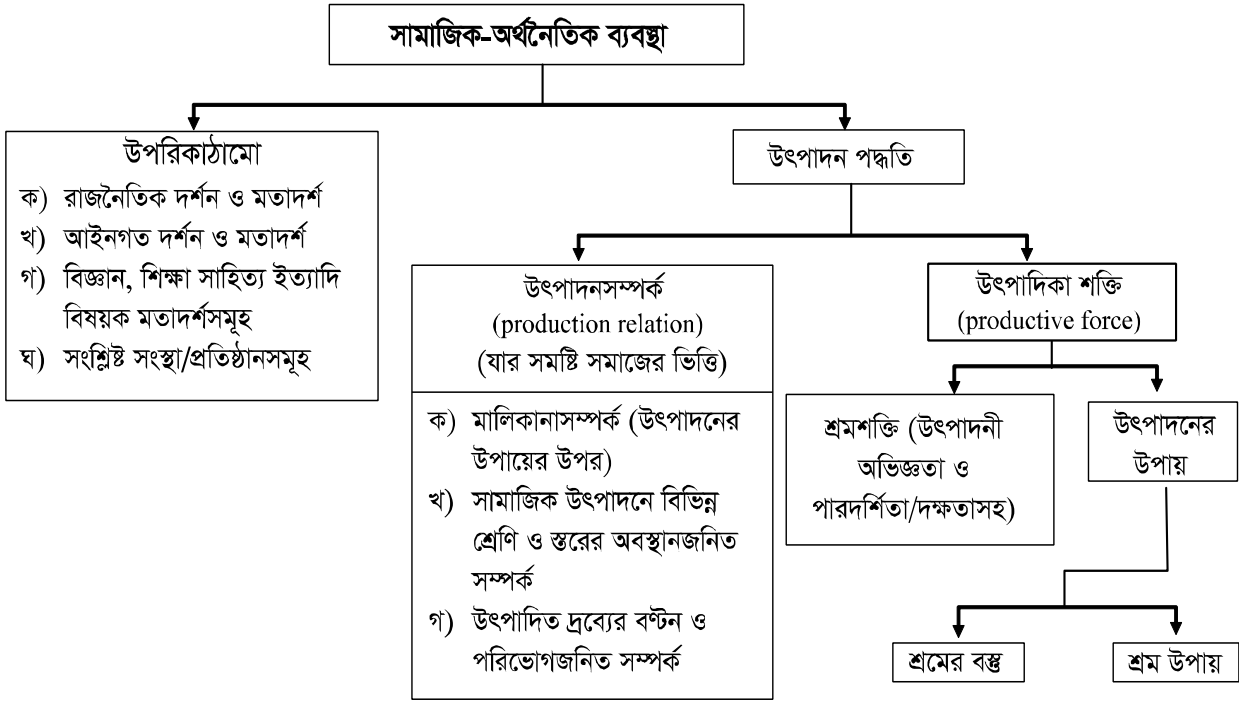

সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রসঙ্গে কয়েকটি মৌলিক বিষয় নিচে উল্লেখ করা হলো:[৫২]

ক. সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, উৎপাদন পদ্ধতি, উৎপাদিকা শক্তি, উৎপাদনসম্পর্কও শ্রেণিকাঠামোর পারস্পরিক সম্পর্ক এবং তাদের বিকাশ চেতনানির্ভর নয় বরং চেতনানিরপেক্ষ।

খ. নির্দিষ্ট উৎপাদন পদ্ধতি হলো নির্দিষ্ট উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কসমূহের দ্বান্দ্বিক ঐক্য। নির্দিষ্ট উৎপাদন পদ্ধতি শ্রমশক্তিতে (labour power) উৎপাদনের উপায়সমূহের (means of production) সাথে নির্দিষ্টভাবে যোগসূত্র ঘটায়। অতএব নির্দিষ্ট উৎপাদন পদ্ধতিতে উৎপাদনের উপায় ও উৎপাদিত দ্রব্যের ওপর নির্দিষ্ট ধরনের মালিকানা থাকতেই হবে। নির্দিষ্ট ধরনের উৎপাদন পদ্ধতি নির্দিষ্ট শ্রেণিকাঠামোর (class structure) জন্ম দেয়।

গ. উৎপাদিকা শক্তির বিকাশকে তিন পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে: যথা, প্রাক্-শিল্প (pre-industrial) যুগ, শিল্প যুগ (industrial), ও বৈজ্ঞানিক-কারিগরি বৈপ্লবিক যুগ (based on scientific-technological revolution)। মানুষ প্রকৃতিকে কতটুকু জয় করতে পেরেছে সেটা নির্ধারিত হয় উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের মাধ্যমে। প্রাক্-পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির সাথে প্রাক্-শিল্প যুগের উৎপাদিকা শক্তি সামঞ্জস্যপূর্ণ। পরবর্তী উৎপাদন পদ্ধতিসমূহের সাথে শেষোক্ত উৎপাদিকা শক্তির সহাবস্থান সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে সে সামঞ্জস্য পুঁজিবাদের জন্য নির্ভেজাল নয়। কারণ, বিকাশের নির্দিষ্ট স্তরে পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি ও বৈজ্ঞানিক কারিগরি বিপ্লব-উদ্ভূত উৎপাদিকা শক্তির সহাবস্থান অসঙ্গতিপূর্ণ।

ঘ. উৎপাদনসম্পর্ক হলো উৎপাদন প্রক্রিয়ায় একের সাথে অন্যের সম্পর্ক (মূল সম্পর্কসমূহ দেখুন ছক ৯-এ) এবং উৎপাদিকা শক্তি ব্যবহারের সামাজিক পদ্ধতি। যে সম্পর্ক হতে পারে আদিম সাম্যবাদী, দাস,

[৫২] যেগুলোর কয়েকটি অদ্যাবধি আমাদের দেশের উৎপাদন পদ্ধতি বিতর্কে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। যেমন গ, ঙ, ছ-এ উল্লিখিত বিষয়সমূহ।

সামন্ত, পুঁজিবাদী, সাম্যবাদী ও বিভিন্ন ধরনের অন্তর্বর্তীকালীন (different intermediary forms and types of production relations)।

ঙ. সব উৎপাদকই নির্ধারক বা নিয়ামক উৎপাদন পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হতে পারে না। যেমন খুদে পণ্য উৎপাদক (petty-commodity producer)। এ রূপান্তরে প্রয়োজন (necessary) ও পর্যাপ্ত (sufficiient) শর্তের উপস্থিতি আবশ্যক। নতুন উৎপাদন পদ্ধতি আগমনের পূর্বশর্ত হলো পুরাতন উৎপাদন পদ্ধতির মূল মালিকানাসম্পর্ক অস্তিত্বের শর্ত উচ্ছেদ করা। আবার একটা উৎপাদন পদ্ধতির অর্থই অন্য উৎপাদন পদ্ধতির সরাসরি অভ্যুদয় নয়। যেমন সামন্ততান্ত্রিক ব্যক্তিনির্ভরতা উচ্ছেদের ফলে নতুন পুঁজিবাদী উৎপাদনের আগমন ঘটে; কিন্তু প্রথমটা দ্বিতীয়টির আগমনের সরাসরি উপাদান নয় (এ প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনা করেছেন সোভিয়েত রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ স্যাগোলভ, ১৯৭৫)।[৫৩]

চ. নির্দিষ্ট সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতে এক বা একাধিক উৎপাদন পদ্ধতি সহাবস্থান করতে পারে। একাধিক উৎপাদন পদ্ধতিসংবলিত সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অন্যান্য সব উৎপাদন পদ্ধতির বিকাশধারা নির্ধারক উৎপাদন পদ্ধতি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হবে।

ছ. স্থান-কাল-পাত্রভেদে ইতিহাসে সবসময়ই যে কোনো না কোনো নির্ধারক উৎপাদন পদ্ধতি বিরাজ করবে, এমন কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই। যেমন উত্তরণমুহূর্তের অর্থনীতি (transitional economy)। এ ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট উৎপাদনসম্পর্কের প্রাধ্যান্য বজায়কারী প্রবণতা (production relation determining the leading tendency of development) থাকতে পারে, যেটা স্থান-কাল-পাত্রভেদে বিভিন্ন মাত্রায় দীর্ঘ হতে পারে এবং ঐ উৎপাদনসম্পর্ক সহজাত নির্ধারক উৎপাদন পদ্ধতিতে উত্তরিত হতেও পারে-নাও হতে

[৫৩] পরবর্তী সময়ে ইংরেজি অথবা রুশ ভাষায় লিখিত প্রবন্ধ অথবা পুস্তক, যেখান থেকেই উদ্ধৃতি দেওয়া হোক না কেন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুবাদ প্রবন্ধকারের নিজের। মার্কস-এঙ্গেলসের উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে রচনাসমগ্র, তৃতীয় রুশ সংস্করণ, এবং লেনিনের ক্ষেত্রে রচনাসমগ্র, পঞ্চম রুশ সংস্করণ।

পারে (এ প্রসঙ্গে 'বিকল্প চিন্তার' ভিত্তি ও উপাদান নিয়ে পরে এ প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে)।

জ. নির্ধারক উৎপাদন পদ্ধতি যেমন উপরিকাঠামোর গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করে তেমনি উপরিকাঠামোরও আপেক্ষিক স্বাধীন ভূমিকা আছে। রাষ্ট্রশক্তি অর্থনৈতিক বিকাশকে তিনভাবে প্রভাবান্বিত করতে পারে। ঐ বিকাশে রাষ্ট্রশক্তি হতে পারে ধনাত্মক প্রভাবক, ঋণাত্মক প্রভাবক অথবা স্থবিরতার এজেন্ট। এ মর্মে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক বিকাশচরিত্র বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ব্লকের কাছে লেখা এঙ্গেলসের চিঠিটি পদ্ধতিগত দিক থেকে অতি গুরুত্বপূর্ণ। এঙ্গেলস লিখেছেন, "... ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা অনুসারে বাস্তব জীবনের উৎপাদন ও পুনরোৎপাদনই হচ্ছে ইতিহাসে শেষপর্যন্ত নির্ধারক বস্তু। এর বেশি কিছু মার্কস বা আমি কখনো বলিনি। অতএব কেউ যদি তাকে বিকৃত করে এই দাঁড় করায় যে– অর্থনৈতিক ব্যাপারই হচ্ছে একমাত্র নির্ধারক বস্তু, তাহলে সে প্রতিপাদ্যটিকে একটি অর্থহীন, অমূর্ত, নির্বোধ উক্তিতে পরিণত করে। অর্থনৈতিক পরিস্থিতি হলো ভিত্তি, কিন্তু উপরিকাঠামোর বিভিন্ন বস্তু যেমন, শ্রেণিসংগ্রামের রূপগুলো এবং তার ফলাফল ... ঐতিহাসিক সংগ্রামগুলোর গতিকে প্রভাবিত করে এবং বহু ক্ষেত্রে তাদের রূপ নির্ধারণে প্রধান হয়ে ওঠে"(দেখুন এঙ্গেলস, ফ্রেডরিখ, Collected works of Marks-Engels, Vol. 20)।

বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতি– একাডেমিক[৫৪] বিতর্ক

বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতি নিয়ে সুশৃঙ্খল, সুসংবদ্ধ ও পদ্ধতিনির্ভর বিতর্ক শুরু হয় ১৯৭০-এর দশকে। "একক থেকে সমগ্রে ও সমগ্র থেকে এককে"– উৎপাদন পদ্ধতি নির্ধারণে এ পদ্ধতি প্রয়োগের চেষ্টা করা হয়। ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণের চেষ্টা চলে। বেশ কিছু প্রবন্ধ, পুস্তক, রচনা, সেমিনার (এমনকি রাজনৈতিকভাবে একমত নন অথচ উৎপাদন পদ্ধতিকে ইস্যু করে পেশাদার গবেষকদের সমবেত সেমিনার) আয়োজন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রির জন্য

[৫৪] শুধু পেশাদার অর্থে এ্যাকাডেমিক নয়। রাজনৈতিক মহলেও কেউ কেউ অবস্থান করছেন, যাদের বিশ্লেষণ তুলনামূলক গভীর, তাদেরও এ্যাকাডেমিক মহলের প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে ছক ১০-এ নামের পাশে রাজনীতিবিদ বোঝাতে 'রা' চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাধান্যের দিক থেকে ক্ষেত্রবিশেষে বিশেষ/নির্দিষ্ট সেক্টরের (বিশেষ করে কৃষি ও বাণিজ্য) উৎপাদনসম্পর্ক ও উৎপাদিকা শক্তি আলোচিত হয়েছে।

রচনাও বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে ঘটে থাকে। অবশ্য পেশাদার সামাজিক বিজ্ঞানিদের অংশগ্রহণের মান ও মাত্রা যাই হোক না কেন এসবই ঘটেছে ও ঘটছে মূলত: উৎসাহী একাডেমিক মহলে[৫৫]। রাজনৈতিক মহলো এটাকে সাহায্য করছে, অনুপ্রাণিত করছে এবং ক্ষেত্রবিশেষে সংগঠিত করছে।

বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতি নির্ধারণে একাডেমিক মহলে কত ধরনের মতামত আছে, কে কি বলছেন, কে কাকে অনুসরণ করছেন, কে কোন প্রত্যয়ের বিশ্লেষণে প্রাধান্য দিচ্ছেন– এসব প্রশ্ন উৎপাদন পদ্ধতি বিতর্কের প্রাথমিক সরল শ্রেণিবিন্যাসের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এসব প্রশ্নের ভিত্তিতেই আমরা নিম্নের সরল শ্রেণিবিন্যাস করেছি (দেখুন, ছক ১০):

নিম্নল্লিখিত ছক ১০ থেকে আমাদের দেশে উৎপাদন পদ্ধতির বিতর্কসংশ্লিষ্ট যেসব উপাদান সাধারণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে সেগুলো হলো:

ক. মোটামুটি সব বিশেষজ্ঞই মূর্ত উৎপাদন পদ্ধতিকে সূত্রবদ্ধ করছেন (formulation of mode of production);

খ. সূত্রগুলো হলো বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতি হয় আধা-সামন্তবাদী আধা-পুঁজিবাদী, অথবা পুঁজিবাদী অথবা খুদে কৃষক উৎপাদন পদ্ধতি, অথবা খুদে পণ্যভিত্তিক উৎপাদন পদ্ধতি, অথবা আধা-সামন্তবাদী, অথবা ঔপনিবেশিক, অথবা আধা-ঔপনিবেশিক–আধা এশিয়াটিক–আধা-পুঁজিবাদী ইত্যাদি।

গ. মোটামুটি সবাই বিভিন্ন মাত্রায় মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের উদ্ধৃতি দিচ্ছেন, সেই সাথে "নয়া-মার্কসবাদী" ও র‍্যাডিকেলদের বিশ্লেষণের গুরুত্ব দিচ্ছেন;

ঘ. প্রায় সবাই নিজের বিশ্লেষণপদ্ধতিকে মার্কসবাদী হিসেবে ঘোষণা করছেন;

ঙ. উৎপাদন পদ্ধতি বিশ্লেষণে সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদ উভয় ব্যবস্থার মার্কসীয় রাজনৈতিক-অর্থনীতির প্রত্যয়সমূহ আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করছেন;

---

[৫৫] অর্থাৎ পেশাগত দিক থেকে রাজনীতিবিদ নন, তবে বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

ছক ১০: বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে বিভিন্ন মতামতের সরল শ্রেণিবিন্যাস[৫৬]

নির্ধারক উৎপাদন পদ্ধতির নাম	গবেষকের নাম	কাকে অনুসরণ করছেন		বিশেষ গুরুত্বারোপিত প্রত্যয়সমূহ	প্রকৃত সারার্থ
		আনুষ্ঠানিক ভাবে	প্রকৃতপক্ষে		
গ্রুপ ১: অপেক্ষাকৃত সুবিশ্লেষিত ও ব্যাপক সমর্থিত					
ক. আধা-সামন্তবাদ আধা-পুঁজিবাদ	মহিউদ্দিন আলমগীর, অজয় রায় (রা), আবদুল হক (রা)	মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, মাও সেতুং	আংশিকভাবে চিরায়ত মার্কসবাদ, সামির আমিন, ইমানুয়েল, ভাদুরী	জমিদারী প্রথা, ভাগচাষ, ইজারা, মহাজনী, পণ্য, মজুরি, শ্রম	সামন্তবাদ (ক্ষেত্রবিশেষে অস্পষ্ট)
খ. পুঁজিবাদ (ডানে বামে বিভিন্ন বিশেষণসহ)	আখলাকুর রহমান, বোরহান উদ্দিন খান জাহঙ্গির	মার্কস, লেনিন	আংশিক ভাবে চিরায়ত মার্কসবাদ, (বিশেষ করে লেনিন, সামির আমিন	সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদের মূল প্রত্যয়সমূহ, শিল্প পুঁজি ও বণিক পুঁজির বিকাশ	পুঁজিবাদ

[৫৬]বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতি নির্ধারণে বিভিন্ন মতামতের শ্রেণিবিন্যাসটি সরল প্রকৃতির এবং নিঃসন্দেহে যথেষ্ট মতভেদের অবকাশ রাখে। এ ধরনের শ্রেণিবিন্যাসকে আরো বিজ্ঞানসম্মত করতে হলে ছকে উপস্থাপিত প্রত্যেক গবেষক ও বিভিন্ন নির্দেশক সম্পর্কে আরো গবেষণা প্রয়োজন। এ প্রবন্ধে শ্রেণিবিন্যাসটি উপস্থাপন করার মূল লক্ষ্য হলো আলোচিত প্রশ্নে বিভিন্ন গবেষকের অবস্থানকে চাক্ষুষ দেখানোর প্রচেষ্টা এবং সেটা এর আগে কেউ করেছেন বলে আমার জানা নেই। শ্রেণিবিন্যাসটি সম্পর্কে উল্লেখ করা উচিত যে (১) গবেষকদের নামফর্দে শুধু তাদের নামোল্লেখ করা হয়েছে, যারা উৎপাদন পদ্ধতি প্রসঙ্গে তুলনামূলক গভীর বিশ্লেষণের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট উপসংহারে উপনীত হয়েছেন। এ কারণেই "ক" সাব-গ্রুপে প্রফেসর ওয়াহিদুল হক (দেখুন Huq 1978) এবং 'ঘ' সাব-গ্রুপে ড. আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরীর নামোল্লেখ করা হয়নি। সঙ্গত কারণেই দ্বিতীয় গ্রুপের সূত্রের প্রবক্তাদের ক্ষেত্রে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছে। (২) তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম কলামে উল্লেখিত (Chowdhury 1982, পৃ. ২২-২৫) বিশ্লেষণ ও নির্দেশকসমূহ দ্বিতীয় কলামে উল্লেখিত সব গবেষকের জন্য সমমাত্রায় প্রযোজ্য নয় (দু-একটি ক্ষেত্রে আদৌ প্রযোজ্য নয়; যেমন অজয় রায় আনুষ্ঠানিকভাবে মাও-এর অনুসারী নন)। (৩) "প্রকৃতপক্ষে কে কাকে অনুসরণ করছেন" প্রশ্নটি অত্যন্ত জটিল এবং তা এ প্রবন্ধের আওতাবহির্ভূত রাখা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ভিন্ন একটি গুরত্বপূর্ণ গবেষণা প্রয়োজন। তবে মতভেদ স্বল্প, যখন কেউ কাউকে হুবহু অথবা গুণগত দিক থেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুসরণ করছেন। কিন্তু যখন একে অন্যের "ফ্রেমওয়ার্ককে" আংশিকভাবে গ্রহণ করছেন অথবা বিপরীতধর্মী দুটি ফ্রেমকে আংশিকভাবে গ্রহণ করছেন, সেক্ষেত্রে সুস্পষ্ট বিবেচনা দুরূহ ব্যাপার। উদাহরণস্বরূপ "আধা-পুঁজিবাদ" প্রমাণের জন্য সামির আমিনকে উদ্ধৃত করা, যখন সামির আমিন প্রান্তিক পুঁজিবাদের প্রবক্তা অথবা আধাসামন্তবাদ প্রমাণের জন্য সানিন্‌কে উদ্ধৃত করা, যখন সানিন্ খুদে কৃষক বা কৃষক উৎপাদন পদ্ধতির প্রবক্তা ইত্যাদি।

গ. খুদে কৃষক উৎপাদন পদ্ধতি অথবা খুদে পণ্য উৎপাদন ভিত্তিক উৎপাদন পদ্ধতি	আবু আবদুল্লাহ, কামাল মাহমুদ (রা), মাহফুজ ভূঁইয়া (রা)	মার্কস, লেনিন, মাও সেতুং	আংশিকভাবে চিরায়ত মার্কসবাদ, 'নয়া-মার্কসবাদ, ছায়ানভ, সানিন্	ভূমি-মালিকানা ও ব্যবহারের বিকাশ ধারা, পেশার বিকাশ, উদ্বৃত্ত মূল্য ও তার ব্যবহার	প্রাক-পুঁজিবাদ তবে সামন্তবাদ নয়
গ্রুপ ২: অপেক্ষাকৃত অল্প বিশ্লেষিত, স্বল্প সমর্থিত এবং এখনো গঠন পর্বে অবস্থানরত					
ঘ. আধা-সামন্তবাদ আধা-ঔপনিবেশবাদ (অথবা আধা-এশিয়াটিক আধা সামন্ত–আধা-উপনিবেশিক -আধা পুঁজিবাদী)	অনুপম সেন	মার্কস, এঙ্গেলস, মাও সেতুং, সামির আমিন, হামজা আলাভি	মার্কস, (ইন্ডিয়া প্রসঙ্গে), এঙ্গেলস (১৮৫৭ পর্যন্ত), বানাজি, করডোসো, (ক্ষেত্র বিশেষে এ. কে. সেন)।	উপনিবেশ, জমিদারী প্রথা, আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী শ্রম বিভাগের বিকাশ ধারা ও সমাজ বিজ্ঞানীয় প্রত্যয়সমূহ	মূলসূত্র এখনো অস্পষ্ট

চ. সবচেয়ে গৃহীত প্রত্যয়সমূহ হচ্ছে ভাগচাষ, মহাজনী ও ইজারাদারি ব্যবস্থা, বন্ধক, মূল্য, পণ্যোৎপাদন, মজুরি, শ্রম, উৎপাদনের উপায়সমূহের ওপর মালিকানার ধরন ইত্যাদি; এবং

ছ. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের প্রাধান্য যথাক্রমে কৃষি ও বাণিজ্য।

বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে গবেষকেরা বিষয় উপস্থাপনার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত তিনটি পদ্ধতির এক বা একাধিককে অবলম্বন করছেন। সেগুলো হলো:

১. সামাজিক অর্থনৈতিক প্রত্যয়সমূহকে সংজ্ঞায়িত করার প্রচেষ্টা (তবে সে প্রচেষ্টা অতীব আনুষ্ঠানিক),

২. অন্যের সূত্র বা মতামতকে পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ না করেই নিজের লক্ষ্যে আগানো,

৩. অন্যের সূত্রকে ভুল প্রমাণ করেই আপন সূত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। এ প্রবন্ধে বিরাজমান বিভিন্ন সূত্রের (ছক ১০-এ দেখুন) চুলচেরা বিশ্লেষণ না করে সূত্রসমূহের সারচিত্রের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণই সমীচীন হবে। সেটাও প্রয়োজন অনুসারে করা হবে পদ্ধতিতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই। আলোচিত বিতর্কে উৎপাদন পদ্ধতি সূত্রবদ্ধকরণের যুক্তিগুলো নিম্নরূপ:

ক. আধাসামন্তবাদ আধা-পুঁজিবাদ

বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতি 'আধাসামন্তবাদী আধা-পুঁজিবাদী' এই সূত্রের অন্যতম প্রবক্তা মহিউদ্দিন আলমগীরের যুক্তি হলো "যদি কেউ সামন্ত ও পুঁজিবাদী উভয় ধরনের উৎপাদন পদ্ধতিকে বাংলাদেশের কৃষিতে নির্ধারক উৎপাদন পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা না করেন, তাহলে তার কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি হবে আধাসামন্তবাদ। তার কারণ, প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতের আদিম কৃষি উৎপাদন পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটেছে এবং বিরাজমান খুদে কৃষকভিত্তিক উৎপাদন পদ্ধতি নির্ধারক হতে পারে না। বস্তুত ঐতিহাসিকভাবেই সে (খুদে কৃষকভিত্তিক উৎপাদন পদ্ধতি– আ. বারকাত) কোনো সমাজব্যবস্থাতেই নির্ধারক উৎপাদন পদ্ধতি হিসেবে বিরাজ করেনি" (দেখুন Alamgir Mohiuddin 1978, পৃ. ৭৪)। অতএব ওই গবেষকের চিন্তাপদ্ধতি অনুসারে বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতি হয় সামন্তবাদী অথবা পুঁজিবাদী। এবং তার মতে, খুদে কৃষক উৎপাদন পদ্ধতি নির্ধারক বা নিয়ামক হতে পারে না। আর তাই যদি হয়, তাহলে আধাসামন্তবাদই বাংলাদেশের কৃষিতে মূল/নির্ধারক উৎপাদন পদ্ধতি। অন্যত্র আধাসামন্তবাদের সূচক হিসেবে মহিউদ্দিন আলমগীর মাও-এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, "কৃষিতে আধা-সামন্তবাদের প্রতিফলন হিসেবে নিম্নলিখিত উপাদানসমূহের উল্লেখ করা যেতে পারে: (১) ভাগচাষ, (২) প্রাধান্য বজায়কারী গ্রুপের বহুমুখী সামাজিক ভূমিকা, (৩) খুদে ভাগচাষিদের বংশপরম্পরায় ঋণগ্রস্ততা, ও (৪) দায়গ্রস্ততার কারণে খুদে ভাগচাষিদের সম্পদ ও উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয়" (দেখুন Alamgir Mohiuddin 1978, পৃ. ৫৩)।

"আধাসামন্তবাদ, আধা-পুঁজিবাদের" অন্যতম প্রবক্তা অজয় রায়ের মতে, "ভাগচাষ ছাড়াও আরও নানাভাবে এখনো সামন্তবাদী শোষণ আমাদের দেশে টিকে আছে। নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জমি চাষ (বন্ধক, খাই-খালাসি ইত্যাদি) করতে দেওয়ার প্রথা অনুরূপ একটি ব্যবস্থা। তা ছাড়া সামন্তবাদী প্রথার অনুষঙ্গ রূপে মহাজনী প্রথা এখন পর্যন্ত পুরোপুরিই আমাদের দেশে বিরাজ করছে। যদিও সমগ্র কৃষিব্যবস্থায় সামন্তবাদী শোষণের অংশ যে বর্তমানে মূল বা প্রধান তা

নয়, তবু সামন্তবাদী শোষণের এই অবশেষগুলো কৃষির অগ্রগতির ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে আজও বিরাজ করছে" (দেখুন, রায় অজয় ১৯৭৯, পৃ. ৮১)। এই পুস্তকের অন্যত্র মহাজনী প্রথাকে "সামন্ত প্রথার জের" এবং "সামন্ত প্রথার অঙ্গ" হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে (যথাক্রমে পৃ. ৯৩, ১৮০)। অজয় রায় আরও লিখেছেন যে, "সারা দেশে ধনবাদী বিকাশ (আমলা মুৎসুদ্দী পুঁজির শ্রীবৃদ্ধির অর্থ পুঁজিবাদী বিকাশ নয়) যখন অপরিণত, তখন কৃষিতে ধনবাদী বিকাশের সম্ভাবনা কতটুকু তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন তোলা যেতে পারে।... বস্তুত বর্ধিত পুনরুৎপাদনের প্রশ্ন বাদ দিয়ে কৃষিতে ধনবাদী বিকাশের কথা ভাবা চলে না" (দেখুন, রায় অজয় ১৯৭৯, পৃ. ২২৭-২২৮)। পরবর্তী সময়ে (বছর দুয়েক-পরে) অজয় রায় "দুই দশকের পুঁজিবাদী বিকাশ" প্রবন্ধে এবং "বাংলাদেশের ভূমিব্যবস্থা" গ্রন্থে সব ধরনের জোতদারী, ভাগচাষ ও মহাজনী শোষণকে সামন্ত শোষণের রূপ হিসেবেই দেখেছেন (কারণ উল্লিখিত বিভিন্ন প্রত্যয়ের অভ্যন্তরে অন্য কোনো উৎপাদনসম্পর্কের অস্তিত্ব স্বীকৃতি পায়নি) এবং পুঁজিবাদী প্রাথমিক স্তরে এবং বর্ধিত পুনরুৎপাদন বা কারিগরি উন্নতির দৃষ্টিতে নয়, মজুরিশ্রম ব্যবহারের দৃষ্টিতে বিকাশমান (দেখুন রায় অজয় ১৯৮০, পৃ. ৪; রায় অজয় ১৯৮৩, পৃ. ১৩; Marx K 1965; Schagolov 1965; Nikiforev and Katchanovsky 1971)।

সুতরাং "আধাসামন্তবাদ আধা-পুঁজিবাদের" প্রবক্তা মহিউদ্দিন আলমগীর ও অজয় রায় উভয়ের ক্ষেত্রেই সাধারণ চিন্তাপদ্ধতি হলো:

১. হয় সামন্তবাদ অথবা পুঁজিবাদ, এবং বাস্তবত বিরাজমান বিভিন্ন অন্তবর্তীকলীন উৎপাদনসম্পর্ককে হয় সামন্তবাদ অথবা পুঁজিবাদে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে;

২. সব ধরনের ভাগচাষ, মহাজনী প্রথা, বন্ধক, ইজারাদারি– সামন্তবাদের প্রত্যয়, আর পণ্যোৎপাদন ও মজুরিশ্রম– পুঁজিবাদের প্রত্যয়;

৩. "আধা-আধা" করণের মানদণ্ড অপরিষ্কার। কেউই উল্লেখ করছেন না মার্কসবাদে গুণগত প্রত্যয় হিসেবে উৎপাদন পদ্ধতির "আধাকরণ" অর্থাৎ আধা-সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি আদৌ সম্ভব কি না। উল্লেখ্য, 'আধাকরণ' পদ্ধতি মারাত্মক বিচ্যুতি হতে পারে। কারণ সেক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক পোল্যান্ডের কৃষিকে (যেখানে ৬০ শতাংশ আবাদি জমি ব্যক্তিমালিকানাধীন এবং অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিমালিকানার উৎপাদনশীলতা রাষ্ট্রীয় মালিকানার চেয়ে বেশি) "আধাসামন্তবাদী,

আধা-সমাজতান্ত্রিক", "আধা-পুঁজিবাদী ও আধা-সমাজতান্ত্রিক" হিসেবে সূত্রায়িত করা যেতে পারে।

৪. 'সামন্তবাদ' বলতে ইংরেজিতে যাকে ফিউডালইজম বলা হয় তাকে বোঝানো হয়ে থাকে। 'আধা' শব্দটি যুক্ত করে ইউরোপীয় ফিউডালইজমের কোন অংশ বিযুক্ত করা হচ্ছে, তা নিয়ে কেউই আলোচনা করেননি। আধাসামন্তবাদী উৎপাদন পদ্ধতির মূল লক্ষ্য কী কী, ইতিহাসের কোন সময়, কোন অবস্থায়, কীভাবে এই পদ্ধতির আবির্ভাব, তার বিকাশই বা কতদিন ঘটেছিল, কবে থেকেই বা সেই পদ্ধতির বিকাশ বন্ধ হয়ে ক্ষয়প্রাপ্তি শুরু হয়– এসব কোনো প্রশ্নেরই উত্তর "আধাবাদীরা" দিচ্ছেন না।

উৎপাদন পদ্ধতি আধাকরণের ক্ষেত্রে প্রায়শ লেনিন ও মাও সে তুং-এর বিভিন্ন লেখার আশ্রয় নেওয়া হয়। এ কথা সত্য যে লেনিন ও মাও একাধিকবার "আধাসামন্তবাদ আধা-পুঁজিবাদের" কথা বলেছেন। কোন উদ্দেশ্যে? উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করলেই অনুমিত হবে যে, আজকে যারা বিভিন্ন উৎপাদন পদ্ধতি আধাকৃত করছেন, তারা "উদ্ধৃতি গোঁড়ামীর" (quotation dogmatism) ঊর্ধ্বে উঠতে পারছেন না। লেনিন বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে, বিভিন্নভাবে "আধাকরণ" প্রত্যয়টি প্রয়োগ করেছেন। "আধাকরণ" বিস্তৃতির কারণেই ঐতিহাসিক ক্রমধারায় লেনিনের "আধাকরণ" ছক আকারে (ছক ১১) দেখানো প্রয়োজন। যদিও কমপক্ষে ১০টি গুরত্বপূর্ণ লেখায় লেনিন "আধাসামন্তবাদ" প্রত্যয়টি ব্যবহার করেছেন তথাপি কোনো ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রত্যয় হিসেবে সেটা ব্যবহৃত হয়নি। সেটা ব্যবহৃত হয়েছে মূলত রাজনৈতিক প্রত্যয় হিসেবে বাস্তব অবস্থার বিস্তর বিশ্লেষণ ও তা ব্যাপক জনগোষ্ঠীর কাছে সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্যে। যে সময় লেনিন "আধাসামন্ত আধা-পুঁজির" কথা বলেছেন তখন শিল্পোৎপাদনের মাপকাঠিতে রাশিয়া বিশ্বে ষষ্ঠ স্থানের অধিকারী এবং নিঃসন্দেহে পুঁজিবাদী দেশ। এমতাবস্থায় সামন্তবাদ বলতে সামন্তবাদের অবশেষকেই বোঝায়, ঠিক সামন্তবাদী উৎপাদন পদ্ধতিকে নয়। সেইসব অবশিষ্টাংশের বিকাশসূত্র পুঁজিবাদের বিকাশসূত্রেরই অধীন। বিপ্লবপূর্ব চীনেও মাও সেতুং ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টি "আধাসামন্তবাদ আধা-পুঁজিবাদ" উৎপাদন পদ্ধতির উপস্থিতি উল্লেখ করেছেন। উপরোক্ত আলোচনা চীনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য (যদিও চৈনিক সামন্ত শোষণ রুশ সামন্ত শোষণের চেয়ে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ও শক্তিশালী ছিল)। উপরন্তু ব্যাপক তথ্যের ওপর ভিত্তি করে সোভিয়েত চীন বিশারদরা প্রমাণ

করেছেন যে বিপ্লবপূর্ব চীন ছিল "প্রাক্-পুঁজিবাদী ও উত্তরণপর্যায়ের সমাজ–বহুগাঠনিক সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা" (দেখুন, Glunin and Marguzin 1982, পৃ. ১১২)।

ছক ১১: ঐতিহাসিক ক্রমধারায় লেনিনের বিভিন্ন লেখায় আর্থসামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে আধাকৃত প্রত্যয়সমূহ

আধাকৃত প্রত্যয়	লেখার সাল	প্রবন্ধ/পুস্তক (পঞ্চম রুশ সংস্করণ অনুযায়ী খণ্ড ও পৃষ্ঠা)
ক. "আধা-মধ্যযুগীয়" কৃষক	১৮৯৪ ১৮৯৭	"জনগণের বন্ধু" কারা ও কীভাবে তারা সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের বিরুদ্ধে লড়াই করে" (১, পৃ. ২৫১) অর্থনৈতিক রোমাঞ্চবাদের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে (২, পৃ.-২৪০)
খ. "আধা-কৃষি দাস: তথা মধ্যযুগীয়" কৃষক	১৮৯৪	"জনগণের বন্ধু কারা ও কীভাবে তারা সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের বিরুদ্ধে লড়াই করে" (১, পৃ. ২৫১-২৫৬)
গ. কৃষকের "আধাসামন্তবাদী শ্রম"	১৮৯৫	"নারদনিকতার অর্থনৈতিক সারচিত্র ও স্ত্রুভে মহাশয়ের গ্রন্থে তার সমালোচনা" (১, পৃ. ৪৫২)
ঘ. কৃষকের "আধা-মুক্ত বা আধা-স্বাধীন" শ্রম	১৮৯৯	"রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ" (৩, পৃ. ২১৪)
ঙ. খামার পরিকল্পনার/পরিচালনার "আধাসামন্তবাদী" পদ্ধতি	১৯০৭	"দুমে উত্থাপিত প্রশ্নাবলী ও রুশ সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের বৈশিষ্ট্য" (১৫, পৃ. ৪৭)
চ. "আধাসামন্তবাদী" পুঁজিবাদ	১৯১৩	"ভূমিব্যবস্থা ও গ্রামীণ জীবনের দারিদ্র্য" (২৪, পৃ. ৬)
ছ. "আধাসামন্তবাদী" শোষণ	১৯১৫	"সমাজতন্ত্র ও যুদ্ধ" (২৬, পৃ. ৩১৮)
জ. "আধাসামন্তবাদী" ইউরোপ	১৯১৭	"যুদ্ধ ও বিপ্লব" (৩২, পৃ. ৭৮)
ঝ. কৃষকদের "আধাসামন্ততান্ত্রিক" অবস্থা	১৯২০	জাতিগত ও ঔপনিবেশিক প্রশ্নাবলীবিষয়ক কমিশনের রিপোর্ট (কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেস) (৪১, পৃ. ২৪৪)
ঞ. শুধু রাশিয়াতেই নয় উন্নত জার্মান ও হাঙ্গেরিতে ল্যাটি ফুন্ডিয়ার "আধাসামন্তবাদী" কর্ষণ পদ্ধতি	১৯২০	"কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে সদস্যপদ প্রাপ্তির শর্ত সম্পর্কে বক্তৃতা" (৪১, পৃ. ২৫১-২৫২)

কেউ কেউ প্রাচ্যের স্বৈরতন্ত্রে ভূমির ওপর ব্যক্তিমালিকানার অনুপস্থিতি, হস্তশিল্প ও কৃষির ঐক্য (যখন উদ্বৃত্ত মূল্য স্থানান্তরিত না হয়ে গ্রামেই থাকছে) এবং ভূমির সাথে শ্রমশক্তি সংযোজনের বৈশিষ্ট্যাবলী থেকে উদ্ভূত আজকের উৎপাদন পদ্ধতিকেও "এশিয়াটিক উৎপাদন" পদ্ধতি আখ্যায়িত করছেন (দেখুন, Islam 1982)। এ মতের সমালোচনার জন্য অধ্যাপক আবু মাহমুদের অপ্রকাশিত রচনাবলী "উৎপাদন পদ্ধতির বিকাশ ও বিবর্তনের মার্কসীয় মূল্যায়ন, ১৯৮৬", "সমাজ সমীক্ষায় মার্কসীয় প্রভাবের মূল্যায়ন, ১৯৮২" দেখা যেতে পারে। আর এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতির সপক্ষে যুক্তি হিসেবে মার্কসীয় উদ্ধৃতি দেওয়া হচ্ছে। তবে উদ্ধৃতিসমূহ ১৮৫৭ সালের আগের অর্থাৎ "পুঁজি" গ্রন্থ রচনার পূর্বে (সম্ভবত বলা উচিত "পুঁজি' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটির মূল পাণ্ডুলিপি শেষ করার আগে)। এ মর্মে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, লেনিন তাঁর কোনো রচনায় "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি" প্রত্যয়টি শুধু ব্যবহারই করেননি, বিপরীতে কড়া সমালোচনা করেছেন (যেমন রুশ সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির চতুর্থ কংগ্রেসে, সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের কৃষি প্রোগামের ওপর প্লেখানভ ও একসেলরডের মতামত আলোচনায়)। শুধু তা-ই নয়, বিংশ শতকের ৪০ থেকে ৭০ দশক পর্যন্ত এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতির বিতর্ক বিশ্লেষণ করে সোভিয়েত প্রাচ্যবিশারদরা ইতিমধ্যেই সুপ্রমাণিত করেছেন যে, উল্লিখিত উৎপাদন পদ্ধতিটি সামন্তবাদেরই একটি বিশেষ ধরনমাত্র। আমি মনে করি, শুধু সামন্তবাদের লক্ষণসমূহই নয়, অন্তর্বর্তীকালীন উৎপাদনসম্পর্কসমূহও 'এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতিতে' বিদ্যমান থাকা সম্ভব (যদি "এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য নিয়ে যা বলা হয়ে থাকে তা বহাল থাকে)।

খ. পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি

এ মতের প্রবক্তা অধ্যাপক আখলাকুর রহমান তাঁর বহুল আলোচিত পুস্তিকা "বাংলাদেশের কৃষিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ"-এ লিখেছেন "তার বিশ্লেষণ পদ্ধতি মার্কসীয়। এরূপ বিশ্লেষণে বাংলাদেশের কৃষি বিকাশের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ধনতান্ত্রিক[৫৭], যদিও বিকাশের বর্তমান স্তর অনুন্নত এবং পশ্চাৎপদ" (দেখুন, রহমান

[৫৭] প্রফেসর আখলাকুর রহমান ১৯৭৪ সালের প্রবন্ধে সমসাময়িক বিকাশকালে ধনতন্ত্রকে নির্ধারক উৎপাদন পদ্ধতি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। অথচ ১৯৮৪ সালের প্রবন্ধে উল্লিখিত বিকাশকালে অধনতান্ত্রিক বিকাশের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লক্ষ করে লিখেছেন, "১৯৭৪ সনে খাদ্য সাহায্য বিলম্বিত করা হয়েছিল আওয়ামী লীগ সরকারের জনপ্রিয়তা এবং রাজনৈতিক কর্ম-ক্ষমতাকে বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে, কেননা সে সরকার গ্রহণ করেছিল অধনতান্ত্রিক বিকাশের পথে কয়েকটা বলিষ্ঠ

১৯৭৪, আহমদ ১৯৭৭)। নির্ধারক উৎপাদন পদ্ধতি উদ্‌ঘাটনের ক্ষেত্রে প্রফেসর রহমানের যুক্তিটি নিম্নরূপ: "জাতীয় ইকনোমির সামগ্রিক উৎপাদনসম্পর্ক যখন সামন্ততান্ত্রিক থাকে, তখন কৃষিতে খোদ মালিকানার পত্তনকে বলা যায় আধাসামন্ততান্ত্রিক, যখন শিল্প-বাণিজ্যে উৎপাদনসম্পর্ক হয়ে ওঠে ধনতান্ত্রিক এবং কৃষিতে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদনসম্পর্কের পাশাপাশি জন্ম নেয় খোদ মালিকানা, তখন তাকে আমরা বলব প্রাক্-ধনবাদী। আবার যখন কৃষিতে সামন্তবাদের পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটিয়ে পত্তন হয় কৃষক মালিকানা, যখন শিল্প-বাণিজ্যে প্রচলিত হয় ধনতান্ত্রিক উৎপাদনসম্পর্ক, তখন খোদ মালিকানাকে আমরা কোনো অর্থেই আধাসামন্ততান্ত্রিক বলতে পারি না। কৃষিতে ধনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহের বিকাশের পরিধির বিচারে আমরা তাকে পূর্ণ ধনতান্ত্রিক অথবা আধা-ধনতান্ত্রিক বলব" (দেখুন, রহমান ১৯৭৪, Bhaduri Amit 1973)। স্বাভাবিকভাবেই প্রফেসর রহমান নিজের দেওয়া শেষ সূত্রটি গ্রহণ করেছেন। প্রথম ধারার প্রবক্তাদের বিপরীতে প্রফেসর রহমানের মতে, "চিরায়ত সামন্তবাদের প্রত্যয়সমূহের (ভাগচাষ, মহাজনী লগ্নি, ইজারা, পত্তন ইত্যাদি) বৈশিষ্ট্যও ধনতান্ত্রিক" (দেখুন, রহমান ১৯৭৪; Byres T. J 1983; Chowdhury 1982, পৃ. ৩৯-৪১; Marx 1965)। পুঁজিবাদের বিস্তারমাত্রা বিশ্লেষণে ধরেই নেওয়া হচ্ছে যে, রাজনৈতিক-অর্থনীতির প্রত্যয় হিসেবে বাজারে যা আসে তা-ই পুঁজিবাদের পণ্য (দেখুন, রহমান, পৃ. ২৭-২৯) অথবা মজুরির বিনিময়ে যে শ্রম সেটাই পুঁজিবাদী মজুরশ্রম (দেখুন, রহমান ১৯৭৪, পৃ. ৩৫-৩৯)। এরূপ বিশ্লেষণপদ্ধতি স্বভাবত পুঁজিবাদের ব্যাপকতা, বিকাশমাত্রা অথবা পরিধিকে বড় করে দেখায়। বিপরীতে সামন্তবাদসহ অন্যান্য প্রাক্-পুঁজিবাদী উৎপাদনসম্পর্কের বিকাশমাত্রা ছোট করে দেখায় (এ প্রসঙ্গে পরে "বিকল্প চিন্তার ভিত্তি ও উপাদান"-এ বিস্তারিত আলোচনা হবে)।

'পশ্চাৎপদ' অথবা 'অনুন্নত' বিশেষণসমূহ তত গুরুত্বপূর্ণ নয়, যত গুরুত্বপূর্ণ পুঁজিবাদকে নির্ধারক উৎপাদন পদ্ধতি হিসেবে ঘোষণা করা। কারণ সেক্ষেত্রে মার্কসবাদী গবেষক সারা দেশের বিপ্লবকে কোন স্তরে দেখবেন (?), কৃষিতে

পদক্ষেপ" (দেখুন রহমান ১৯৮৪, মাহমুদ ১৯৭৭)। আমাদের মতে বক্তব্য দু'টি স্ববিরোধী। কারণ একটি দেশে অ-ধনতান্ত্রিক বিকাশের অর্থ হলো সেখানে ধনতন্ত্র এখনো নির্ধারক উৎপাদন পদ্ধতি নয় (ধনতান্ত্রিক উৎপাদনসম্পর্ক বিভিন্ন মাত্রায় বিকশিত হতে পারে)। এমতাবস্থায় গণতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থার স্তরটিকে অতিক্রম না করেই (by passing capitalism) সমাজতন্ত্রের দিকে গমন অর্থাৎ প্রাক্-পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা থেকে বিভিন্ন নীতি কৌশলের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রে গমন-সম্ভাবনা বিদ্যমান।

শ্রেণিসংগ্রামের রণকৌশল সম্পর্কে কী বক্তব্য হাজির করবেন (?)– এসব যথেষ্ট ভাবনার বিষয়। কারণ উৎপাদন পদ্ধতির ক্ষেত্রে সামন্তবাদ অথবা আধাসামন্তবাদকে নির্ধারক আখ্যায়িত করে যেমন জোতদার নিধনের লাইন প্রতিষ্ঠা করে "বিপ্লবকে সরলরৈখিক করা" সম্ভব, ঠিক তেমনটি পুঁজিবাদকে নির্ধারক আখ্যায়িত করে কৃষিকে পুঁজিপতি ও শ্রমিকশ্রেণিতে বিভক্ত করে বিপ্লবী প্রক্রিয়াকে ভুল পথে পরিচালিত করাও সম্ভব (ইতিমধ্যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এটা ঘটেছে এবং অনেক ভুক্তভোগী এটা উপলব্ধি করে বিকল্প চিন্তার আশ্রয় নিয়েছেন)। বস্তুত বিরাজমান বিভিন্ন ধরনের অন্তর্বর্তীকালীন উৎপাদনসম্পর্কের (intermediary forms of production relations) গুরুত্ব না দেওয়া, প্রত্যয়কে 'নির্ভেজাল' অথবা 'বিশুদ্ধ' হিসেবে দেখা, একই প্রত্যয়ের বিভিন্ন রূপ উদ্‌ঘাটন না করা– সম্ভবত এগুলোই প্রফেসর রহমানের (দেখুন Jahangir 1977; Jahangir 1979; Roy 1972) গবেষণায় পদ্ধতিগত সাধারণ দুর্বলতা।

গ. খুদে-উৎপাদন পদ্ধতি

খুদে কৃষক উৎপাদন পদ্ধতি অথবা খুদে পণ্য উৎপাদকভিত্তিক উৎপাদন পদ্ধতির মূল প্রবক্তা আবু আবদুল্লাহর মতে, "খুদে কৃষকভিত্তিক উৎপাদন পদ্ধতি কেন্দ্রীয় উৎপাদনসম্পর্ক। এই পদ্ধতি একদিকে মহাজনী পুঁজি কর্তৃক ইতিমধ্যেই নিঃশেষিত। অন্যদিকে বাণিজ্যিক পুঁজির সহায়তায় জাতীয় ও বিদেশি পুঁজিবাদ দ্বারা শোষিত হচ্ছে– এ অবস্থায় 'আধাসামন্তবাদ' লেবেলটা তখনই প্রযোজ্য, যখন ফলশ্রুতিতে সামন্তবাদের সাথে যৌক্তিক ও ঐতিহাসিক সংযোগটা লঙ্ঘিত না হচ্ছে" (দেখুন, Abdullah, Hussain and Nation 1976, পৃ. ২১৭, আবদুল্লাহ ১৯৮০, Jahangir 1979; Chowdhury 1982; Clifton 1969)। আলোচিত সূত্রের সমর্থক কামাল মাহমুদ ও মাহফুজ ভূঁইয়া (যারা ইদানীং নয়া-উপনিবেশিক উৎপাদন পদ্ধতির কথাও বলছেন) সিদ্ধান্তে এসেছেন যে 'আমাদের কৃষি অর্থনীতির চরিত্র হলো প্রধানত খণ্ডজমির কৃষক মালিকানা। মূলত সামন্ত যুগের উৎপাদনসম্পর্কের অবসান ঘটেছে। তাকে স্থলাভিষিক্ত করেছে খণ্ড জমির স্বাধীন মালিক কৃষক" (দেখুন, মাহমুদ ১৯৭৭, পৃ. ২৮; ভূঁইয়া ১৯৮১; পৃ. ৪১, ৪৪, ৪৭; Levkovsky 1978)। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সোভিয়েত ভারত বিশারদদের কেউ কেউ ১৯৫০-১৯৬০ দশকে ভারতের কৃষির উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে অনুরূপ মত পোষণ করতেন এবং পরবর্তী সময়ে তারা তাদের তত্ত্বগত ভ্রান্তি

স্বীকার করেছেন (দেখুন, Alexandrov, Gurwitcz, Kotovski and Moisiev 1968, পৃ. ৩৪৪)।

আবু আবদুল্লাহ মার্কসের উদ্ধৃতি ব্যবহার করে বলছেন যে, খুদে কৃষক উৎপাদন পদ্ধতি হলো সামন্তবাদ থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণের অন্তর্বর্তীকালীন স্তর (দেখুন, Abdullah, 1976, পৃ. ২১৭)। মার্কিন অর্থনীতিবিদ ক্লিফটন-এর মতোই বলছেন যে, গ্রামশ্রেণিহীন (বিপরীতধর্মী শ্রেণির অবস্থানের দৃষ্টিতে); আর তাই তা শ্রেণিসংগ্রামহীন (দেখুন, Abdullah 1976, পৃ. ২১৭; Clifton 1969, পৃ. ৯৭)। খুদে কৃষক উৎপাদন পদ্ধতির দুই প্রবক্তা (কামাল মাহমুদ ও মাহফুজ ভূঁইয়া) অবশ্য গ্রামের শ্রেণিহীনতা ও শ্রেণিসংগ্রামহীনতার কথা বলেননি। তাদের পক্ষে সেটা ব্যক্ত করাও সম্ভব নয়, কারণ তারা বাম রাজনীতির সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত।

"খুদে কৃষক উৎপাদন পদ্ধতি" কখনো নির্ধারক উৎপাদন পদ্ধতি হতে পারে না। স্বাধীন উৎপাদন পদ্ধতি (তাও আবার নির্ধারক) হতে গেলে যেসব উপাদান অবশ্যই প্রয়োজন (দেখুন, ছক ৯) সেগুলোর সবটা খুদে পণ্য উৎপাদকের থাকে না। অবশ্য আবু আবদুল্লাহ তার "ভূমি সংস্কার" প্রবন্ধে কৃষিকাঠামোর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে লিখেছেন, "খুদে পারিবারিক খামারের পরিমাণগত আধিক্য" (preponderance of minifundist family farms) (দেখুন, আবদুল্লাহ ১৯৮০, পৃ. ৬৭)। পরিমাণগত ও গুণগত আধিক্য সমার্থক নয় (তবে পরিমাণ গুণে রূপান্তরিত হতে পারে)। পরিমাণ যদি খামারের সংখ্যার দিক থেকে হয়ে থাকে সেটা এক ব্যাপার, আবার পরিমাণ যদি উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি, সঞ্চিত উদ্বৃত্ত মূল্যের উৎপাদনশীল ব্যবহারের দৃষ্টিতে হয়ে থাকে সেটা মৌলিকভাবে ভিন্ন ব্যাপার। কোনো নির্দিষ্ট উৎপাদকসম্পর্কের বাহকের সংখ্যাধিক্য, বিকাশের প্রধান প্রবণতা ও নির্ধারক উৎপাদন পদ্ধতি সমার্থক নয়।

উল্লেখ্য, আবু আবদুল্লাহ ও অন্যান্যের তুলনায় প্রত্যয়সমূহের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে ভিন্নধর্মী পদক্ষেপ নিয়েছেন কামাল মাহমুদ ও মাহফুজ ভূঁইয়া। যেমন মুদ্রাখাজনার পুঁজিবাদী খাজনায় রূপান্তর, অন্তবর্তী স্তর হিসেবে খুদে কৃষক বর্গাদারের আবির্ভাব, বিভিন্ন চরিত্রের ভাগচাষ ব্যবস্থা, ধনতান্ত্রিক কৃষি আবির্ভাবের শর্তাবলী, ব্যবসায়ী পুঁজি ও শিল্পপুঁজির পারস্পরিক সম্পর্ক, বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মজুরিশ্রম ইত্যাদি (দেখুন, মাহমুদ ১৯৭৭, পৃ. ১২-২৮,৩৪-৩৫,৪১-৪৭; ভূঁইয়া ১৯৮১, পৃ. ২৬-৪৪)। তবে উল্লিখিত বিশ্লেষণসমূহ অসম্পূর্ণ ও সীমিত। কারণ, মার্কসের "পুঁজি" অথবা লেনিনের "রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ" অবলম্বনে চিরায়ত প্রথায় বিকাশমান

সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার (মূলত সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদ) বিশ্লেষণ সম্ভব। চিরায়ত পথে বিকশিত নয় এমন সামাজিক-অর্থনৈতিক সংগঠন বিশ্লেষণের ভিত্তি হিসেবে উল্লিখিত গ্রন্থসমূহে বর্ণিত পদ্ধতিসমূহের সাথে দ্বান্দ্বিক সমন্বয় ঘটাতে হবে মার্কসের "অর্থনৈতিক পাণ্ডুলিপি ১৮৫৭-১৮৫৯" (যেখানে পাওয়া যাবে বিভিন্ন অন্তর্বর্তীকালীন উৎপাদনসম্পর্ক বিশ্লেষণের পদ্ধতিতত্ত্ব)। শুধু সেক্ষেত্রেই আমরা ভাবতে পারি অচিরায়ত পথে বিকাশমান সামাজিক-অর্থনৈতিক সংগঠনে ক্রিয়াশীল জটিল উৎপাদনসম্পর্কসমূহের সারচিত্র উদ্‌ঘাটনের চিরায়ত পদ্ধতি।

ঘ. *আধাসামন্তবাদ আধা-ঔপনিবেশিক উৎপাদন পদ্ধতি*

"আধাসামন্তবাদ আধা-ঔপনিবেশিক" উৎপাদন পদ্ধতির তত্ত্বটি এখনো অপেক্ষাকৃত স্বল্প বিশ্লেষিত, স্বল্প সমর্থিত এবং অপেক্ষাকৃত অল্প প্রতিষ্ঠিত। এই সূত্রের প্রবক্তাদের মূল যুক্তি আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের আওতাধীনে "কেন্দ্র-প্রান্ত" (centre periphery) সম্পর্ক। এ তত্ত্বে বিকাশের মূল ও একমাত্র উৎস বহিঃশক্তি (external forces); বিকাশের বাহ্যিক শর্তসমূহের ভারসাম্য নীতি এখানে স্বীকার করা হচ্ছে না। এ সূত্রের প্রবক্তারা পুনরুত্থাপন করেছেন ইতিমধ্যে মীমাংসিত ১৯৫০-এর দশকের বিখ্যাত ডব-সুইজি বিতর্ক "বাগানের আগাছাগুলো বেড়ার ফাঁক দিয়ে ঢুকেছে নাকি ওগুলো বাগানেই জন্মেছে"। অর্থাৎ আমাদের অর্থনীতিতে বিদ্যমান পুঁজিবাদী উৎপাদনসম্পর্ক বহিরাগত, নাকি সেটা এ মাটির স্বাভাবিক সন্তান?

"আধাসামন্তবাদ আধা-ঔপনিবেশিক" সূত্রের প্রবক্তারা উৎপাদন পদ্ধতি বিশ্লেষণে "তত্ত্ব" বা বিমূর্ত চিন্তার পর্যায়ে অবস্থান করছেন। রাজনৈতিক-অর্থনীতির প্রত্যয়ের সাহায্যে বাস্তব তথ্যসমূহের বিশ্লেষণ এখনো হয়নি। যতটুকু হয়েছে তা হলো হামজা আলাভি, বানাজি, করডোসার বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসরণ করে আংশিক সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, যা রাজনৈতিক অর্থনীতির দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী অসম্পূর্ণ ও অসঙ্গতিপূর্ণ।

সুতরাং "আধাসামন্তবাদ আধা-ঔপনিবেশিক" সূত্র প্রসঙ্গে যেসব সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে সেগুলো হলো: (১) রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ ছাড়া উৎপাদনসম্পর্কের বিবর্তন জানা সম্ভব নয়। আর গতিশীল উৎপাদনসম্পর্ক নির্ধারণ না করা পর্যন্ত শ্রেণিকাঠামো, রাষ্ট্রচরিত্রসহ উপরিকাঠামোর কোনো উপাদান প্রসঙ্গে সম্যক জ্ঞানার্জন (প্রত্যয়ের উৎপত্তি, বিকাশ ও অবলুপ্তির উৎস ও ধারা) সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের আগে সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতিগতভাবেই ভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। যার নমুনা দেখিয়েছেন "আধাসামন্তবাদ আধা-ঔপনিবেশিক" সূত্রের প্রবক্তাদের সমালোচনায় নজরুল ইসলাম ও সরদার আমিনুল

ইসলাম (দেখুন, Islam 1982, পৃ. ১২২-১৪১; Islam 1982, পৃ. ১৫৪-১৬০)। (২) ঔপনিবেশিক ('আধা' অথবা 'নয়া' যেটাই হোক না কেন) উৎপাদন পদ্ধতি পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি বিকাশের ঐতিহাসিক স্তর নয় কি? পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি ও 'ঔপনিবেশিক' উৎপাদন পদ্ধতির অর্থনৈতিক ভিত্তি ভিন্ন কিনা?

বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতির বিতর্ক থেকে স্বাভাবিকভাবেই মনে হতে পারে 'নানা মুনির নানা মত'। আসলে প্রকৃত ঘটনা তা নয়। এটাকে এঙ্গেলসের "অপরিপক্ক পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি, অপরিপক্ক শ্রেণিসম্পর্কের সাথে অপরিপক্ক তত্ত্বের উপস্থিতি সামঞ্জস্যপূর্ণ" (দেখুন, Engels F, Collected Works of Marx-Engels, Vol-20, পৃ. ১৯৪)– এই উক্তির সাথে তুলনা করা যায়।

বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতি বিশ্লেষণে ও নির্ধারণে উপরে আলোচিত চারটি ধারার বিভিন্ন মতামতের পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতার কারণ সম্পর্কে যেসব উপাদান শনাক্ত করা যেতে পারে সেগুলো হলো:

> প্রথমত, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রথমে বিশ্ব পুঁজিবাদী এবং পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী শ্রমবিভাগের আওতাধীনে বিকাশমান "বিশেষ" কাঠামো হিসেবে দেখা হচ্ছে না। "বিশেষ" এ কারণে যে, এ দেশে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত মূল্যের অধিকাংশের উৎপাদনশীল ভোগ হয়েছে মেট্রোপলি ও আধা-মেট্রোপলির জাতীয় পুঁজির বিকাশের স্বার্থে (অর্থাৎ মার্কসের ভাষায় "ইউরোপের বাইরের সম্পদ ইউরোপে এসে পুঁজিতে রূপ নিল") এবং অবশিষ্ট উদ্বৃত্ত আমাদের দেশে মেট্রোপলির স্বার্থ বহনকারী উপরিকাঠামোর বিভিন্ন খাতে অনুৎপাদনশীল বিনিয়োগ হয়েছে[৫৮]। মেট্রোপলি আমাদের পুঁজিবাদী

[৫৮]কলোনি মেট্রোপলি শর্তাধীনে অভ্যুদয়প্রাপ্ত ও বিকাশমান 'বিশেষ' পুঁজিবাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে স্মরণ রাখতে হবে যে, ব্রিটেনের "শিল্প বিপ্লব ও বিখ্যাত 'বাংলার হরিলুট" সমসাময়িক ঘটনা। কলোনিতে পুঁজির স্বাভাবিক বিকাশ সংকোচন ও নিম্নমানের পুঁজির বিকাশের জন্যও ঐ হরিলুটের গুণগত ও পরিমাণগত দিকসমূহ অবজ্ঞা করা উচিত নয়। উল্লেখ্য যে, (১) ১৭৭০ থেকে ১৮১৫ সালের মধ্যে ব্রিটেন কর্তৃক ভারত হরিলুটের পরিমাণ ১০০০ মিলিয়ন পাউন্ড। ১৭৭০ সালে বৃটেনের জাতীয় আয় ছিল ১২৫ মিলিয়ন পাউন্ড (দেখুন হেয়টার ১৯৮৩, Roy 1972); (২) পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও ভারতে ১৭৬০ থেকে ১৭৮০ সাল পর্যন্ত পরিচালিত অভিযানসমূহ থেকে ব্রিটেনের প্রাপ্ত মুনাফার পরিমাণ ছিল শিল্প বিপ্লবের কালে স্থাপিত নতুন শিল্পকারখানাসমূহে বিনিয়োগের জন্য প্রাপ্ত অর্থের দ্বিগুণ অপেক্ষা বেশি (দেখুন Mandel, ১৯৬৮, পৃ. ৪৪৪-৪৪৫)। (৩) ব্রিটেনের সংরক্ষণবাদী জাহাজ চলাচল আইন প্রয়োগের ফলে উপনিবেশে এমন কোনো শিল্প

উৎপাদনসম্পর্ক উদ্ভবের শর্তাবলী ধ্বংস করেছে। পুঁজিবাদ যতটুকু এসেছে, ততটুকুও কেন্দ্রের স্বার্থে "ইনজেকটেড", এটি সংশ্লিষ্ট সমাজের স্বাভাবিক সন্তান নয়; অর্থাৎ উক্ত পুঁজিবাদ সামাজিক শ্রমবিভাগের স্বাভাবিক বিকাশ-উদ্ভূত নয়। "স্বাধীনতা"-উত্তরকালের সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশের ইতিহাস হলো মেহনতি মানুষের স্বার্থ রক্ষার বাহক নয় এমন ধরনের রাষ্ট্রযন্ত্রের উপস্থিতিতে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের আওতাধীনে তারই উৎপাদিত "ইনজেকটেড" "নিকৃষ্টতম ও নিম্নমানের পুঁজিবাদী উৎপাদনসম্পর্ক" ও সামন্তবাদের অবশেষসহ বিভিন্ন অন্তর্বর্তীকালীন উৎপাদনসম্পর্কসংবলিত আপেক্ষিক জনসংখ্যাধিক্য অর্থনীতির বিকাশ।

দ্বিতীয়ত, সামগ্রিক সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রত্যয়সমূহকেও নিরন্তর বিকাশমান, গতিশীল, পরস্পরসম্পর্কযুক্ত ও নির্ভরশীল হিসেবে নয়, গতিহীন, অনড়, পারস্পরিক সম্পর্কহীন বস্তু হিসেবে দেখা হচ্ছে। সাথে সাথে পরিমাণগত মূল্যায়নকে গুণগত বিশ্লেষণ মাপকের সাহায্যে যাঁচাই করা হচ্ছে না, সমন্বিতও করা হচ্ছে না।

তৃতীয়ত, সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশের বর্তমান স্তরকে হয় সামন্তবাদ কিংবা পুঁজিবাদ অথবা তাদের মিশ্রণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। বিকাশের ভবিষ্যৎকে শুধু একটি উৎপাদন পদ্ধতির দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে, সেটি হলো পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি। সচেতনভাবেই হোক অথবা অসচেতনভাবেই হোক, এখানে একটি বাস্তব সত্যকে এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেটা হলো বিশ্ব পুজিবাদের সাধারণ সংকটের পূর্বের ও পরের পুঁজিবাদ একই মাত্রার জীবনীশক্তিসম্পন্ন নয়। আরও একটি সত্যকে ভালো করে তলিয়ে দেখা হচ্ছে না। সেটা হলো বিশ্ব পুঁজিবাদের সংকটের বিভিন্ন পর্যায়ে তৃতীয় বিশ্বে পুঁজিবাদী কায়দায় শিল্পায়নের সম্ভাবনার মাত্রা অভিন্ন নয়।

চতুর্থত, সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে উত্তরণমুহূর্তের ব্যবস্থা হিসেবে স্বীকার করা হচ্ছে না। সেক্ষেত্রে স্বীকার করতে হবে অন্তর্বর্তীকালীন

কারখানা চালু করা সম্ভব হয়নি, যা ব্রিটনের শিল্পকারখানার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। ব্রিটেনের শিল্পনীতি একদিকে যেমন তার বাজার সুবিস্তৃত করে অন্যদিকে তেমনি উপনিবেশের বিকাশমান শিল্প ধ্বংস করে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জনৈক গভর্নর জেনারেল ১৮৩৫ সালে লেখেন, "তন্তুবায়ীদের হাড়গোড় এখন ভারতের বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে" (দেখুন হেয়টার ১৯৮৩, Rodney 1978)।

উৎপাদনসম্পর্কের উপস্থিতি ও বহুগাঠনিক অর্থনীতি (multistructural economy)[৫৯]-র অস্তিত্ব। এটা মেনে নিতে হবে যে, একদিকে ভাগচাষ, মহাজনী, ইজারা, বন্ধক এবং অন্যদিকে পণ্যোৎপাদন, মজুরিশ্রম, ভূমিহীনতার প্রক্রিয়া এগুলোকে যথাক্রমে সামন্তবাদী ও পুঁজিবাদী উৎপাদনসম্পর্কের ধারক হতেই হবে– এমন কোনো বাঁধাধরা নিয়ম মার্কসীয় রাজনৈতিক-অর্থনীতিতে নেই। উল্লিখিত প্রত্যয়সমূহকে নির্দিষ্ট উৎপাদনসম্পর্কের ধারক বা বাহক হতে হলে নির্দিষ্ট শর্তাবলীর আওতাধীনে থাকতে হবে। স্বীকার করতে হবে যে, বহুগাঠনিক অর্থনীতিতে ব্যক্তিপুঁজিভিত্তিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বিকাশের সম্ভাবনা ঐতিহাসিকভাবেই অধিক।

পঞ্চমত, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্ধারক উৎপাদন পদ্ধতি পূর্বনির্ধারিত। কারণ গবেষণার ইচ্ছানির্ভর উপাদানসমূহ (যেমন গবেষকের নিজস্ব রাজনৈতিক মতবাদ; ইচ্ছা-অনিচ্ছা, ভালো লাগা না লাগা ইত্যাদি) বস্তুনিষ্ঠ উপাদানসমূহের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে।

ষষ্ঠত; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের গবেষকেরা মার্কসবাদকে সামগ্রিক, একীভূত বৈজ্ঞানিক মতবাদ হিসেবে গ্রহণ করতে চান না। আমাদের গবেষকেরা মার্কসবাদকে পদ্ধতিগতভাবে আংশিক গ্রহণ করছেন এবং বিচ্ছিন্নভাবে প্রয়োগ করছেন। পদ্ধতিবিজ্ঞান হিসেবে যে গবেষক মার্কসবাদকে যত বেশি বিচ্ছিন্নভাবে প্রয়োগ করেছেন তার ফলাফল তত বেশি সমন্বয়বাদী। পদ্ধতিতত্ত্ব হিসেবে যে গবেষক একই সাথে মার্কসবাদ ও অ-মার্কসবাদ প্রয়োগ করেছেন তিনি তত বেশি বিদ্যাভিমানতায় (scholasticism) আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন। উভয় ক্ষেত্রেই বস্তুনিষ্ঠ সত্য উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে না, হতে পারেও না। আমাদের সামাজিক বিজ্ঞানীরা মার্কসীয় রাজনৈতিক-অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান গ্রহণ করছেন (আংশিক),

---

[৫৯] মার্কস তাঁর "অর্থনৈতিক পাণ্ডুলিপি ১৮৫৭-১৮৫৯"তে বিভিন্ন ধরনের অন্তর্বর্তীকালীন উৎপাদন সম্পর্কের বিশ্লেষণ দিয়েছেন। বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতি নির্ধারণে বহুগাঠনিক অর্থনীতির আলোচনা অপেক্ষাকৃত নতুন প্রক্রিয়া (দেখুন বারকাত ১৯৮০; বারকাত ১৯৮১; মোকাদ্দেম ১৯৮১)। তৃতীয় বিশ্বের উৎপাদন পদ্ধতি সাহিত্যে এ প্রঙ্গে যারা লিখেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম লেভকভস্কি (১৯৭৮: সাধারণ তত্ত্ব); ম্যান্ডেল (১৯৬৮: সাধারণ তত্ত্ব); রাস্তিয়াননিকভ (১৯৭৩: কৃষি); উষা পট্টনায়েক (কৃষি); শিরোকভ (১৯৮২: শিল্প); অমিত ভাদুড়ী (১৯৭৩: বাণিজ্য ও কৃষি, রুদ্র (১৯৭৮: কৃষি) ইত্যাদি।

তবে মার্কসীয় বিপ্লবের তত্ত্বকে বিযুক্ত করে। সুতরাং আমাদের আলোচনা থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতি বিশ্লেষণের ৪ ধারাতে যেমনি ধনাত্মক উপাদানসমূহের উপস্থিতি, তেমনি বিকল্পচিন্তার ভিত্তিসমূহও পুরোপুরি বিদ্যমান।

বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতি– বিকল্পচিন্তার ভিত্তি ও উপাদান প্রসঙ্গে

বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতি গবেষণায় বিমূর্ত থেকে মূর্তে পৌঁছানোর সময় যেসব পরস্পরসম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বিকল্প চিন্তার ভিত্তি ও উপাদান হিসেবে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ:

ক. ভাগচাষ ও তার বিভিন্ন ধরনকে– কোন উৎপাদন সম্পর্কের বাহক বা প্রতিভু হিসেবে ধরে নেব? বিভিন্ন ধরনের ভাগচাষের বিবর্তনকে কীভাবে মূল্যায়ন করব? কীভাবে মূল্যায়ন করব তাদের সমষ্টিগত ফলাফলকে? একই প্রশ্ন ইজারাদারি ও মহাজনী শোষণ সম্পর্কেও।

খ. মজুরিশ্রম ব্যবহার করে এমনসব খামারই কি পুঁজিবাদী খামার? অথবা সব ধরনের মজুরিশ্রম বিক্রেতাকে কি পুঁজিবাদী শোষণের আওতাধীন শ্রমিক রূপে পরিগণিত করা সম্ভব? মজুরিশ্রমিক কোন ক্ষেত্রে কোন শর্তে কতটুকু অবাধ ও সবাধ? মুচলেকাবদ্ধ শ্রমিকদের (bonded labour) অস্তিত্ব আছে কি, থাকলেও কতটুকু?

গ. বাজারে যা আসছে (ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে) তা-ই পণ্য কি না? কোন শর্তাধীনে সেটা সরল পণ্য, কোন শর্তাধীনে পুঁজিবাদী পণ্য? যার ওপর ভর করে পুঁজিবাদ বিকশিত হচ্ছে, সেই পণ্যোৎপাদনের পরিধি কতটুকু? কৃষির বাণিজ্যিক ভিত্তির মাত্রা কত দূর বিস্তৃত?

ঘ. নিঃস্বকরণ ও সর্বহারাকরণ (pauperization and proletarianization) প্রক্রিয়ার মাঝে মৌলিক পার্থক্য কোথায়? আমাদের দেশে প্রক্রিয়া দুটির কোনটির আপেক্ষিক গুরুত্ব কতটুকু এবং বিকাশধারার বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?

ঙ. কৃষিতে প্রাক্-পুঁজিবাদী সম্পর্কসমূহের ওপর ভর করে, নাকি তাকে ধ্বংস করে (চিরায়ত প্রথার) পুঁজিবাদী উৎপাদনসম্পর্ক বিকশিত হচ্ছে? এসবের যুক্তি কোথায়?

চ. আপেক্ষিক জনসংখ্যাধিক্যের সুযোগে পুঁজি শ্রমশক্তিকে 'আনুষ্ঠানিকভাবে' অধীনস্থ করে রাখছে, নাকি 'প্রকৃতই' অধীনস্থ করছে (চিরায়ত প্রথা)? কোনটির প্রকৃত মাত্রা কতটুকু?

ছ. খুদে পণ্য উৎপাদকদের প্রতিযোগিতায় পরাজিত করে (কৃষি ও কৃষির বাইরে) পুঁজিবাদ বিকশিত হচ্ছে (চিরায়ত প্রথা), নাকি পুঁজিবাদ ও খুদে পণ্য উৎপাদকদের বিকাশ সমান্তরাল পথে চলছে?

জ. বাণিজ্যপুঁজি কোন কোন ক্ষেত্রে কতটুকু বিকশিত হয়েছে ও হচ্ছে? কোন কোন ক্ষেত্রে এবং কেন বিকশিত হতে পারছে না? বাণিজ্যপুঁজি বিকাশের কোনো সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক সূত্র উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব কি না?

ঝ. বাণিজ্যপুঁজির শিল্প পুঁজিতে উত্তরণের অন্তর্নিহিত সারসত্তা কী? এই উত্তরণে বাধা কোথায় এবং তার আপেক্ষিক সীমাবদ্ধতা কোথায়? বাণিজ্যপুঁজির বিকাশ মার্কস বর্ণিত "দ্বিতীয় পথে" হচ্ছে কি, অর্থাৎ "যখন সে ধীরে ধীরে শিল্পপুঁজিতে রূপান্তরিত হয়ে পুঁজিবাদের পথ প্রশস্ত না করে (উল্টোটা ঘটে চিরায়ত প্রথায়) ঐতিহাসিক প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা পালন করে"? (দেখুন Marx, পুঁজি; তৃতীয় খণ্ড, পরিচ্ছেদ XIX, XX)।

ঞ. বাণিজ্যপুঁজির বিকাশে ও তার শিল্পপুঁজিতে উত্তরণপ্রক্রিয়ায় আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের (কেন্দ্রের) ভূমিকার মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ কী কী?

ট. এমতাবস্থায় শিল্পপুঁজির স্বাধীন বিকাশ ও তার নির্ধারক উৎপাদনসম্পর্ক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের সম্ভাবনা কতটুকু?

ঠ. পরিপক্বতার মাত্রা ও বিকাশের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক শক্তিসমূহের সাথে সম্পর্কের কারণে বিভিন্ন পুঁজিবাদী উৎপাদনসম্পর্ক (যেমন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুঁজি; ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় পুঁজি; ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ পুঁজি; বিভিন্ন সেক্টরের পুঁজি ইত্যাদি) বিশ্লেষণে অন্তরীকৃত দৃষ্টিভঙ্গি (differentiated approach) নেব কি না?

ড. বিকাশের মূল প্রবণতাসূচক উৎপাদনসম্পর্ক (leading tendency of production relation) ও নির্ধারক উৎপাদন পদ্ধতি (dominant mode of production)-এ দুটোর পরস্পরসম্পর্ক ও পার্থক্য কোথায়?

উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর (অর্থাৎ 'ক' থেকে 'ড') সঠিক উত্তরের ওপরই নির্ভর করবে উৎপাদন পদ্ধতি নির্ধারণের সঠিকতা এবং রাজনীতির সঠিক রণকৌশল। উপরোক্ত প্রশ্নোত্তরসমূহ হবে সেই বৈজ্ঞানিক ব্যারোমিটার, যার সাহায্যে আমরা জানতে পারব এ দেশের শ্রেণিকাঠামোয় প্রলেতারিয়েত, বুর্জোয়া, পেটি বুর্জোয়া ও মধ্যবিত্তের বিকাশমাত্রা এবং গঠনাবস্থা। আরও জানা সম্ভব প্রলেতারিয়েত "আত্মবিস্মৃত শ্রেণি" (class in itself, অর্থনৈতিক শ্রেণি, প্রাক্-প্রলেতারিয়েত বা পুঁজির প্রাথমিক সঞ্চয়নের যুগের প্রলেতারিয়েত) ও "আত্মসচেতন শ্রেণি" (class for itself, রাজনৈতিক সচেতন শ্রেণি, পুঁজিবাদের নির্ধারকতার যুগের প্রলেতারিয়েত) হিসেবে কতটুকু বিকশিত। নির্ধারণ করা সম্ভব হবে বিকাশমান বাণিজ্যপুঁজি ও শিল্পপুঁজির প্রতি শ্রমিকশ্রেণির সম্পর্ক ও রণকৌশল।

ঢ. সবশেষে, নির্দিষ্ট সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সারচিত্র নির্ধারণে যে প্রশ্নটা অত্যন্ত স্বাভাবিক তা হলো বিরাজমান রাজনৈতিক, মতাদর্শগত, ধর্মীয় চিন্তাভাবনা ও সংশ্লিষ্ট সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে বিভিন্ন উৎপাদনসম্পর্ক ও উৎপাদিকা শক্তির ('ক' থেকে "ড' পর্যন্ত প্রশ্নসমূহের মূল্যায়ন-উদ্ভূত) ঐক্য ও অসঙ্গতি কোথায়? তত্ত্বগতভাবে এসব সম্পর্ক সহজবোধ্যভাবে ছক ৯-এ দেখানো হয়েছে।

সুতরাং উত্থাপিত প্রশ্নসমূহ থেকে সহজেই অনুমেয় যে, বাংলাদেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃত সারচিত্র উদ্ঘাটন শুধু সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশেষজ্ঞদের যৌথ উদ্যোগ ও সুসংবদ্ধ অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমেই সম্ভব। অন্যথায় সরলীকরণ ও বিভিন্ন বিকৃত মতামত ছাড়া অন্য কিছুই উদ্ঘাটন করা সম্ভব নয়। আর তাই এই প্রবন্ধে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে উপরোল্লিখিত ১৪টি প্রশ্নের ('ক' থেকে 'ঢ' পর্যন্ত) মধ্যে নিম্নোল্লিখিত মাত্র ৪টির: বিকাশের মূল প্রবণতা নির্ধারক উৎপাদনসম্পর্ক ও নির্ধারক উৎপাদন পদ্ধতি (ড); ভাগচাষ/বর্গাপ্রথা (ক); মজুরিশ্রম/ক্ষেতমজুর (খ); ও পণ্যোৎপাদন (গ) সারসত্তা নির্ধারণের জন্য বিকল্প রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, এই ৪টি প্রশ্ন (১৪টির মধ্যে) বাছাই করা হয়েছে যত্রতত্র বা লক্ষ্যহীনভাবে নয়; এটা উদ্দেশ্যমূলক (purposive sampling বলতে পারেন)। আলোচনার প্রথম প্রশ্ন বাছাই করার কারণ প্রধানত ২টি (১) কেউই বিকাশের মূল প্রবণতাসূচক উৎপাদনসম্পর্ককে

নির্ধারক উৎপাদন পদ্ধতি থেকে পৃথক করে দেখছেন না, (২) কেউ কেউ আবার নির্ধারক উৎপাদন পদ্ধতি নির্ধারণে মানদণ্ডের অভাববোধের কারণেই উৎপাদন পদ্ধতি প্রত্যয়টিকেই বাতিল করার পক্ষপাতি (যেমন ভারতের Ashok Rudra 1978, পৃ. ৯১৭, এবং Shirokov, 1982)। আলোচনার দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ প্রত্যয়সমূহকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা হচ্ছে হয় সামন্তবাদী না হয় পুঁজিবাদী উৎপাদনসম্পর্কের "নির্ভেজাল" বা "বিশুদ্ধ" বাহন হিসেবে। প্রত্যয়সমূহের অন্তর্নিহিত সারসত্তাকে হয় অতিমূল্যায়িত অথবা অবমূল্যায়িত করা হচ্ছে। সেইসাথে প্রশ্ন ৩টি সঙ্গত কারণেই উৎপাদন পদ্ধতির বিতর্কে সবচেয়ে ব্যাপক আলোচনার ক্ষেত্র বলে পরিগণিত হয়ে থাকে। উপরন্তু আমাদের মতে, উপরোক্ত ৪টি বিষয়ের সঠিক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ অন্য ১০টি প্রশ্নের বিশ্লেষণের সম্ভাব্য পথনির্দেশক হতে পারে।

বিকাশের মূল প্রবণতা নির্ণায়ক উৎপাদনসম্পর্ক ও নির্ধারক উৎপাদন পদ্ধতি
(Productioin relation determining the leading tendency of development and the dominant mode of production):

ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, বিকাশের মূল প্রবণতা নির্ণায়ক উৎপাদনসম্পর্ককে নির্ধারক উৎপাদন পদ্ধতির সাথে মিলিয়ে ফেলা ও সারসত্তার দিক থেকে সমার্থক ভাবা পদ্ধতিগত দিক থেকে একটি সাধারণ বিভ্রান্তি। সমগ্র উৎপাদন পদ্ধতি সাহিত্যে এ প্রশ্নটা সবেমাত্র উত্থাপিত হচ্ছে। মীমাংসার পর্যায় এখনো আসেনি। আমাদের মতে, নির্ধারক উৎপাদন পদ্ধতি অবশ্যই বিকাশের মূল ধারার বাহক। কিন্তু বিকাশের মূল প্রবণতা নির্ণায়ক উৎপাদনসম্পর্ক নির্ধারক উৎপাদন পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হবে কি না সেটা শর্তসাপেক্ষ।

বিদ্যমান অন্যান্য উৎপাদনসম্পর্কের সাথে বিকাশের মূল প্রবণতা নির্ণায়ক উৎপাদন সম্পর্কের মূল পার্থক্যগুলো হলো শেষোক্ত উৎপাদনসম্পর্ক:

ক. অর্থনীতির প্রধান দ্বন্দ্বের প্রগতিশীল ধারার বাহক;

খ. অর্থনৈতিক পরিবর্তনের দিক নির্ধারণ কম্পাস;

গ. ঊর্ধ্বমুখী গতিসম্পন্ন, যার মধ্যে সামাজিক প্রগতির ভিত্তি স্থাপিত হচ্ছে; এবং

ঘ. অন্যান্য উৎপাদনসম্পর্কের বিপরীতে নিজস্ব রাজনৈতিক উপরিকাঠামো গড়ে তোলে।

বিকাশের মূল প্রবণতা নির্ণায়ক উৎপাদনসম্পর্ক নির্ধারক উৎপাদন পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হবে কি না সেটা নির্ভর করবে উৎপাদনসম্পর্কসমূহের পারস্পরিক ক্রিয়ার ইচ্ছানিরপেক্ষ ফলশ্রুতির ওপর। এই রূপান্তরের মূল শর্ত হলো প্রাধান্য বজায়কারী উপরোক্ত উৎপাদন সম্পর্কের বাহকদের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে হবে। নির্ধারক উৎপাদন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যসমূহ নিয়ে ইতিমধ্যে বিতর্ক চলছে (মূলত ভারত, ব্রিটেন, লাতিন আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়নে), তবে ফলাফল এখনো নগণ্য। এ মুহূর্তে যা বলা যায়, তা হলো নির্ধারক উৎপাদন পদ্ধতি প্রত্যয়টি যতটুকু পরিমাণগত, ততোধিক গুণগত। আমাদের মতে, নির্ধারক উৎপাদন পদ্ধতির ***গুণগত বৈশিষ্ট্যসমূহ*** হলো:

১. উদ্বৃত্ত দ্রব্যের উৎপাদনশীল খাতে (পরমোপযোগী নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদি ও উৎপাদনের উপায়) সর্বাধিক ব্যবহার;

২. জাতীয় সম্প্রসারিত পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ায় (process of extended reproduction) তার নির্ধারক ভূমিকা;

৩. অন্যান্য উৎপাদন পদ্ধতির বিকাশের সূত্র নির্ধারক উৎপাদন পদ্ধতির গতির সূত্র দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত;

৪. এই উৎপাদন পদ্ধতির অন্যতম বাহক– উৎপাদনের উপায়ের মালিক শ্রেণিসমাজে রাজনৈতিক (অন্যান্য দৃষ্টিভঙ্গি ও মতবাদের ক্ষেত্রেও) আধিপত্য বজায় রাখে।

নির্ধারক উৎপাদন পদ্ধতির ***পরিমাণগত বৈশিষ্ট্যসমূহ*** হলো মূলত

১. অধিকাংশ জাতীয় উৎপাদন এই উৎপাদন পদ্ধতির আওতাধীনেই সৃষ্টি;

২. অন্যান্য উৎপাদন পদ্ধতির তুলনায় এই উৎপাদন পদ্ধতি অধিক মাত্রায় উৎপাদনশীল;

৩. অধিকাংশ উদ্বৃত্ত মূল্য তারই নিয়ন্ত্রণাধীনে সৃষ্টি;

৪. অন্যান্য উৎপাদন পদ্ধতির আওতায় উৎপাদিত দ্রব্যাদি নির্ধারক উৎপাদন পদ্ধতির নিয়ন্ত্রণাধীনেই পুনর্বণ্টিত হয়;

৫. নিয়োজিত শ্রমশক্তির প্রধান অংশ এই উৎপাদন পদ্ধতির আওতাধীন; এবং

৬. নির্ধারক শ্রেণিসমূহসহ উপরিকাঠামোয় নিয়োজিত সবার জীবনোপায়ের অধিকাংশের জোগান নির্ধারক উৎপাদন পদ্ধতি।

সুতরাং, বিকাশের মূল প্রবণতা নির্ণায়ক উৎপাদনসম্পর্কের সাথে নির্ধারক উৎপাদন পদ্ধতির সীমারেখা টানা পদ্ধতিগত দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেক্ষেত্রে নির্ধারক উৎপাদন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যসমূহের বিচারে আমাদের দেশে 'পুঁজিবাদী উৎপাদনসম্পর্ক'– বিকাশের মূল প্রবণতা নির্ণায়ক হতে পারে, কিন্তু নির্ধারক কি না সেটা ব্যাপক গবেষণাসাপেক্ষ প্রশ্ন। আর এ বিষয়টির মর্মবস্তু বোঝার জন্য সহায়ক হতে পারে বিধায় ইতিমধ্যে উপরে যা ব্যাখ্য-বিশ্লেষণ করা হলো সমগ্রতার স্বার্থে তার পাশাপাশি নিচে "ভাগচাষ ও বর্গাচাষ", 'মজুরিশ্রম', এবং 'পণ্যোৎপাদন'– এ তিনটি প্রত্যয়ের সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি।

ভাগচাষ ও বর্গা প্রথা

আমাদের দেশে ভাগচাষ ও বর্গা প্রথার বয়স লিখিত ইতিহাসের বয়সের সমান। বিশ্ব অর্থনৈতিক ইতিহাসেও ভাগচাষ সবচেয়ে পুরোনো চাষপদ্ধতির অন্যতম (এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত দেখুন Byres, পৃ. ৭-৪০)। ভাগচাষ সেই হিন্দু আমল থেকে মুসলিম আমল পেরিয়ে অদ্যাবধি বিরাজমান। আমাদের দেশের রাজনেতিক-অর্থনৈতিক সাহিত্যে সব ধরনের ভাগচাষকে অবিসংবাদিতভাবে সামন্তবাদের লক্ষণ ও নির্দেশক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ক্ষেত্রবিশেষে ভাগচাষকে পুঁজিবাদের লক্ষণ হিসেবেও গণ্য করা হয়। ভাগচাষকে নির্দিষ্ট উৎপাদন পদ্ধতির বাহক হিসেবে ধরে নিয়েই আমাদের রাজনৈতিক তত্ত্বজ্ঞানীরা জোতদার-ভাগচাষিসম্পর্কিত রণকৌশল নির্ধারণ করে বসে আছেন। আর তাই এ বিষয়ে নতুন কিছু বলতে যাওয়াটা বিপজ্জনক। কারণ নির্দ্বিধায়, সর্বসম্মতিক্রমে সেটা নাকচ হয়ে যাবে। অথচ ভাগচাষ, বর্গা প্রথা যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন শর্তাধীনে অন্তর্বর্তীকালীন উৎপাদনসম্পর্কের বাহক হতে পারে সে সম্পর্কে "পুঁজির" তৃতীয় খণ্ডে মার্কস বিস্তারিত আলোচনা করেছেন (দেখুন, Schagolov ১৯৭৯, পৃ. ৩৪৪-৩৫২, ৩৫৭-৩৬৯)।

প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত ধারণা যে, বর্গা প্রথা সামন্তবাদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আর এই সামন্তবাদ বলতে পশ্চিম ইউরোপীয় ইতিহাসে "ফিউডাল ব্যবস্থা" বলে যা পরিচিত তাকেই বোঝানো হয়ে থাকে। অথচ ইউরোপীয় ফিউডাল ব্যবস্থার অনুরূপ কোনো উৎপাদন ব্যবস্থা বা সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বাংলাদেশে এখনো কায়েম আছে অথবা ইতিহাসের কোনো কালেই ছিল– এই অনুসিদ্ধান্ত আমার কাছে আদৌ

গ্রহণযোগ্য নয়। বর্তমান প্রবন্ধে এ বিতর্কে প্রবেশ না করে বাংলাদেশে প্রচলিত ভাগ প্রথাসমূহের ধরন, তাদের অন্তর্নিহিত উৎপাদনসম্পর্কগুলোর সারসত্তা বিচার এবং বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক স্তরে তারা কোন উৎপাদন ব্যবস্থার বাহক হিসেবে কাজ করছে– এসব পদ্ধতিগত বিষয়াদি বিবেচনা করার চেষ্টা করব।

ভাগচাষির সাথে মালিকের (জমির) সম্পর্কটা বহুমাত্রিক। সম্পর্কসমূহ ভূমিকেন্দ্রিক, উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণকেন্দ্রিক, বিভিন্ন ধরনের কর ব্যবস্থাকেন্দ্রিক, ধার-দেনাকেন্দ্রিক আবার ক্ষেত্রবিশেষে মালিক-ভাগচাষি সম্পর্কসমূহ বিভিন্ন ধরনের অর্থনীতিবহির্ভূত রূপ পরিগ্রহ করে। উপরোক্ত সম্পর্কসমূহ কী পরিমাণে শর্তভিত্তিক, কী পরিমাণেই বা প্রথাভিত্তিক; কতটা অর্থনৈতিক, কতটাই বা অর্থনীতিবহির্ভূত– এই বিচারটা উৎপাদনসম্পর্কের দিক থেকে ভাগ প্রথার প্রকৃতি নির্ণয়ের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভাগীদার-মালিক সম্পর্কসমূহ ক্ষেত্রবিশেষে চূড়ান্ত, আবার ক্ষেত্রবিশেষে সে সম্পর্ক নমনীয় নির্ভরশীলতার রূপ ধারণ করে। ভাগচাষিও হতে পারে বিভিন্ন ধরনের– ভূমিহীন, স্ব-ভূমি। স্ব-ভূমি ভাগচাষিও হতে পারে বিভিন্ন ধরনের- অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ। এমতাবস্থায় সব ধরনের ভাগচাষি ঢালাওভাবে কোনো একটি নির্দিষ্ট উৎপাদনসম্পর্কের বাহক হবে এমনটা দাবি করা অযৌক্তিক। এ দাবি বাস্তববিবর্জিত।

বিনা পারিশ্রমিকে শ্রম দেওয়া বা মালিকের জন্য বেগার খাটা এবং শ্রমকর (labour rent)– এ দুটি এক জিনিস নয়। এদিক থেকে দেখতে গেলে বাংলাদেশের ইতিহাসে শ্রমকরের প্রচলন কখনো ছিল কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। জমিদারী আমলেও প্রজারা কর বা রাজস্ব হিসেবে যা দিত তা হলো শস্যের নির্দিষ্ট কোনো অংশ— শ্রমের নির্দিষ্ট কোনো অংশ নয়। আবার শ্রমকর নেই বলে সামন্তবাদী উৎপাদনসম্পর্ক নেই সেটিও ঠিক নয়। ইউরোপে খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম বা দ্বিতীয় শতকেও দাস উৎপাদন পদ্ধতির নির্ধারকতার আমলে রোমক সাম্রাজ্যের প্রান্তিক অঞ্চলগুলোতে জমি চাষ হতো দাস সম্পর্কের ভিত্তিতে নয়; করদাতার সম্পর্কের ভিত্তিতে। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে কর ছিল শস্য বা অর্থকর– শ্রম কর নয়। ঐ দাস উৎপাদন পদ্ধতি বিবর্তিত হয়ে যখন সামন্তবাদী উৎপাদন পদ্ধতিতে রূপ নিল তখন কিছু চাষি রয়েই গেল, যারা শস্য ও অর্থে কর দিত এবং ভূমিখণ্ডের সাথে সম্পূর্ণরূপে বন্ধনদশাগ্রস্ত নয় (অন্যের সার্ফে রূপান্তরিত হলো)। আবার সামন্তবাদী উৎপাদন পদ্ধতি বিবর্তিত হয়ে যখন ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতিতে রূপ নিচ্ছে সেই উত্তরণকালে শস্যকর (দ্রব্যকর) বিবর্তিত হয়ে রূপান্তরিত হচ্ছে অর্থকর-এ।

উল্লেখ্য, শস্যকরেরও রকমফের আছে। "কোনো পূর্বনির্ধারিত পরিমাণের শস্য– কর হিসেবে দেওয়া" এবং "উৎপাদিত শস্যের কোনো এক পূর্বনির্ধারিত অংশ– কর হিসেবে দেওয়া"[৬০] এক ব্যাপার নয়। শেষোক্ত ক্ষেত্রে করব্যবস্থা অন্তর্বর্তীকালীন উৎপাদনসম্পর্কের পরিচায়ক।

উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ (হালের বলদ, কাঁচামাল, সার, বীজ, সেচের জন্য পানি সরবরাহের দৃষ্টিকোণ থেকে মালিক-ভাগচাষি সম্পর্ক হতে পারে সামন্তবাদী, পুঁজিবাদী এবং অন্তর্বর্তীকালীন। উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের পুরোটাই সরবরাহ করতে পারে উৎপাদক অথবা ভূস্বামী। প্রথম ক্ষেত্রে উৎপাদক ভূস্বামী সম্পর্কটা সামন্তবাদের লক্ষণ, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পুঁজিবাদের। কিন্তু উৎপাদক ভূস্বামী যখন ঐসব উপকরণের সরবরাহ ভাগাভাগি করে নেয়, তখন উৎপাদনসম্পর্কের প্রকৃতি কী হবে? এক্ষেত্রে যদি সামগ্রিক অর্থনৈতিক বাস্তবতায় পুঁজিবাদী উৎপাদনসম্পর্ক বিকাশের মূলধারা নির্ণায়ক হয়ে থাকে তাহলে এক্ষেত্রে ভাগচাষ হবে অন্তর্বর্তীকালীন উৎপাদনসম্পর্কের বাহক।

ভাগচাষি যখন "নির্ভেজাল" বা 'বিশুদ্ধ' ভাগচাষি নয় অর্থাৎ একাধারে জমির মালিক ও ভাগচাষি (Owner-cum-tenant, যারা ১৯৭৭ সালের হিসাবে বাংলাদেশের মোট ভাগচাষির ৯৫ শতাংশ, দেখুন Januzi and Peach 1977)– এটা ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবাদী সম্পর্কের পরিচায়ক। এই প্রক্রিয়া পুঁজিবাদের দিকে গমনের লক্ষণ, কিন্তু এখনো রক্ত-মাংসে পুঁজিবাদী উৎপাদনসম্পর্ক নয়। আবার উল্লিখিত "ভাগচাষি মালিক" বা "স্ব-ভূমি ভাগচাষী" যখন উৎপাদনের উপায়টুকু (মূলত জমি) হারিয়ে মজুরিশ্রমিকে রূপান্তরিত হচ্ছে তার অর্থ এই নয় যে, সে অবশ্যম্ভাবীভাবে পুঁজিবাদী উৎপাদনসম্পর্কের প্রতিভু।

বর্গা প্রথায় একদিকে বৃহৎ ও ধনী মালিক আর অন্যদিকে ক্ষুদ্র ও দরিদ্র বর্গাদার অবস্থান করছে। এমতাবস্থায় বর্গা মালিক যখন সামগ্রিকভাবে উৎপাদন বৃদ্ধিতে

---

[৬০] শস্য ভাগাভাগির অনুপাতটা (মালিক ও ভাগচাষির মধ্যে) কেমন হবে সেটা বহু বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। যেমন– জমির উর্বরতা শক্তি; দুই পক্ষের আপেক্ষিক আর্থিক ক্ষমতা; উৎপাদন ব্যয় বহনের ভাগাভাগি সম্পর্ক শর্ত; মূল শস্যের সাথে সহজাত অন্যান্য দ্রব্যের (যেমন খড়) বিভাজনজনিত শর্ত; উৎপাদিত শস্যের ধরন ইত্যাদি। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাগাভাগির অনুপাতটা ১: ১ অথবা ২: ১ কেন এবং কেনই বা আবহমানকাল ধরে অনুরূপ অনুপাত বজায় থাকছে– বিষয়টি অত্যন্ত জটিল এবং এখনো বিতর্কের পর্যায়ে অবস্থান করছে। (বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আগ্রহী পাঠক প্রাথমিক ধারণার জন্য দেখতে পারেন Rastiannikov 1973)।

আগ্রহের কারণে আত্মসাৎকৃত উদ্বৃত্তের একাংশ পুঁজিতে রূপান্তর করছে এবং অন্যাংশ দিয়ে সুদের ব্যবসা (উৎপাদনবিমুখ) করছে (বাংলাদেশে এটা অত্যন্ত বাস্তব ও বিস্তৃত ঘটনা) সে অবস্থায় বর্গা মালিক-বর্গাদার সম্পর্কটি যেমন আদৌ সামন্তবাদী নয়, ঠিক তেমনি সামগ্রিকভাবে তা পুঁজিবাদী উৎপাদনসম্পর্কও নয়। এটা নিঃসন্দেহে অন্তর্বর্তীকালীন উৎপাদনসম্পর্কের পরিচায়ক।

ইদানীংকালের পরিসংখ্যানে আমাদের দেশে একধরনের বর্গাদারের আর্বিভাব লক্ষিত হচ্ছে যাদের "স্ব-ভূমি ধনী বর্গাদার" আখ্যায়িত করা যেতে পারে। এ ধরনের বর্গাদারেরা অনেক জমির মালিক এবং অনেক জমি বর্গা নেয় ও ক্ষেতমজুর লাগিয়ে চাষ করায়। এসব " স্ব-ভূমি ধনী বর্গাদারের" আংশিকভাবে কৃষিতে পুঁজিপতি শ্রেণি বলে অভিহিত করা যেতে পারে। তবে ভবিষ্যতে এ ধরনের বর্গাদারদের অবস্থা কেমন রূপ নেবে তা নির্ভর করছে প্রধানত শহর-নগরকেন্দ্রিক বিকাশের ধারা-ধরন-প্রকৃতি কী রূপ নেবে তার ওপর। অনেক সম্ভাবনার মধ্যে এ সম্ভাবনা অমূলক নয় যে ভবিষ্যতে গ্রামের ধনী কৃষক কৃষিতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলবেন; কিন্তু কৃষিজমির মালিকানা ছাড়বেন না আর একই সাথে ভাগচাষে আগ্রহ হারিয়ে বিভিন্ন ধরনের চুক্তির ভিত্তিতে কৃষিজমি হাতে রাখবেন যেসব চুক্তি হবে মূলত অর্থকেন্দ্রিক ইত্যাদি।

ভাগচাষি– জমির মালিকের ওপর নির্ভরশীল হতে পারে নানাভাবে। ভাগীদার যখন একাধিক মালিকের সাথে ভাগচুক্তি করার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত; যখন সে (ভাগীদার) মালিক ছাড়া আর কারও কাছে শস্য বিক্রি করতে পারে না (ভাগীদার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফসল ওঠার সাথে সাথে শস্য বিক্রি করতে বাধ্য হয়); ভাগীদার যখন মালিকের ফুটফরমায়েস শুনতে এবং বেগার খাটতে বাধ্য হয়, এগুলো সবই মালিকের ওপর ভাগীদারের চূড়ান্ত নির্ভরশীলতার প্রকাশ। এসবের কোনোটাই পুঁজিবাদের নয়– প্রাক্-পুঁজিবাদী উৎপাদনসম্পর্কের পরিচায়ক।

ভাগ প্রথার অন্তর্গত বিভিন্ন প্রক্রিয়ার আলোচনা থেকে তাদের অন্তর্নিহিত উৎপাদনসম্পর্কগুলো নিয়ে এতক্ষণ যা বলা হয়েছে তা ছক ১২-তে দেখানো হয়েছে।

ভাগচাষীর সাথে গ্রামীণ শোষকদের সম্পর্কের ভিত্তি হলো ধার-দেনা সম্পর্ক। ধারদাতা হতে পারে বর্গাজমির মালিক অথবা মহাজন। অনেক ক্ষেত্রে বর্গাজমির মালিক ও সুদি কারবারী মহাজন একই ব্যক্তি অথবা নিকটতম আত্মীয়। অনেক ক্ষেত্রে ধারদেনা সম্পর্ক– মালিকের ওপর ভাগচাষীর নমনীয় নির্ভরশীলতার

বহিঃপ্রকাশ। এসব ধারদেনার বহিঃপ্রকাশ হতে পারে (manifestations of liberalised dependency) বিভিন্ন প্রকৃতির, বিভিন্ন ধরনের, বিভিন্ন শর্তের।

ভাগচাষি যত দরিদ্র, ধারদেনার প্রয়োজন তত বেশি। তার প্রয়োজন মেটানোর সুযোগ-সুবিধা সীমাবদ্ধ। গ্রামীণ ক্ষমতাকাঠামো, ঋণের শর্ত ও নিয়মসমূহের কারণে দরিদ্র ভাগচাষি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংগঠিত উৎসের ঋণ নিতে অক্ষম। মহাজনী ধারও পাওয়া সম্ভব নয়, কারণ সে নিঃস্ব এবং বন্ধক রাখার মতো কিছু নেই। এমতাবস্থায় দরিদ্র চাষীর ঋণপ্রাপ্তির একমাত্র উৎস জমির মালিক। আর মালিক ঋণ দেবে, কারণ সে জানে যে ভাগচাষি পালাবে না, ঋণ পেলে সে (ভাগচাষি) মালিকের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিপত্তি বজায় রাখতে সাহায্য করবে এবং ধার শোধ পদ্ধতিটিও অত্যন্ত সহজ (ফসল ভাগাভাগির সময় শোধের অংশ বা ধারের সুদ ভাগীদারের ফসলের ভাগ থেকে কেটে রাখলেই হলো)।

আমাদের দেশে ভাগচাষিরা যেসব ধারদেনা পেয়ে থাকে তা হতে পারে তিন রকমের (সুদের হার বিভিন্ন): খোরাকি ধার, অপ্রত্যাশিত ধার, এবং উৎপাদনশীল ধার। প্রায় সব ক্ষেত্রেই ধার যে ফর্মেই দেওয়া হোক না কেন তা পরিশোধিত হয় উৎপাদিত শস্যের মাধ্যমে (অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধানে)। খোরাকি ধার সবচেয়ে বিস্তৃত ও নিয়মিত ধার। ভাগচাষি তার ভাগের ফসলে বছরের পুরো পারিবারিক খরচ মেটাতে অক্ষম। কিনে খাওয়ার সঙ্গতিও তার নেই। সুতরাং মালিকের কাছে ফসল ধার নেয় (অকালে) এবং ফসল উঠলে শোধ দিয়ে দেয় (বিভিন্ন শর্তে সুদের হার দাঁড়ায় বাৎসরিক ১০ থেকে ৩০০ শতাংশে)।

ছক ১২: ভাগ প্রথার অন্তর্গত বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সারসত্তা

প্রক্রিয়া	কোন উৎপাদনসম্পর্কের লক্ষণ?		
	সামন্ত বাদী	অন্তবর্তী কালীন	পুঁজিবাদী
১. ***ভাগ প্রথাধীন জমির সাথে মালিকের সম্পর্ক:***			
ক. মালিকের জন্য জমি পুঁজি নয়; সে জমিতে পুঁজি বিনিয়োগ করে না; আত্মসাৎকৃত উদ্বৃত্ত পুঁজি নয়, সেই উদ্বৃত্ত উৎপাদনবিমুখভাবে অপচয় করে। মালিক উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহী নয়।	√	√	
খ. মালিকের জন্য জমি পুঁজি; সে আত্মসাৎকৃত উদ্বৃত্তকে পুঁজি হিসেবে উৎপাদনে বিনিয়োগ করে; পুঁজি ও উৎপাদন অবিরাম সম্প্রসারিত হয়। মালিক উৎপাদন বৃদ্ধিতে আগ্রহী (সমস্ত জমি ভাগে দিয়ে দেওয়ার উদাহরণ বৃহৎ জমির মালিকদের মধ্যে এখন পূর্বাপেক্ষা স্বল্প)।			√
গ. মালিকের জন্য জমি-পুঁজি; আত্মসাৎকৃত উদ্বৃত্তের একাংশকে পুঁজি হিসেবে এবং অন্য অংশকে ব্যাপকভাবে সুদি কারবারে এবং/অথবা অকৃষিজ কাজে বিনিয়োগ করে।		√	
২. ***উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহের সরবরাহকারী:***			
ক. উৎপাদক	√		
খ. ভূস্বামী			√
গ. উৎপাদক ও ভূস্বামী ভাগাভাগি করে নেয়		√	
৩. ***খাজনা পদ্ধতি:***			
ক. শ্রমখাজনা– বিনা মজুরিতে শ্রম দান। ভাগচাষি তার শ্রমসময়ের একাংশ কাজ করে মালিকের জমিতে যার পুরো ফসল মালিকের প্রাপ্য, আর অন্য অংশ কাজ করে মালিকপ্রদত্ত জমিতে যার পুরো বা আংশিক ফসল উৎপাদকের (ইউরোপের সার্ফ-লর্ড সম্পর্ক: ফ্রান্সের করভি ইত্যাদি)। চাষি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের সাথে অচ্ছেদ্য যোগসূত্রে বাঁধা।	√		
খ. শস্যখাজনা	√	√	
– পূর্বনির্ধারিত পরিমাণের শস্য- খাজনা হিসেবে দেওয়া হয়			
– উৎপাদিত শস্যের কোনো এক পূর্বনির্ধারিত অংশ খাজনা হিসেবে দেওয়া হয়		√	
গ. অর্থখাজনা		√	√
৪. ***ভাগচাষির মালিকানা:***			
ক. ভূমিহীন ভাগচাষির কোনো ভূমি মালিকানা নেই	√		
খ. স্ব-ভূমি ভাগচাষি:			
– কিছু জমির মালিক এবং আবাদে মূলত পারিবারিক শ্রম ব্যবহার করে		√	√
– জমির মালিক, অনেক জমি বর্গা নেয় এবং আবাদে মূলত মজুরিশ্রমিক নিয়োগ করে।			√

অপ্রত্যাশিত ধার নেওয়া হয়ে থাকে বিশেষ উপলক্ষে (বিয়েশাদি, অসুখ-বিসুখ ইত্যাদি কারণে)। এক্ষেত্রে মালিকের কাছ থেকে ধার নেওয়া হতে পারে হয় ফসলে, নয়তো অর্থে। তবে পরিশোধিত হয় ফসলে। উৎপাদনশীল ধার আমাদের দেশে অপেক্ষাকৃত নতুন প্রক্রিয়া। এই ধার দেওয়া হয় চাষের খরচ মেটানোর জন্য এবং এটাকে ধার হিসেবে না দেখে উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণে মালিকের অংশ হিসেবেও দেখা সম্ভব। এ ধরনের ধার দেওয়া হয় অর্থে নয়, কাঁচামালে (সার, বীজ, কীটনাশক ঔষধ ইত্যাদি)। এবং পরিশোধিত হয় ফসলে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে ধারদাতা ধার প্রাপকের সম্পর্কটা আদৌ সামন্তবাদী সম্পর্ক নয়, এটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অন্তর্বর্তীকালীন উৎপাদনসম্পর্কের পরিচায়ক।

আমাদের দেশের রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদরা ভাগচাষি-মালিক সম্পর্কে ধারদেনার প্রশ্নে প্রায়ই একটি বিষয়কে গুরুত্ব দেন না। বিষয়টি হলো সুদহীন ধার। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, সুদহীন ধার বিদ্যমান। কেন তা বিরাজ করছে, সেটা কীসের লক্ষণ? এ মর্মে পাঠকের কাছে একটা অতি সাধারণ প্রশ্ন উত্থাপন করা গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি। তা হলো যে গরুর দুধ দুইয়ে গোয়ালা বড় লোক, সে কি কখনো ঐ গরু মেরে ফেলবে? নিশ্চয়ই নয়। অনুরূপ অর্থে একদিকে ভাগীদারের শ্রমশক্তিকে বাঁচিয়ে রাখার অর্থ তারই সৃষ্ট উদ্বৃত্তকে আত্মসাৎ করার পূর্বশর্তটিকে বাঁচিয়ে রাখা, অন্যদিকে ঋণগ্রহীতাকে কেনা গোলাম করে রাখা। আর যেহেতু মালিক ছাড়া অন্য কারো কাছে সে ধার পেতে পারে না, তাই গ্রামীণ দ্বন্দ্বে সে সহজে মালিকের বিপক্ষে যেতে পারে না। এমতাবস্থায় মালিক সুদহীন ধার দেবে না কেন? উপরন্তু ভাগচাষি যদি সম্পত্তিহীন চাষি হয়ে থাকে, তাহলে তাকে বিনা সুদে ধার দেওয়ার বিপক্ষে যুক্তি কোথায়? আর যার বিক্রির মতো কিছু আছে (শ্রমশক্তি ছাড়াও) তাকে সুদহীন ধার দেবে কেন? ইতিপূর্বে উল্লিখিত ১০% থেকে ৩০০% বাৎসরিক সুদের ধার দেওয়া হবে শেষোক্ত গ্রুপের ভাগচাষিদের। কারণ সুদি ধারই হলো সেই অন্যতম পদ্ধতি, যার সাহায্যে শেষোক্ত গ্রুপের ভাগচাষিদের দ্রুত ভূমিহীন ক্ষেতমজুর ও বর্গাদারে রূপান্তরিত করা সম্ভব। সুতরাং বিভিন্ন প্রকৃতির উৎপাদনসম্পর্কের পরিচায়ক হিসেবে একই গ্রামে কেউ চড়া সুদে, কেউ বিনাসুদে ধার পেতে পারে– এই দুই প্রথার সহাবস্থান আদৌ বিচিত্র নয় এবং আপেক্ষিক জনসংখ্যাধিক্যের আওতায় খুবই যুক্তিসঙ্গত।

মহাজনের কাছে ভাগচাষির দায়গ্রস্ততা ভাগচাষের ক্রমবিকাশে ব্যাপক বিস্তৃত প্রক্রিয়া। সেক্ষেত্রে যখন মহাজনের কাছে দায়গ্রস্ততার কারণে কৃষককে মহাজনের ভাগচাষিতে

রূপান্তরিত হতে হচ্ছে তখন উৎপাদন পদ্ধতি হিসেবে পুঁজিবাদের জন্ম হচ্ছে বলা যায় না। এ ধরনের প্রক্রিয়াসমূহ বিশ্লেষণ করে মার্কস তাঁর "অর্থনৈতিক পাণ্ডুলিপি ১৮৫৭-১৮৫৯" তে যে উপসংহারে পৌঁছেছেন তা হলো, "শেষোক্তটা এখনো পুঁজিবাদী প্রক্রিয়ার কবলে পড়েনি। পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি ব্যতিরেকেই পুঁজির শোষণ বর্তমান। এটা সে ধরনের মহাজনী, যখন উৎপাদনের ওপর পুঁজি শুধু আনুষ্ঠানিকভাবেই পুঁজি। এটা প্রাক্-বুর্জোয়া ধরনের উৎপাদনের আধিপত্য" (দেখুন Marx-Engels, Collected Works, Vol. 46 পৃ. ৩৬৭)। সুতরাং এটা পরিষ্কার যে, সামাজিক শ্রমবিভাগ, কৃষিতে মালিকানার বৈশিষ্ট্যসহ উৎপাদকের সাথে মহাজনের সব ধরনের সম্পর্কের– মহাজনী দেনায় আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা অথবা দেনামুক্ত– বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ ছাড়া "নিচু" থেকে পুঁজিবাদ বিকাশের সুপ্ত সম্ভাবনা নির্ধারণ সম্ভব নয়।

মহাজনী শোষণ শেষ পর্যন্ত কৃষককে উচ্ছেদ করে এল নতুন ধরনের খামার। এ প্রক্রিয়া পরিপূর্ণ পুঁজিবাদী প্রক্রিয়া নয়। এটা তখনই পুঁজিবাদী উৎপাদনের অন্তর্ভুক্ত, যখন উপরোক্ত প্রক্রিয়া-উদ্ভূত নতুন খামারে উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি হচ্ছে, স্বাধীন মজুরিশ্রমিক নিযুক্ত হচ্ছে ও বর্ধিত বা সম্প্রসারিত পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়া চালু হয়ে গিয়েছে। এক্ষেত্রে বলে রাখা উচিত যে, আমাদের দেশে ভাগচাষ-উদ্ভূত প্রক্রিয়া পুঁজিবাদ বিকাশে একটা শক্তিশালী প্রতিবন্ধকতা ছিল ও আছে। সেটি হলো ঔপনিবেশিক শোষণের সৃষ্টি ও পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী শ্রমবিভাগ কর্তৃক কৃত্রিমভাবে সংরক্ষিত আপেক্ষিক জনসংখ্যাধিক্য। ভাগচাষের শর্তাবলীর দ্রুত অবনতি সেটারই সরাসরি ফলশ্রুতি। সে কারণেই বাংলাদেশের ব্যাপক আপেক্ষিক শর্তাধীনে ভাগচাষি গ্রামীণ নিঃস্ব জনসংখ্যার (Pauperized population) অন্যতম বৃহৎ স্তর।

সুতরাং ঐতিহাসিকভাবেই বাংলাদেশের ভাগচাষ প্রথা (ও তার বিবর্তন) পশ্চিমী ভাগচাষ প্রথা থেকে ভিন্নতর। আমাদের ভাগচাষে যেভাবে পুঁজিবাদের জন্য আবাদী জমি মুক্ত হচ্ছে সেটা উৎপাদকের জন্য অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক এবং বর্তমান মালিকানাসম্পর্ক কাঠামোর অধীনে পুঁজিবাদী উৎপাদনসম্পর্কের জন্মদানে প্রায় অপারগ। এ দৃষ্টিতে উল্লিখিত প্রক্রিয়াকে বড়জোর নিকৃষ্ট পথে রক্ষণশীল পুঁজিবাদী (conservative capitalism) বিবর্তনের ভিত্তি বলে গণ্য করা যেতে পারে।

সবশেষে বলা উচিত যে, এতক্ষণ আমরা যা আলোচনা করলাম তার মূল উদ্দেশ্য ছিল ভাগচাষের তাত্ত্বিক মূল্যায়ন এবং নির্মোহ দৃষ্টি দিয়ে ভাগচাষাধীন প্রক্রিয়াসমূহকে

বিশ্লেষণ করা। ভাগচাষ, বর্গা প্রথা আলোচনা থেকে পদ্ধতিগত দিক থেকে যেসব উপসংহারে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে (স্বল্পপরিসরে প্রবন্ধাংশে) সেগুলো পরীক্ষা করে দেখার জন্য গবেষকদের যেসব সংখ্যাতাত্ত্বিক উপাদান দরকার (যেগুলো আমার জানামতে, এখনো অনুপস্থিত এবং দু-একটি যাও আছে তার মান সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ আছে) সেগুলো হলো: (১) ভাগ প্রথায় প্রচলিত উৎপাদন ভাগাভাগির বিভিন্ন অনুপাত; (২) এক গ্রামে একাধিক রকমের ভাগ প্রথার অস্তিত্ব; (৩) কৃষির খরচ ভাগাভাগির বিভিন্ন প্রথা; (৪) বিভিন্ন উপাদানের খরচ ভাগাভাগির প্রচলন; (৫) শস্য ভাগাভাগি ও খরচ ভাগাভাগির পারস্পরিক সম্পর্ক; (৬) ভাগ প্রথায় খড়ের বিভাজন; (৭) ধান ছাড়া অন্য শস্যের বিভাজন অনুপাত; (৮) উচ্চফলনশীল ধানের ক্ষেত্রে ভাগ প্রথার প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য; (৯) ভাগ প্রথার অন্যান্য শর্ত (শর্তের মেয়াদ। কোন শস্য উৎপাদন হবে এবং উৎপাদিত ফসল কোথায় ঝাড়াই, ভাগাভাগি হবে ইত্যাদির ব্যাপারে কে সিদ্ধান্ত দেবে); (১০) বর্গা জোত, নিজ জোত ও মিশ্র জোতের উৎপাদনশীলতা; (১১) মালিকের ওপর ভাগীদারের নির্ভরশীলতা; (১২) মালিক ও ভাগীদারের মধ্যে ঋণের সম্পর্ক; (১৩) উৎপাদনের জন্য কাঁচামালের উৎস (বাজার থেকে ক্রয় করা হয়, নাকি খামার থেকে সংরক্ষিত); (১৪) বর্গাজমির মালিকদের অর্থনৈতিক আচরণ; (১৫) বর্গা প্রথার গুরুত্ব হ্রাস বা বৃদ্ধি ।

মজুরিশ্রম

বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতি, বিশেষ করে পুঁজিবাদী সম্পর্ক বিশ্লেষণে পদ্ধতিগত দিক থেকে সবচেয়ে জটিল ও বিতর্কিত প্রত্যয় হচ্ছে পুঁজিবাদী মজুরিশ্রম ও পণ্যোৎপাদন। পুঁজিবাদী মজুরিশ্রম এবং পণ্যোৎপাদনের সারচিত্র ও পরিধি নির্ণয়ে সাধারণত যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়ে থাকে তা হলো শ্রমশক্তি কেনা-বেচা ও দ্রব্যের বাজারজাতকরণের পরিমাণগত দিকসমূহ। এক্ষেত্রে বিষয়টির গুণগত দিক তুলনামূলক স্বল্পবিশ্লেষিত। ফলাফলে শ্রেণিসংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণির প্রকৃত রাজনৈতিক শক্তির মূল্যায়ন অতিরঞ্জিত হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায়। আর তাই "মজুরি", "পণ্যোৎপাদন" প্রত্যয়সমূহ তুলনামূলক বিস্তারিত আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

মজুরিশ্রম ও পণ্যোৎপাদন পুঁজিবাদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রত্যয় হিসেবে গণ্য হবে কি না সেটা শর্তসাপেক্ষ। এখানে উল্লেখ করা উচিত, পরশ্রম ব্যবহার ও দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় পুঁজিবাদপূর্ব সমাজব্যবস্থাগুলোতেও বিদ্যমান। মূল্যতত্ত্বের বয়স ৭ হাজার বছর, আর প্রকৃত অর্থে পুঁজিবাদের বয়স ২০০ বছর। সুতরাং সব "পরশ্রমই"

পুঁজিবাদী মজুরিশ্রম নয় অথবা সব 'পণ্যই' পুঁজিবাদী পণ্য নয় আবার সব মজুরিশ্রমই 'পরশ্রম' এবং সব পুঁজিবাদী পণ্যই 'পণ্য'।

শ্রমের অবাধতা ও সবাধতার মাত্রা, মালিকের সাথে বাধ্যবাধকতা ও চুক্তির শর্ত ও মেয়াদের দৃষ্টিতে বাংলাদেশে কৃষিমজুর বিদ্যমান। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এদের বিভিন্ন নামে ডাকা হয়– দিনমজুর, জন, ছুটো, লোক, কামলা, কিষাণ, গতান, বারোমেসে, গতানো, লাগাড়ে, বছরকামলা, মাস মাহিনে, ভালোমানুষ, মুনিষ ইত্যাদি। এসব মজুরের সাথে মালিকের সম্পর্কের অন্যতম ভিত্তিসমূহ হলো পুরোনো ঋণ, খোরাকি ধার ও অ্যালটমেন্ট জমি ।

আসলে কৃষিমজুরেরা কতটা দরিদ্র, কতটা নিপীড়িত, তাদের জীবন কতটা ভয়াবহ– এগুলো আমাদের ক্ষোভ ও ক্রোধের উপলক্ষ হতে পারে, কিন্তু উৎপাদন ব্যবস্থার স্বরূপ চিহ্নিতকরণে তা অবান্তর। এ ব্যাপারে যেটা প্রকৃত প্রয়োজন তা হলো মজুরেরা কীভাবে মালিকদের ওপর নির্ভরশীল সেটা উদ্‌ঘাটন করা। মজুরের শ্রম কতটা অবাধ বা সবাধ; মজুর কতটা তার শ্রম বিক্রি করতে বা না করতে স্বাধীন; মজুরের শ্রম কী পরিমাণে প্রকৃত পণ্যে রূপান্তরিত হয়েছে– এসব প্রশ্নে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত অন্যথায় প্রকৃত অবস্থার অতিমূল্যায়ন বা অবমূল্যায়ন হওয়ার ভীতি থেকে যায়, যার রাজনৈতিক ফলশ্রুতি মারাত্মক– এটা প্রমাণিত সত্য। উল্লিখিত সাবধানতার দুটি মূল কারণ হলো এই যে, আমাদের দেশে একপক্ষের গবেষকদের মতে, ক্ষেতমজুরদের শ্রমশক্তি পণ্যে পরিণত হয়নি; কারণ অন্যান্য দরিদ্র চাষির মতো তারা মহাজনের ঋণের ফাঁদে আবৃত। কেউ কেউ বলছেন, যেহেতু শ্রমিক মালিকের সাথে দীর্ঘকালীন চুক্তিতে কাজ করছে, অতএব শ্রম সবাধ। অন্য একপক্ষ বলছেন, যেহেতু সারা দেশে পুঁজিবাদ কায়েম হয়েছে সুতরাং কৃষিমজুর নিঃসন্দেহে পুঁজিবাদের অন্যতম এজেন্ট অর্থাৎ তার শ্রম অবাধ। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দিক থেকে দেখলে বলা উচিত যে, (১) শুধু ঋণগ্রস্ততার কারণেই যে মজুরের শ্রমশক্তি পণ্যে পরিণত হয়নি সেটা ঠিক নয়, (২) কৃষিমজুর মালিকের সাথে দীর্ঘকালীন চুক্তিতে আবদ্ধতার কারণেই তার শ্রম সবাধ সেটাও ঠিক নয়। এক্ষেত্রে দেখা দরকার শর্তটা কী (?), দীর্ঘ চুক্তিবদ্ধতার কারণ কী? কারণগুলো হতে পারে মজুরের মালিক পরিবর্তনের স্বাধীনতা নেই; স্বাধীনতা আছে; কিন্তু সামাজিক অবস্থা সেই স্বাধীনতা ব্যবহার করতে দিচ্ছে না অথবা মজুর নিজের সুবিধার জন্যই স্বেচ্ছায় একই মালিকের সাথে দীর্ঘকাল কাজ করছে ইত্যাদি ।

ক্ষেতমজুরদের শ্রম কখন সবাধ? (অবাধ নয়)– এক্ষেত্রে বহুমাত্রিক শর্ত উপস্থাপন করা সম্ভব। এ মর্মে আমাদের দেশের বাস্তব পরিস্থিতিতে যেসব শর্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয় সেসব হলো: (১) মালিক ও মজুরের সম্পর্কের গণ্ডি ভৌগলিকভাবে সীমাবদ্ধ (প্রায়শ একই গ্রামের)। দুই পক্ষের রয়েছে অন্তরঙ্গ পরস্পরনির্ভরতা। মালিকদের চোখে গ্রামের মজুর হলো তাদেরই জন্য কাজের নিশ্চয়তা প্রদানকারী শর্ত। (২) মজুরের কাছে মালিক হলেন বাপ-মা, আপদে-বিপদে ভরসা, ধারদেনার উৎস। মজুরের কাছে মালিক এখনো অত্যাচারী শোষক নন। (৩) মালিকের জন্য মজুর এমন কিছু কাজও করে যার জন্য নির্ধারিত কোনো মজুরি নেই (এ অর্থে "বেগার খাটা")। (৪) মজুর যখন ইচ্ছে তখন মালিক পরিবর্তনে সক্ষম অথবা ইচ্ছুক নয়, আবার এক গ্রামের মালিক সচরাচর অন্য গ্রামের মজুরের শ্রমশক্তি ক্রয়ের ব্যাপারে নমনীয় নয়। উপরোল্লিখিত শ্রমশক্তি, সবাধতার শর্তে, গ্রামসমাজ হলো দ্বীপসদৃশ, একটি অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন।

ক্ষেতমজুরদের শ্রম কখন অবাধ? (সবাধ নয়), অর্থাৎ মজুরিশ্রম কখন পুঁজিবাদী উৎপাদনসম্পর্কের বাহক? এ প্রসঙ্গে মার্কসের "অর্থনৈতিক পাণ্ডুলিপি"-র বিশদ আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ। মার্কস প্রথমে লিখেছেন, "মজুরিশ্রম সেই শ্রম, যেখানে পুঁজি আছে এবং যে পুঁজি উৎপাদন করে" (Marx-Engels, Collected Works, Vol. 46, পৃ. ৪৫২)। পরবর্তী সময়ে মার্কস সেসব 'মূল শর্তাবলী' উল্লেখ করেছেন শুধু, যাদের সমষ্টিই জীবন্ত শ্রমে (Living Labour) বিক্রেতা এবং ক্রেতাদের সম্পর্কে এবং উৎপাদনে ব্যবহৃত পরশ্রমকে মজুরিশ্রম হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারে। 'মূল শর্তাবলী' হচ্ছে: (ক) "একদিকে অস্তিত্ব ও জীবনধারণের উপায়ের ওপর কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত জীবন্ত শ্রমশক্তি", (খ) "অন্যদিকে সেই পরিমাণ মূল্য, যা শুধু জীবন্ত শ্রমশক্তি পুনরুৎপাদন বা তার অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও মূল্য সৃষ্টির জন্যই যথেষ্ট নয়। সাথে সাথে উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তিকে হজম করতে সক্ষম", (গ) "উল্লিখিত দুটো দিকের মধ্যে থাকতে হবে স্বাধীন বিনিময়সম্পর্ক"। 'প্রভু-ভৃত্য' সম্পর্ক নয় বিনিময়মূল্যের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত এ সম্পর্ক সেই ধরনের উৎপাদনপ্রণালি নির্দিষ্ট করে, যা উৎপাদককে সরাসরিভাবে নয়, বিনিময়ের মাধ্যমেই জীবনোপায় সরবরাহ করে। উল্লিখিত উৎপাদনপ্রণালি সরাসরিভাবে পরশ্রমের ওপর কর্তৃত্ব করতে পারে না, বরং শ্রমিকের কাছে সেটা (শ্রমশক্তি) ক্রয় করতে বাধ্য হয়, বিনিময়ে আসতে বাধ্য হয়", এবং (খ) "সেই দিক, যা মূল্য রূপে শ্রমের বৈষয়িক শর্ত হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, তার শেষ লক্ষ্য সরাসরি পরিভোগ অথবা ভোগ্যমূল্য

সৃষ্টি নয়, বরং মূল্য সৃষ্টি, মূল্যের সম্প্রসারণ ও অর্থ সৃষ্টি" (দেখুন, Marx-Engels, Collected Works, Vol. 46, পৃ. ৪৫২-৪৫৩)।

সুতরাং, এটা সহজবোধ্য যে মজুরিশ্রমিক প্রত্যয়ে মার্কস সেসব শ্রম বিক্রেতাকে টেনে আনছেন, যাদের উৎপাদনের উপায়ের ওপর মালিকানা নেই, যারা উৎপাদনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শুধু ভোগ্যমূল্যই সৃষ্টি করছে না, সৃষ্টি করছে বিনিময়মূল্য; আবার বিনিময়মূল্যই সৃষ্টি করছে না সৃষ্টি করছে উদ্বৃত্ত মূল্য। আর শুধু উদ্বৃত্ত মূল্যই নয় সাথে সাথে সম্প্রসারিত পুনরুৎপাদনের ভিত্তি হিসেবে উদ্বৃত্ত মূল্যের সঞ্চয়ন ঘটিয়ে তাকে পুঁজিতে রূপান্তরিত করছে ("পুঁজি = সঞ্চিত উদ্বৃত্ত-মূল্য")। আর "পরশ্রমকে" "পুজিবাদী মজুরিশ্রম" হিসেবে গণ্য হতে হলে তার মূল অভীষ্ট হবে পুঁজি সৃষ্টি, অর্থাৎ গতিসূত্র হবে: মজুরিশ্রম → উৎপাদন → উদ্বৃত্ত মূল্য → পুঁজি। আর পরশ্রম যদি উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করে এবং সে উদ্বৃত্ত মূল্যের একাংশ যদি সঞ্চিত না হয়ে সম্পূর্ণটাই মালিকের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ভোগ-বিলাসে ব্যয়িত হয় (যা সামন্তবাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য) তাহলে "পরশ্রম" "পুঁজিবাদী মজুরিশ্রম" নয়; সেক্ষেত্রে পরশ্রম কেনা হচ্ছে শুধু ভোগ্যমূল্যরূপে (বিস্তারিত দেখুন, Marx-Engels, Collected Works, Vol. 46, পৃ. ৪৫৯)। যেখানে পরশ্রম মজুরিশ্রম, সেখানে উৎপাদনপ্রক্রিয়ায় মজুরিশ্রমের অংশগ্রহণ ঘটছে স্বাধীন পণ্য বিনিময়ের ভিত্তিতে (শ্রমক্ষমতা বিনিময় হচ্ছে শ্রমশক্তি পুনরুৎপাদনের উপায়ের সাথে) অর্থাৎ বিনিময় হচ্ছে প্রভু-ভৃত্য বন্ধনের বিপরীতে সাধারণ বাজারি কেনাবেচার শর্তাধীনে।

পরশ্রমের সাথে মজুরিশ্রমের পার্থক্য উদ্‌ঘাটনে মার্কস লিখেছেন, "সামাজিক শ্রমের (Social Labour) সাথে জীবন্ত শ্রম বিনিময়ের অর্থ এই নয় যে, একদিকে পুঁজি আর অন্যদিকে মজুরিশ্রম বিদ্যমান" (দেখুন, Marx-Engels, Collected Works, Vol. 46, পৃ. ৪৬, ৪৫৪)। মার্কসের মতে, উৎপাদনের লক্ষ্যই (ব্যক্তিগত ভোগ অথবা মূল্যবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মূল্য উৎপাদন) উৎপাদনে নিয়োজিত পরশ্রমের মর্মার্থ নির্ধারণের মানদণ্ড। বিনিময়ের ক্ষেত্রে যখন একদিকে পুঁজি আর অন্যদিকে মজুরিশ্রম অনুপস্থিত, সেক্ষেত্রে বিনিময় হলো "সাধারণ সঞ্চালনজনিত সম্পর্ক" (relations due to simple circulation)। এক্ষেত্রে বিনিময় হচ্ছে শুধু ভোগ্যমূল্য অর্থাৎ একদিকে জীবনোপায়, অন্যদিকে জীবনোপায়ের মালিকের ভোগের জন্য শ্রমসেবা। এ বিনিময় হতে পারে অর্থের মাধ্যমে অথবা দ্রব্যের মাধ্যমে।

প্রকৃত অর্থে মজুরিশ্রমের উপাদানসমূহ কীভাবে আবির্ভূত হচ্ছে সে সম্পর্কে মার্কস লিখেছেন, "প্রাক্-বুর্জোয়া সম্পর্কের অবক্ষয়ের যুগে সেসব স্বাধীন শ্রমিককে

বিক্ষিপ্তভাবে দেখা যায়, যাদের সেবা পরিভোগের উদ্দেশ্যে নয়, উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয়। মূল্য সৃষ্টির তুলনায় সরাসরি ভোগ্যমূল্য সৃষ্টিতেই এদের ব্যাপকতা লক্ষণীয়"। এর পরপরই পরে মার্কস লিখেছেন, "শুধু যেখানে এসব স্বাধীন শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান এবং এই সম্পর্ক বিস্তৃতি লাভ করছে, সেখানেই পুরোনো উৎপাদন পদ্ধতির অবক্ষয় ঘটছে এবং প্রকৃত অর্থে মজুরিশ্রমের উপাদানসমূহ আবির্ভূত হচ্ছে" (দেখুন, Marx-Engels, Collected Works, Vol. 46, পৃ. ৪৫৯)।

সুতরাং সে ধরনের পরশ্রম, যা উৎপাদনে নিয়োজিত এবং সরল পুনরুৎপাদনের সূত্রাধীনে ক্রিয়াশীল তা কখনোই পুঁজিবাদী মজুরিশ্রম নয়। এ ধরনের পরশ্রমের বাহকেরা একধরনের প্রাক্-প্রলেতারিয়েত। এদের বিস্তৃতিমাত্রার সাথে পুঁজিবাদী উৎপাদনসম্পর্ক ও আপেক্ষিক জনসংখ্যাধিক্যের বিকাশমাত্রার সম্পর্ক হলো যথাক্রমে ব্যস্তানুপাতিক ও সমানুপাতিক। যে পরশ্রম উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করে না, এমনকি ন্যূনতম জীবনোপায় উৎপাদনে অক্ষম তার বাহক-শ্রমিক নিঃসন্দেহে নিঃস্ব (pauper), তবে চিরায়ত অর্থে সর্বহারা (proletariat) নয়। এ প্রক্রিয়াকে লেনিন "কৃষকদের সবচেয়ে নিকৃষ্ট ধরনের অবক্ষয়" হিসেবে অভিহিত করছেন (দেখুন, Lenin, Collected Works, Vol. 46; Rodney 1978)।

একদিকে যেমন পুঁজিবাদী মজুরিশ্রমিককে অবশ্যই উদ্বৃত্ত খামারেই (Surplus farm) শ্রমশক্তি বিক্রি করতে হবে, অন্যদিকে উদ্বৃত্ত খামারে শ্রমশক্তি বিক্রেতারা যে সবসময়ই পুঁজিবাদী মজুরিশ্রমিক হবে এমন কোনো ঢালাও নিয়ম নেই। এক্ষেত্রে মার্কসের তৃতীয় শর্ত উল্লেখ্য, "দুটো দিকের মধ্যে থাকতে হবে স্বাধীন বিনিময়সম্পর্ক, যে সম্পর্কের ভিত্তি প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক বা বন্ধন নয়, ভিত্তি হলো বিনিময়মূল্য"। সুতরাং প্রভু-ভৃত্য বন্ধনে পরশ্রম যদি উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করে সে ক্ষেত্রেও পরশ্রম মজুরিশ্রম নয়। ঠিক একইভাবে উল্লেখিত উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎকারী মালিক পুঁজিপতি নয়। আবার শোষিত যদি উৎপাদনের উপায়হীন হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে শোষক অবস্থান করছে পুঁজির প্রাথমিক সঞ্চয়নের যুগের বুর্জোয়াদের একটি সুনির্দিষ্ট কাতারে।

বাংলাদেশের বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, শ্রমশক্তির ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক এখনো ব্যাপক পরিসরে বিদ্যমান ও অত্যন্ত ধীর গতিতে ক্ষয়মান এবং শ্রমশক্তির বিক্রেতারা ক্রমান্বয়ে ভূমিহীন হচ্ছেন। বাংলাদেশের ব্যাপক কৃষি জনসংখ্যাধিক্যের সাথে ক্রমবর্ধমান

বেকারত্ব, আধা বেকারত্ব ও ছদ্ম বেকারত্ব একত্রীভূত হয়ে একদিকে যেমন পরশ্রম ব্যবহারে প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক বজায় থাকছে, অন্যদিকে তেমনি কৃষি শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান নিম্নাভিমুখী (আর তাই কৃষিমজুরিসহ কৃষকদের জীবনোপায়ের লড়াইটা উত্তরোত্তর অধিকতর জনপ্রিয়তা অর্জন করছে)। প্রক্রিয়াটি পুঁজিবাদী পথে কৃষি বিকাশের অন্যতম প্রতিবন্ধক হিসেবে ক্রিয়াশীল।

সুতরাং, যদি আমরা উল্লিখিত পদ্ধতির সাহায্যে বাংলাদেশের কৃষির শ্রমবিক্রেতাদের সারচিত্র উদ্‌ঘাটনে সচেষ্ট হই, তাহলে প্রথমেই যা বলা সম্ভব তা হলো স্বাধীন বিনিময় অথবা প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কের আওতাধীন যে বিশাল কৃষি-মজুর শ্রমশক্তি বিক্রি করছে তারা একক শ্রেণিভুক্ত নয়, বরং বিভিন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক স্তরের এক জগাখিঁচুড়িরূপ (Conglomerate of different socio-economic stratum)। আর এই মিশ্রিত রূপের নির্দিষ্ট স্তরের অর্থনৈতিক চেহারা নির্ধারিত হবে ঐ স্তর যে উৎপাদনসম্পর্কের প্রভাবাধীনে বিকাশমান তার দ্বারা। উৎপাদনসম্পর্কের বিবর্তনমূলক পরিবর্তনের কারণে মিশ্রিত রূপের বিভিন্ন শ্রেণি ও সামাজিক গোষ্ঠীর সীমারেখা অপরিবর্তনীয় নয়, বরং পরিবর্তনশীল। এ ছাড়া শ্রমশক্তি বিক্রেতাদের একাংশকে আন্তঃগঠনিক প্রত্যয় (Inter-structural category) হিসেবেও দেখা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিয়োজিত কৃষিমজুরদের নির্দিষ্ট উৎপাদনসম্পর্কের আওতাধীনে দেখা সম্ভব। কিন্তু এটা তুলনামূলক কঠিন যখন মজুর ভ্রাম্যমাণ থাকে। ভ্রাম্যমাণ কৃষি মজুরদল কখনো আত্মপোষণশীল খামারে (subsistence farm) কর্মরত, কখনো আবার উদ্বৃত্ত খামারে (surplus farm) কর্মরত। যারাই স্বাধীন বাজারি বিনিময়ের শর্তে শ্রমশক্তি বিক্রেতা, তারাই আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কের আওতায় শ্রমসেবা বিক্রেতা ইত্যাদি ।

"বাংলাদেশের ক্ষেতমজুর" সামগ্রিকভাবে বিভিন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক স্তরের জগাখিঁচুড়ি রূপ– এ বক্তব্যের অর্থ তা নয় যে ক্ষেতমজুরদের মধ্যে "পুঁজিবাদী মজুরিশ্রমিক" অনুপস্থিত। আমাদের পুঁজিবাদী ক্ষেতমজুর আত্মবিস্মৃত বা আত্মকেন্দ্রিক (class in itself) শ্রেণি, শ্রেণিসচেতন ও শ্রেণিসংহতিসম্পন্ন সর্বহারা (class for itself) নয়, যারা এ মুহূর্তে সমাজ পরিবর্তনকারী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। ক্ষেতমজুরদের আত্মকেন্দ্রিক থেকে আত্মসচেতন শ্রেণিতে রূপান্তর– এটা একটি প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার বর্তমান স্তরে ক্ষেতমজুরেরা যে ধরনের শ্রেণিসংগ্রামে সবচেয়ে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারে তা হলো– অর্থনৈতিক আন্দোলন, যার মধ্যে প্রধান হলো মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন, শ্রমদানের শর্ত শিথিলের আন্দোলন। যেটা তরান্বিত

করাটাই সত্যিকার বিপ্লবী সংগঠনের বর্তমান অবস্থায় গ্রামাঞ্চলের জন্য অন্যতম প্রধান কাজ হওয়া উচিত। আমাদের পুঁজিবাদী ক্ষেতমজুর যেহেতু এখনো আত্মসচেতন শ্রেণি হিসেবে গড়ে ওঠেনি তাই উচ্চতর পর্যায়ের সংগ্রাম অর্থাৎ রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের সংগ্রামের প্রাথমিক পর্যায় হিসেবে ভূমি দখলের সংগ্রাম এখনো ব্যাপক রূপ নিতে পারছে না। পুঁজিবাদী মজুর হিসেবে রূপান্তরের এই অসম্পূর্ণতার কারণেই সম্ভবত কোনো বৃহৎ ও ব্যাপক শ্রেণিসংগ্রামে ক্ষেতমজুরদের সমবেত করা অপেক্ষাকৃত জটিল ও কঠিন কাজ।

বাংলাদেশের ক্ষেতমজুরদের রাজনৈতিক ভূমিকা বিশ্লেষণে মনে রাখা উচিত যে, বিভিন্ন মাত্রায় ক্ষেতমজুরদের শ্রম শোষণ করে বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্রায়তনের চাষিরা সবাই। সুতরাং তাদের সাথে ক্ষেতমজুরদের সম্পর্কটা দ্বন্দ্বমূলক (বিরোধাত্মক)। অবশ্যই বিরোধের মাত্রাটা বিভিন্ন আয়তনের চাষিদের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন। বিরোধের মাত্রা যা-ই হোক না কেন, এটা সত্য যে ক্ষেতমজুরদের মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলনকারী পার্টি মধ্য ও ধনী চাষিদের এবং ক্ষেত্রবিশেষে ক্ষুদ্র চাষিদের সমর্থন হারাচ্ছে ও হারাবে। সম্ভবত এ কারণেই পাকিস্তান আমলের স্বৈরতন্ত্রবিরোধী আন্দোলনে, মুক্তিসংগ্রামে এবং তৎপরবর্তী বুর্জোয়া রাষ্ট্র ব্যবস্থাধীনে প্রধান রাজনৈতিক সংগঠনসমূহ এ যাবৎ কৃষি আন্দোলনের কর্মসূচিতে যেসব বিষয়বস্তুর প্রাধান্য দিয়ে এসেছে তা প্রায়শ হয়েছে বর্গাদারদের স্বার্থে (ছোট ও মাঝারি চাষিদের স্বার্থ রক্ষার্থে), অথবা কৃষিজাত পণ্যের মূল্য বাড়ানোর জন্য, সেচসহ কৃষির উৎপাদন উপকরণ প্রভৃতির থেকে কর তুলে নেওয়ার জন্য এবং কৃষিতে ব্যবহার্য কাঁচামালের দাম কমানোর জন্য, ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিকদের খাজনা মওকুফের জন্য (যেখানে ৫০% কৃষক ভূমিহীন ও প্রায় ভূমিহীন সেখানে দাবিগুলোর অধিকাংশই ধনী কৃষকদের স্বার্থসাধক)। উল্লিখিত সময়কালে মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলনের শক্তি সঠিকভাবে মূল্যায়িত হয়নি বললেই চলে, অথচ ক্ষেতমজুরদের আত্মকেন্দ্রিক থেকে আত্মসচেতন শ্রেণি হিসেবে রূপান্তর প্রক্রিয়ায় সত্যিকার মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন সমগ্র শ্রেণিসংগ্রামকে একটা উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে যেতে সক্ষম; আর তাই অপরিহার্য (ইদানীংকালের শিল্পশ্রমিকদের মজুরি আন্দোলনে ৮০০ কোটি টাকা আদায় নিশ্চয়ই বিশেষ ইঙ্গিতবহ)।

সব শেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বাংলাদেশের ক্ষেতমজুরদের নিয়ে শেষ কথা বলার সময় এখনো হয়নি। ক্ষেতমজুরসম্পর্কিত বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার প্রকৃতি নির্ধারণ, তাদের শ্রেণিচরিত্র সম্পর্কে আরও বিজ্ঞানসম্মত ও আরও নিখুঁত উপসংহারে

পৌঁছানোর জন্য আলোচিত পদ্ধতিতত্ত্বের সাহায্যে নিদেনপক্ষে যেসব তথ্যাবলী (যেগুলো এখনো অনুপস্থিত) বিশ্লেষণ প্রয়োজন সেসব হলো: (১) বিভিন্ন শ্রেণির ক্ষেতমজুর পরিবারের আপেক্ষিক গুরুত্ব (২) বিভিন্ন শ্রেণির ক্ষেতমজুর পরিবারের নিজ নিজ জীবিকার প্রতি আস্থা (৩) মালিকের সাথে সম্পর্কের ভিত্তির তুলনামুলক বিচার (৪) নগদ, আহার, ধান (চাল) ইত্যাদির ভিত্তিতে মজুরির আপেক্ষিক গুরুত্ব (৫) ঠিকা ও ভাগপ্রথায় মজুরি দেওয়ার গুরুত্ব (৬) বিভিন্ন শ্রেণির ক্ষেমজুরদের মধ্যে শ্রমের প্রতিশ্রুতিতে ঋণ নেওয়ার গুরুত্ব (৭) বিভিন্ন গ্রামে শ্রমের প্রতিশ্রুতিতে ঋণ নেওয়ার গুরুত্ব (৮) মালিকের কাছ থেকে ক্ষেতমজুরের খোরাকি ধার প্রাপ্তির গুরুত্ব (৯) একই মালিকের সাথে মজুরের দীর্ঘকালীন সম্পর্ক (১০) খামার আয়তনের ভিত্তিতে ক্ষেতমজুর নিয়োগের পরিমাণগত পার্থক্য (১১) ক্ষেতমজুরদের বিভিন্ন মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলনে অংশগ্রহণ।

পণ্যোৎপাদন

পণ্যোৎপাদনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পুঁজিবাদের বিকাশকে ভ. ই. লেনিন পরস্পরসম্পর্কযুক্ত দুটি ঐতিহাসিক পর্বে বিভক্ত করেছেন: (ক) সরাসরি উৎপাদকের আত্মপোষণশীল খামারের পণ্যোৎপাদনভিত্তিক খামারে রূপান্তর, (খ) পণ্য খামারের পুঁজিবাদী খামারে রূপান্তর (দেখুন লেনিন, "তথাকথিত বাজার প্রসঙ্গে", Collected Works, Vol. 1, পৃ. ৮৭)। অর্থাৎ পণ্যোৎপাদনের দৃষ্টিতে কৃষি খামার বিকাশের ইতিহাস হলো : আত্মপোষণশীল খামার থেকে খুদে পণ্য উৎপাদক পুঁজিবাদী খামারে রূপান্তর। প্রথম রূপান্তরটির সাথে সম্পর্কিত সামাজিক শ্রমবিভাগের বিকাশ। যেমন গ্রাম থেকে শহর পৃথক্করণ, হস্তশিল্প ও বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে শহরের বিকাশ, কৃষিকে পণ্য-অর্থ সম্পর্কাধীনে আনয়ন, দ্রব্যখাজনার মুদ্রাখাজনায় রূপান্তর। দ্বিতীয় রূপান্তরের মূল ভিত্তি হচ্ছে শ্রমশক্তির পণ্য হিসেবে উদ্ভব। এর ফলে কৃষক ভূস্বামীর ওপর ব্যক্তিগত ও ভূমি নির্ভরতাজনিত সম্পর্ক থেকে মুক্ত, হস্তশিল্পীরা গিল্ডের জোরজবরদস্তি থেকে মুক্ত, শ্রমের ওপর পুঁজির প্রকৃত আধিপত্য প্রতিষ্ঠা। এদিক থেকে পুঁজিবাদ হলো উৎপাদনের উপায়সমূহের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত, সম্প্রসারিত পুনরুৎপাদনভিত্তিক সার্বজনীন পণ্যোৎপাদনের যুগ।

এশিয়ার কৃষিতে পুঁজিবাদী পণ্যোৎপাদনের জন্মভিত্তি হিসেবে খুদে পণ্য উৎপাদনের অপেক্ষাকৃত স্বাধীন ভূমিকা গবেষকের দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। এ প্রসঙ্গে পদ্ধতিগত দিক থেকে সোভিয়েত প্রাচ্য কৃষিবিশারদ রাস্তিয়ান্নিকভের ধারণা যুক্তিযুক্ত। ক্ষুদ্রায়তনের উৎপাদন ক্রমবিকশিত হয়ে একটি স্বতন্ত্র গঠনে পরিণত

হওয়ার ব্যাপারের সঙ্গে বহু রকমের প্রক্রিয়া জড়িত থাকে। এসব প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে– পরে ঔপনিবেশিকদের দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ পরস্পরাগত সমাজে যা ব্যাপকভাবে প্রচলিত সেসব অর্থনীতি-বহির্ভূত ধরনের নিগ্রহক্রমে মিলিয়ে যাওয়া[৬১]; তা ছাড়া ক্ষুদ্রায়তনের ব্যক্তিগত ভূমি মালিকানা স্থাপনে সহায়ক বিভিন্ন প্রক্রিয়া। এই ভূমি মালিকানা হলো এশীয় গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্রপণ্য গঠনের অর্থনৈতিক ভিত্তি। আরও আছে, শ্রমের বারোয়ারী সংগঠনের আমলে যা প্রধান ছিল পুনরুৎপাদনের সেই স্বাভাবিক ধরনের ভিত্তি ভেঙ্গে পড়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং পণ্য বিনিময়ভিত্তিক পুনরুৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে ওঠার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রক্রিয়া। এই সমস্ত প্রক্রিয়া বিচার-বিশ্লেষণ করলে তবেই একমাত্র একটা স্বতন্ত্র বর্গ হিসেবে ক্ষুদ্র পণ্য গঠন গড়ে ওঠার ধারাবাহিক পর্বগুলোকে চিহ্নিত করা যায়" (দেখুন Jahangir 1979, পৃ. ১০০-১০১)। আমাদের দেশের খুদে পণ্য উৎপাদনের বিকাশ বিশ্লেষণে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, খুদে পণ্য উৎপাদনই সেসব প্রাক্-পুঁজিবাদী উৎপাদনসম্পর্কের বাহক, যাকে ধ্বংস করে নয় বরং জিইয়ে রেখেই পুঁজিবাদ বিকাশমান। অর্থাৎ সামগ্রিক পরিবেশটা লেনিনের নিম্নলিখিত বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ– "পুরোনো, আধাসামন্ততান্ত্রিক, আত্মপোষণশীল অর্থনীতি ক্ষয়ে গিয়েছিল, আর নতুনের, বুর্জোয়া অর্থনীতির পরিবেশ তখনো সৃষ্টি হয়নি" (দেখুন, লেনিন, Collected Works, Vol. 19, পৃ. ৪৮৮; Levkovsky, 1978)।

আমাদের কৃষিতে পণ্যোৎপাদনের পরিধি এবং তার গুণগত বৈশিষ্ট্য উদ্‌ঘাটনে পদ্ধতিগত দিক থেকে যেসব প্রশ্নের প্রাধান্য পাওয়া উচিত, অথচ এখনো পাচ্ছে না সেগুলো হলো:

১. কৃষিতে স্বাভাবিক সম্পর্ক ও পণ্যসম্পর্ক;
২. শ্রমের উৎপাদনশীলতা;
৩. বাজার ও কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন কর ব্যবহার;
৪. বাজার ও কৃষিক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পরিভোগ;

---

[৬১] এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, মার্কস বলেছিলেন, "যে সমাজে অর্থনীতিবহির্ভূত ধরনের নিগ্রহ প্রাধান্যশীল সেখানে উৎপাদনের পণ্যে পরিণত হওয়া এবং সেই সাথে, মানুষের পণ্য উৎপাদকে পরিণত হওয়াটা থাকে গৌণ স্থানে"(দেখুন Marx and Engels, Collected Works, Vol-46, পৃ. ৮৩)।

৫. সমগ্র পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ায় পণ্যসম্পর্কের ভূমিকা (প্রকৃত পণ্যের সাথে নমিনাল পণ্যের পার্থক্য); এবং

৬. ক্ষুদ্রায়তন পণ্য থেকে বাণিজ্যিক ও শিল্পপুঁজির শ্রমবিকাশের পরিবেশ।

"কৃষিতে স্বাভাবিক সম্পর্ক ও পণ্য সম্পর্কের বিকাশমাত্রা"– বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য যে, বাজারবিষয়ক মৌলিক তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করতে হলে গবেষককে অবশ্যই সরল পণ্য অর্থনীতি থেকে শুরু করে তার পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে ক্রমরূপান্তর লক্ষ করতে হবে। অন্যথায় সমগ্র বাজারি পণ্যকে পুঁজিবাদী পণ্য হিসেবে আখ্যায়িত করে প্রকৃত পুঁজিবাদের পরিধিকে অতিমূল্যায়িত করা হতে পারে। যেহেতু পণ্য অর্থনীতি ও পুঁজিবাদ উভয়ের বিকাশেরই ভিত্তি হলো সামাজিক শ্রমবিভাগ, আর তাই পণ্যোৎপাদনের কতটুকু পুঁজিবাদী পণ্যোৎপাদন, সেটা জানার জন্য বিশ্লেষিত হতে হবে সামাজিক শ্রমবিভাগের পরিপক্বতার মাত্রা। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা দরকার, "পণ্য উৎপাদন সামাজিক শ্রমবিভাগের আবশ্যিক শর্ত"– এ সিদ্ধান্ত সঠিক নয়, তার বিপরীতটাই সঠিক।

পণ্যোৎপাদনের বিকাশমাত্রার সাথে সামাজিক শ্রমবিভাগের বিকাশমাত্রার সম্পর্কের ব্যাপারে ব্রিটেন (চিরায়ত পথে বিকাশমান পুঁজিবাদ) ও বাংলাদেশের (অচিরায়ত পথে বিকাশমান পুঁজিবাদ) মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। কারণ, ব্রিটেনে বিক্রয়যোগ্য কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের মাত্রা মোটামুটি সামাজিক শ্রমবিভাগের মাত্রার অনুরূপ (কৃষি ও শিল্পের অসমতুল বিনিময়ে সেটা কখনো বা বিকৃত হয়েছে)। আর বাংলাদেশের কৃষিতে বিনিময়ে মূল্যবস্তুর উৎপাদন প্রকৃত শ্রমবিভাগের পরিধির চেয়ে অনেক বেশি। কেন এই অসামঞ্জস্য? যখন থেকে ঔপনিবেশিক শক্তি এ দেশের কৃষিকে বলপূর্বক পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার আওতায় এনেছে, তখন থেকেই এই অসামঞ্জস্যের উৎপত্তি। কৃষি উৎপাদকের ওপর প্রাক্-পুঁজিবাদী ধরনের মালিকানা প্রভাব, উপরন্তু আপেক্ষিক কৃষি জনসংখ্যাধিক্য ইতিপূর্বে সৃষ্ট অসামঞ্জস্যতা এখনো বজায় রয়েছে। সুতরাং, বাংলাদেশের কৃষিতে স্বাভাবিক ও বাজারিসূচক দিয়ে উৎপাদের বিশ্লেষণ করা মৌলিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। আর সেটা উৎপাদনপ্রক্রিয়া থেকে উৎপাদের বের হওয়ার পূর্বেই শুধু নয়, যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হলো কৃষি পুনরুৎপাদনে সেটার প্রবেশ ও তার ব্যবহারের পর্বেও।

বাংলাদেশের কৃষিতে উৎপাদনশীলতা অত্যন্ত নিম্নমানের। শ্রমের উৎপাদিকা শক্তির মাত্রার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আজকের বাংলাদেশ কৃষি ও সামন্ততন্ত্রের বিলুপ্তি পর্বের সাথে

ফ্রান্সের কৃষির মধ্যে বিশেষ ব্যবধান নেই। বাংলাদেশের চিরাচরিত প্রযুক্তিভিত্তিক কৃষিতে ক্ষুদ্রায়তন ও বৃহদায়তন খামারগুলোতে শ্রমের গড় উৎপাদনশীলতায় খুব একটা ফারাকও নেই। আবার বিরাজমান কারিগরি-প্রযুক্তিগত কাঠামোতে ক্ষুদ্র আকারের ইউনিটপিছু উৎপাদন অপেক্ষাকৃত বৃহৎ আকারের চেয়ে অধিক। অর্থাৎ পণ্যোৎপাদনের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের পূর্বে আমরা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে যা পাচ্ছি তা হলো নিম্নরূপ:

১. কৃষিতে সামাজিক শ্রমবিভাগের বিকাশমাত্রা যা দিয়ে নির্ধারিত হবে সেটা এ শাখায় বিমূর্ত ও প্রত্যক্ষ শ্রমের (abstract and concrete labour) মধ্যে প্রত্যক্ষ শ্রমই প্রাধান্য বজায়কারী।

২. কৃষিক্ষেত্রে যে পুঁজি গড়ে উঠছে এবং উৎপাদন ক্ষেত্রে বিনিয়োজিত হচ্ছে সেটা কৃষির প্রযুক্তিগত ভিত্তি উন্নততর করার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে না।

৩. পুঁজির অপর্যাপ্ততার ফলেই বেশির ভাগ কৃষক খামার প্রযুক্তিগত ভিত্তি বদলাতে পারছে না। আর প্রধানত এ কারণেই ঐসব খামারে কৃষক-কারিগর বিনিময়সম্পর্ক (যার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে পণ্যসম্পর্ক) ভেঙ্গে পড়তে দেরি হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে হিসাব করে দেখা যেতে পারে যে, কৃষি উপকরণ কাঠামোতে বিভিন্ন উপাদানের আপেক্ষিক ভর, সরঞ্জাম উৎপাদন ও তার মেরামতে পণ্যসম্পর্কের বিপরীতে সাধারণ বিনিময়সম্পর্কের প্রাধান্য; পশুশুমারির হিসাব থেকে কর্ষণপ্রক্রিয়ায় সদ্য আগত পশুর আগমন উৎস পণ্যসম্পর্কের মাধ্যমে অথবা উৎপাদক খামারে পালিত, বীজ ও সার পুনরুৎপাদনের ধাঁচ– আন্তঃখামার স্বাভাবিক সম্পর্কের আওতাধীনে।

প্রাক্-পুঁজিবাদী উৎপাদনসম্পর্কের পরিমাণগত প্রাধান্য ও শ্রমের সামাজিক উৎপাদিকা শক্তির নিম্নমানের শর্তে গ্রামাঞ্চলে ব্যক্তিগত পরিভোগ কাঠামোর ভিত্তি হলো খাদ্য, কাপড়চোপড় ও জ্বালানি। বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায়, সরাসরি উৎপাদক ও ক্ষেতমজুর কৃষিনির্ভর জনসংখ্যার এই দুটো বৃহৎ বর্গেই প্রধান খাদ্য ও জ্বালানি ছাড়া অন্য সব বৈষয়িক উৎপাদের পুনরুৎপাদনে পণ্য-অর্থ সম্পর্কের প্রাধান্য বিদ্যমান। তবে ঐসব বৈষয়িক উৎপাদের বাজার মোট পরিমাণের হিসেবে অত্যন্ত সীমিত, আর জীবনধারণের উপকরণসমূহের আন্তঃগ্রামীণ বাজারে সেটার অংশ নগণ্য। এই বাজারের নিষ্পত্তিকর উপাদান হলো খাদ্যের বাজার।

কৃষিবাজার বিকাশের বিপক্ষে যেসব শক্তিশালী উপাদান ক্রিয়াশীল সেগুলো বহুমুখী। কৃষকদের একটা বৃহদাংশ তাদের পরিবারের জন্য খাদ্য উৎপাদন করাকেই নিজেদের খামারের অর্থনৈতিক লক্ষ্য হিসেবে বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে। এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ খামারিরাও এ লক্ষ্যে কৃষিকাজ করছে। যে উৎপাদনসমূহ পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়া সম্প্রসারণে এবং অভ্যন্তরীণ বাজার বিকাশে বাধা সৃষ্টি করছে সেগুলো হলো:

১. গ্রামাঞ্চলের আপেক্ষিক জনবহুলতা;

২. কৃষক পরিচালিত জমির গড় আকার হ্রাস;

৩. কৃষিজাত দ্রব্যের বাজারদরের ওঠানামা (যা অধিকাংশের অনুকূলে নয়);

৪. কৃষিজাত ও শিল্পজাত পণ্যের বাজারদরে অসামঞ্জস্যতা;

৫. উন্নত পুজিবাদী দেশের একই সাথে ক্রেতা ও বিক্রেতা হিসেবে আমাদের বাজারদর নিয়ন্ত্রণের একচ্ছত্র ক্ষমতা; এবং

৬. কৃষিতে চিরাচরিত ধাঁচের পরিভোগ (আত্মপ্রচার সর্বস্ব কর্মকাণ্ডে গ্রামীণ খরচ– ধর্মীয় অনুষ্ঠান, বিবাহ, মামলা-মোকদ্দমা ইত্যাদি)।

নির্দিষ্ট উৎপাদক কোন উৎপাদনসম্পর্কের ধারক, সেটা প্রধানত নির্ভর করবে তার উৎপাদন উদ্দেশ্যের ওপর। উল্লেখ্য, গবেষণায় উৎপাদনের উদ্দেশ্যকে বিকৃত করে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টিও সম্ভব। এটাই হয়ে থাকে পণ্যোৎপাদনের পরিধি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে বাজারজাত পণ্যে খুদে পণ্যোৎপাদকদের অবদান বিশ্লেষণে। বাংলাদেশে খুদে পণ্যোৎপাদকসহ খুদে উৎপাদকদের অনেকের জন্য "পরিবার বাঁচিয়ে রাখা" একমাত্র মোট উৎপাদনের এক বৃহদাংশকে বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত করেই সম্ভব। অর্থাৎ খামারের পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়াকে নিয়মিত ভিত্তিতে পুনরুদ্ধার করার জন্য খুদে উৎপাদককে তার উৎপাদনের একাংশ বাজারে বিক্রি করে আবশ্যক উৎপাদন কর আর পরিভোগের জিনিস কিনতে হয়– নইলে তাকে আয়ের ভিন্ন পথ অবলম্বন করতে হয়। যেমন নিজের ক্ষেতখামারে কাজে মন্দার সময় অন্যান্য উৎপাদকের কাছে শ্রমশক্তি বিক্রি করতে হয়। কিন্তু খুদে খামারির যে সামাজিক পরিবেশ তাতে সে অর্থনৈতিক প্রয়োজনে যা আবশ্যক তার চেয়ে ঢের বেশি বিক্রি করতে বাধ্য হয়। এই বাড়তি বিক্রি অথবা দায়গ্রস্ত উদ্বৃত্ত (distress surplus) থেকে পাওয়া অর্থ দিয়ে তাকে বিভিন্ন ধরনের দায়দায়িত্ব মেটাতে হয়– পুনরুৎপাদনের স্বাভাবিক ধারার সঙ্গে এগুলোর সম্পর্ক নেই (অত্যাধিক নগদ খাজনা ও মহাজনী সুদ, বিভিন্ন কর, বিভিন্ন চিরাচরিত সামাজিকতা-উদ্ভূত ব্যক্তিগত ও

পরিবারিক ভোগ, বাণিজ্যিক পুঁজির কাছে দেনা ইত্যাদি)। আর তাই খুদে খামারির জীবনধারণ তহবিলের পরিবর্তনশীল মূল্য নির্ধারিত হয় খামারের পুনরুৎপাদনের আবশ্যকতা দিয়ে নয়, তা নির্ধারিত হয় বরং এর বহির্ভূত পরিস্থিতি ও প্রয়োজনানুসারে। এমতাবস্থায় বাজারি বন্দোবস্তটা হলো মূলত কৃষি উৎপাদকদের সৃষ্ট জাতীয় আয়ের একাংশকে তাদের শোষক সামাজিক শ্রেণিসমূহের আত্মসাৎ করার একটা মাধ্যম এবং সরাসরি উৎপাদকদের চিরাচরিত সামাজিক দায়দায়িত্ব পালনের জন্য আবশ্যক একটা মাধ্যম। সুতরাং পুঁজিবাদের প্রকৃত পরিধি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বাজারি পণ্য থেকে "দায়গ্রস্ত উদ্বৃত্ত" বিযুক্ত হওয়াটাই বিজ্ঞানসম্মত। এ পদ্ধতি অবলম্বনে হিসাব করে দেখা যায় যে:

ক. ১৯৬০-এর দশকের শেষের দিকে বাংলাদেশের কৃষিতে পুঁজিবাদের ভিত্তি ছিল ২০-২৫ শতাংশ কৃষিপণ্যের ওপর আর অন্য ৭৫-৮০ শতাংশ পণ্য প্রকৃত পণ্য নয় তা নমিনাল পণ্য; যেগুলো পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে এবং মজুরিশ্রম গঠনপ্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে; এবং

খ. সামাজিক শ্রমবিভাগ ও পণ্যোৎপাদন বিকাশের দৃষ্টিতে ১৯৬০-এর দশকের বাংলাদেশ কৃষি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকের মধ্যে রাশিয়ার অনগ্রসর কালোমাটি অঞ্চলেরও (চের্নোজেম) নিম্নে অবস্থান করছিল (দেখুন, Barkat 1981, পৃ. ১১৯)।

সুতরাং, বাংলাদেশের কৃষিতে পণ্যোৎপাদনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যে বাস্তব চিত্র ফুটে ওঠে সেগুলো নিম্নরূপ:

১. বিনিময়মূল্য উৎপাদন প্রাক্-পুঁজিবাদী মালিকানামুক্ত নয়।

২. বিনিময় মূল্য উৎপাদন ও পণ্যোৎপাদনের বিকাশমাত্রা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় অর্থাৎ সমগ্র বাজারি পণ্যেই পুঁজিবাদী– এটা ঠিক নয়।

৩. পণ্য উৎপাদন ও পণ্য বিনিময়ের যা প্রকৃত মাত্রা সেটা উৎপাদনক্ষেত্র থেকে শুষে নেওয়া এবং কোনোভাবে পুষিয়ে না দেওয়া নজরানার মাত্রার সঙ্গে ব্যাস্তানুপাতি। শ্রমের উৎপাদনশীলতা যেখানে নিম্নমানের সে অবস্থায় নজরানা হিসেবে কৃষিক্ষেত্র থেকে বিপুল পরিমাণ উৎপাদন আদায় করে নেওয়ার ফলে আমাদের কৃষি অর্থনীতিতে সামাজিক শ্রমবিভাগের ক্রমবিকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এবং পণ্যোৎপাদনের প্রসার ব্যাহত হচ্ছে।

৪. কৃষিজাত দ্রব্যকে বাণিজ্যিক পণ্যে রূপান্তরিত করার মাধ্যমে কৃষির বহুমুখী সামাজিক অর্থনৈতিক চিত্র দেখা যাচ্ছে। একদিকে আছে উৎপাদকদের প্রকৃত পণ্যবিনিময়, অন্যদিকে উৎপাদনক্ষেত্র থেকে একমুখো তুল্য বিনিময় ছাড়া উৎপাদন নির্গমন এবং পণ্যে রূপান্তর এবং মাঝামাঝি আছে বিভিন্ন মধ্যবর্তী ধরনের উৎপাদক।

উপসংহার

বর্তমান প্রবন্ধে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আলোচিত বিষয়বস্তু-উদ্ভূত উপসংহারসমূহের সাথে আরও যেসব উপসংহারে উপনীত হওয়া সম্ভব এবং প্রয়োজন সেগুলো হলো যথাক্রমে:

ক. বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতিসংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট মৌলিক প্রশ্নাবলী ও তাদের আন্তঃসম্পর্কের (যেগুলো "বিকল্পচিন্তার ভিত্তি ও উপাদানসমূহ" পর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, 'ক' থকে 'ঢ' পর্যন্ত প্রশ্নসমূহ) ইচ্ছানিরপেক্ষ, বস্তুনিষ্ঠ (objective) শ্রেণি বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে সঠিক উৎপাদন পদ্ধতি উদ্‌ঘাটন সম্ভব নয়। অন্যথায় যা হয়েছে সেই রকম ইচ্ছানির্ভর সহজ সূত্রবদ্ধকরণের (simple subjective formulation, যেমন: আধাসামন্ত, আধা-পুঁজিবাদ, পুঁজিবাদ, আধাসামন্ত আধা-উপনিবেশ, খুদে কৃষক উৎপাদন পদ্ধতি) বিপরীতে গভীরতর গুণসম্পন্ন সূত্র উদ্‌ঘাটন হবে না।

খ. উৎপাদন পদ্ধতির উপরোক্ত বিশ্লেষণে মার্কসীয় পদ্ধতিতত্ত্বের (methodology অর্থে) প্রয়োগ হতে হবে সৃজনশীল, বিজ্ঞানসম্মত। সেক্ষেত্রে শুধু চিরায়ত পথে বিকাশমান সামাজিক-অর্থনৈতিক দেহের (socio-economic organism) সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের জন্য মার্কসের 'পুঁজি', 'রাজনৈতিক-অর্থনীতির সমালোচনা প্রসঙ্গে', 'অর্থনৈতিক ও দার্শনিক পাণ্ডুলিপি', এঙ্গেলসের 'অ্যান্টিডুরিং', মার্কস-এঙ্গেলসের 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' এবং লেনিনের 'রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ', 'তথাকথিত বাজার প্রশ্নে' ইত্যাদি পুস্তকে বর্ণিত পদ্ধতিসমূহের সাথে দ্বান্দ্বিক সংযোজন হতে হবে "অর্থনৈতিক পাণ্ডুলিপি ১৮৫৭-১৮৫৯"-এ বর্ণিত ও বিশ্লেষিত মার্কসের "অন্তর্বর্তীকালীন উৎপাদনসম্পর্কের (intermediary forms of production relations) তত্ত্ব ও পদ্ধতিসমূহ (যার নমুনা এই প্রবন্ধে বিশ্লেষিত ভাগচাষ, মজুরিশ্রম, পণ্যোৎপাদন, বিকাশের মূল প্রবণতা

নির্ণায়ক উৎপাদনসম্পর্ক ও নির্ধারক উৎপাদন পদ্ধতি প্রত্যয়সমূহে আলোচিত হয়েছে)।

গ. উৎপাদন পদ্ধতিসমূহের বংশপরম্পরা সূত্র (genetical connections) নির্ধারণে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রত্যয়সমূহকে ঐতিহাসিকভাবে (অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ যোগসূত্রসহ) দেখতে হবে। বিশ্লেষণে যুক্তি ও ঐতিহাসিক পদ্ধতির ঐক্য ছাড়া প্রত্যয়ের প্রয়োগ হবে নিতান্তই যান্ত্রিক। বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতি উদ্‌ঘাটনে প্রত্যয় বিশ্লেষণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মার্কসবাদী পদ্ধতির যান্ত্রিক প্রয়োগ হয়েছে। তাই মূর্ত বিষয় বিশ্লেষণের পূর্বে বিমূর্ত বিষয়াদি (তত্ত্ব ও পদ্ধতিগত প্রশ্নাবলী) নিয়ে আরও গভীর আলোচনার অবতারণা করতে হবে। উল্লেখ্য, আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কোনো কারণ নেই যে, ২৫ বছর ধরে "ভারতের উৎপাদন পদ্ধতি" বিতর্কের অন্যতম ফলাফল হলো "উৎপাদন পদ্ধতি কী?– এই প্রশ্নখানা।

ঘ. "বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতি"সমূহের বিকাশ দেখতে হবে বিকাশের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উপাদানসমূহের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের নিরিখে। বাহ্যিক উপাদানসমূহের প্রভাববলয়ের ক্ষেত্রে অন্তত দুই শতাধিক বছরকালের বিকাশকে দেখতে হবে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী শ্রমবিভাগের কক্ষপথে বিকাশমান পরিবর্তনশীল ও নির্ভরশীল রাশি হিসেবে এবং "ডিজেনারেটেড", "ডিফর্মড", "নন-ক্ল্যাসিক্যাল", ও "অন্তর্বর্তীকালীন উৎপাদনসম্পর্ক"সমূহের উদ্ভব ইতিহাস খুঁজতে হবে "কলোনি-মেট্রোপলি" সম্পর্কাধীনে বিকাশকালেই। এ পদ্ধতিতেই সত্য উদ্‌ঘাটিত হবে এবং "হয় সামন্তবাদ, না হয় পুঁজিবাদ" ধরনের পদ্ধতির অবৈজ্ঞানিক ভিত্তির প্রকৃত রূপ উদ্‌ঘাটিত হবে।

ঙ. "বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতি" সম্পর্কে ইতিমধ্যে বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্তভাবে যা আলোচিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে (যেখানে গুণগত বিশ্লেষণের বিপরীতে সংযোগহীন পরিমাণগত বিশ্লেষণ প্রাধান্য পেয়ে এসেছে) এবং যা এখনো বিশ্লেষিত হয়নি, শুধু প্রশ্নাকারে উত্থাপিত হয়েছে (দেখুন "বিকল্পচিন্তার ভিত্তি ও উপাদানসমূহ" আলোচনায় উপস্থাপিত প্রশ্নাবলী) সেগুলো এ প্রবন্ধে বর্ণিত, নির্দেশিত ও বিশ্লেষিত পদ্ধতিসমূহের (যেখানে বিশ্লেষণের গুণগত দিকটি প্রাধান্য পাচ্ছে এবং পরিমাণগত বিশ্লেষণকে গুণগত মূল্যায়নের সাহায্যে সংশোধিত করার মাধ্যমে তার যৌক্তিক পরিণতি ঘটানো হচ্ছে) সহায়তায় বিশ্লেষিত, সারসংকলিত ও সংশ্লেষিত করতে

হবে। বিশেষ বিষয়ে পারদর্শী একজন সামাজিকবিজ্ঞানী নন, সামাজিকবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় পারদর্শী, সচেতন বিশেষজ্ঞদের যৌথ উদ্যোগে ও কঠোর পরিশ্রমেই শুধু সে দায়িত্ব পালন সম্ভব।

প্রবন্ধে ব্যবহৃত পুস্তক ও রচনাবলী

১. আবদুল্লাহ আবু, (১৯৮০), "বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের স্বরূপ: একটি প্রাথমিক নিরীক্ষণ", *সমাজ নিরীক্ষণ*, ঢাকা, জানুয়ারি, পত্রিকা/২, পৃ. ১-৩৯।

২. আবদুল্লাহ আবু, (১৯৮০),"ভূমি সংস্কার, উন্নয়ন ও রাজনীতি: কয়েকটি মন্তব্য", *প্রাক্সিস জার্নাল*, ঢাকা, ৭ম/১০ম পুস্তক, জুলাই ১৯৮০, জুন ১৯৮১, পৃ. ৩৫-৩২।

৩. আহমদ মুজফফর, (১৯৭৭), "আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি: ১৯২০-১৯২৯", খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি, ঢাকা ।

৪. এঙ্গেলস ফ্রেডরিখ, "ই, ব্লক সমীপে এঙ্গেলসের চিঠি", মার্কস-এঙ্গেলস রচনা সংকলন, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় অংশ, মস্কো, প্রগতি প্রকাশনা, পৃ. ১৭৫।

৫. জাহাঙ্গীর বোরহান উদ্দিন খান, (১৯৭৯), "গ্রামাঞ্চলে ধনতন্ত্রের বিকাশ", সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা ।

৬. পাভলভ ভ ই, ভ গ রাস্তিয়ান্নিকভ ও গ ক শিরোকভ, (১৯৭৬), "ভারতের সামাজিক অর্থনীতিক বিকাশ– ১৮ শতক থেকে ২০ শতকের মাঝামাঝি", মস্কো, প্রগতি।

৭. বারকাত আবুল, (১৯৮০), "বাংলাদেশের বহুগাঠনিক কৃষি ও কৃষি রিফর্ম", *নতুন কথা*, ২০ মার্চ ১৯৮০, ঢাকা।

৮. ভূঁঞা মাহফুজ, (১৯৮১), "কৃষি প্রশ্ন: মার্কসবাদী লেনিনবাদী পার্টিসমূহের বিভ্রান্তি", ঢাকা, ধানসিঁড়ি প্রকাশনী।

৯. মাহমুদ কামাল, (১৯৭৭), "বাংলাদেশের অর্থনীতি, সমাজ ও রাষ্ট্র", ঢাকা, (প্রকাশক উল্লেখ নেই)।

১০. মোকাদ্দেম মাহবুবুল, (১৯৮১), "বাংলাদেশের কৃষিতে ধনবাদী বিকাশ", *মুক্তির দিগন্ত*, ঢাকা, মার্চ।

১১. রায় অজয়, (১৯৭৯), বাংলাদেশের অর্থনীতি– অতীত ও বর্তমান, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, মার্চ।

১২. রায় অজয়, (১৯৮০), "দুই দশকের পুঁজিবাদী বিকাশ", ঢাকা, একতা, ১৬ ডিসেম্বর।

১৩. রায় অজয়, (১৯৮৩), বাংলাদেশের ভূমিব্যবস্থা: সংকট ও সমাধান, ঢাকা।

১৪. রহমান আখলাকুর, (১৯৭৪), "বাংলাদেশের কৃষিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ", ঢাকা, সমীক্ষণ পুস্তিকা।

১৫. রহমান আখলাকুর, (১৯৮৪), "যুগ-সন্ধিক্ষণে বাংলাদেশ", পলিটিক্যাল ইকনোমি বক্তৃতা ১৯৮৪, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা।

১৬. হক আবদুল, (১৯৬৮), পূর্ব বাংলা-আধা সামন্তবাদ, আধা ঔপনিবেশিক, যশোর (প্রকাশক উল্লেখ নেই)।

১৭. হেয়টার টেরেসা, (১৯৮৩), বিশ্ব দারিদ্র্য: ব্রান্ড কমিশনের একটি বিকল্প প্রস্তাব, গণ-উন্নয়ন গ্রন্থাগার, ঢাকা, ১৯৮৩।

১৮. Abdullah Abu, H Musharaf and R Nation, (1976), Agrarian Structure and the IRDP Preliminary Considerations, *The Bangladesh Development Studies*, Dhaka, 1976, Vol-IV, No-2.

১৯. Abdullah Abu, (1976), Land Reform and Agraian Change in Bangladesh, *The Bangladesh Development Studies*, Dhaka. Vol-IV, No-1.

২০. Abdullah Abu, (1976), Mode of Production in Agriculture: The Indian debate, *The Journal of Social Studies, Dhaka*, No. 6, 1976, pp. 37-50.

২১. Alamgir Mohiuddin, (1978), Bangladesh: A Case of Below Poverty Level Equilibrium Trap, Dhaka, BIDS.

২২. Alexandrov Y, P Gurwitcz, G Kotovski and P Moisiev, (1968), Agrarian Questions in Asia and North Africa, Moscow, Nauka, 1968 (in Russian).

২৩. Barkat Abul (1981), Some methodological aspects for the study of agrarian sectors in the developing countries, Moscow, 1981 (unpublished Ph.D. thesis in Russian).

২৪. Bhaduri Amit, (1973), "Study in Agricultural Backwardness under Semi-feudalism" *Economic Journal*, Vol-83, pp.120-137.

২৫. Bhaduri Amit, (1973), "An Analysis of Semi-Feudalism in East Indian Agriculture", *Frontier,* Vol-6, pp. 25-28.

২৬. Byres TJ, (1983), Historical Perspectives on Share-cropping, in The *Journal of Peasant Studies*, London, Vol-10, Jan-April.

২৭. Chowdhury, Anwarullah. (1982), Agrarian Social Relations and Development in Bangladesh, Oxford & IBH, Delhi.

২৮. Clifton, H. (1969), Subsistence Agriculture and Economic Development, Chicago.

২৯. Datta RP, (1949), India Today, Moscow, Foreign Language, (in Russian).

৩০. Engels F. Development of Socialism from Utopia to Science, Collected Works of Marx-Engels, Vol-20 (in Russian).

৩১. Glunin V I and AC Murguzin, (1982), "Peasants in Chinese Revolution" In Ulyanovsky RA (ed). Revolutionary Process in the East: History and Contemporary Problems, Moscow, Nauka, 1982, pp.111-165 (in Russian).

৩২. Hilton Rodney, (introduction) (1978), The Transition from Feudalism to Capitalism. London, Verso, 1978 (Debate of Paul Sweezy, Maurice Dobb, Eric Hobsbawm and others).

৩৩. Huq Wahidul, (June, 1978), Bangladesh: Problematic of Transition, paper presented at the Special Conference of Bangladesh Economic Association on the Draft Two Year Plan.

৩৪. Islam S. Aminul, (1982), Book review of Anwarullah Chowdhury "The Agrarian Social Relations and Rural Development in Bangladesh" (New Delhi), in *The Journal of Social Studies*, Dhaka, No.18, pp. 154-160.

৩৫. Islam Nazrul, (1983), Book review of Anupam Sen "The State, Industrialization and Class Formation in India" (London), in *The Journal of Social Studies*, Dhaka, No-20, April 1983, pp. 122-141.

৩৬. Jahangir BK, (1977), "Bangladesh : A Peasant Economy", in *Dhaka University Studies*, 1977, Vol. XXVII, Part A.

৩৭. Jahangir BK , (1979), Differentiation, Polarisation and Confrontation in Rural Bangladesh, *Centre for Social Studies*, Dhaka University.

৩৮. Jannuzi FT and JT Peach, (1977), Report on the Hierarchy of Interests in Land in Bangladesh, Dhaka, USAID.

৩৯. Kim GF. (ed) (1971), Problems of Oriental Pre-capitalist Societies, Moscow, Nauka, 1971. (articles of Nikiforev.V. and Katchanovsky Y. on Asiatic Mode of Production (in Russian).

৪০. Lenin VI, On so-called market questions, Collected Works, Vol-1 (in Russian).

৪১. Lenin VI, Development of Capitalism in Russia, Collected Works, Vol-3 (in Russian).

৪২. Lenin VI, Comments on the book of R Gvozdiev "Social Economic significance of Kulakism and Usurary", Collected Works, Vol-4 (in Russian).

৪৩. Lenin VI, Capitalist Structure of Contemporary Agriculture, Collected Works, Vol-19 (in Russian).

৪৪. Levkovsky AE, (1978), Social Structure of Developing Countries, Moscow, Miecel, 1978 (in Russian).

৪৫. Mandel Ernest, (1968), Marxist Economic Theory, Vol-2, London.

৪৬. Marx K. (1970), A Contribution of the Critique of Political Economy, Moscow, Progress.

৪৭. Marx K. (1965), Capital, Vol-1, Moscow, Progress.

৪৮. Marx K, Economic Manuscript-1857/1859, Collected Works of Marx and Engels, Vol-46 (in Russian).

৪৯. Marx K, Capital. Vol-III, Chapter-XIX, XX, Moscow, Progress.

৫০. Marx K, Capital, Vol-III, Collected Works of Marx and Engels, Vol-25, part-III (in Russian).

৫১. Schagolov, (ed) (1975), Problems in the further development of methodology and theory of Political Economy, Moscow, Moscow State University, 1975, pp. 130-142 (in Russian).

৫২. Quibria MG and S Rashid. (1980), "The Puzzels of Sharecropping: A Survey of Theories," *Economic Research Unit Working Paper*, Department of Economics, Dhaka University.

৫৩. Rastiannikov VG. (1973), Agrarian Evolution in a Multistructural Society. Experience of independent India, Moscow, Nauka, (in Russian).

৫৪. Roy MN. (1972), Roy-Lenin Controversy on Colonial Questions, Moscow, Nauka, (in Russian).

৫৫. Roy MN, et. al., "Manifesto to the delegates of the XXXVI Indian National Congress", in Ahmad Muzaffar, "Amar Zibon-o-Bharoter Communist Party-1920-1929", pp. 480-493.

৫৬. Rudra A. (1978), "Class Relations in Indian Agriculture", in *Economic and Political Weekly*, Vol-XIII, No.229/6-923, June-3, Bombay.

৫৭. Shirokov GK. (1982), Industrial Revolution in the East, Moscow, Nauka (in Russian).

নির্ঘণ্ট

অ

অর্থশাস্ত্র, ২০, ২২, ৩৩, ৩৯, ৬২, ৯১, ১০৪, ১০৫, ১০৮, ১২২
অদ্বৈতবাদী, ৬৭, ৭২, ৮৯
অধ্যাত্মবাদিতা, ৬৫, ৮৯
ধ্রুব পুঁজি, ৪৬, ৪৭, ৫৭
অধনতান্ত্রিক, ১৪৪,২২৯
অনুপম সেন, ২২৪
অণুবীক্ষণ যন্ত্র, ১৯
অনুসিদ্ধান্ত, ১৩, ৩৫, ২৪২
অবরোহ, ৩৫, ৯৭
অভ্যুত্থান, ১০০, ১৭৭, ১৭৯, ১৮১
অমার্কসীয়, ১০, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২৪, ২৯, ৬৪, ৬৫, ৭২, ৮৭, ১৮৫
অজয় রায়, ১৬, ৬৩, ২২৩, ২২৬
অন্তর্বর্তীকালীন, ১৪১, ২২০, ২২৯, ২৩১, ২৩২, ২৩৩, ২৩৫, ২৪২, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৮, ২৬৩, ২৬৪
অভিজ্ঞতাবাদী, ২০, ২১
অপটিমাম সমাজ, ২৯
অর্থশাস্ত্র বিচার প্রসঙ্গে, ৩৩, ৩৯, ৯১, ১০৪, ১০৫, ১০৮, ১২২
অ্যান্টি ড্যুরিং, ৪১, ৪২, ১১১

আ

আন্দ্রেয়িয়েভ, ১৪১, ১৪২, ১৪৪
আমেরিকা, ৯, ১১, ১৫, ২৩, ২৪, ২৭, ৩০, ৫১, ৫২, ৫৫, ৫৮, ১১০, ১১১, ১১৬, ১১৭, ১২৫, ১৪৩, ১৮৯, ১৯০, ১৯১, ১৯২, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৭, ১৯৮, ১৯৯, ২০০, ২০১, ২০২, ২০৩, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২৪১
আরোহ, ৩৫, ৯৭
আধাসামন্তবাদ, ৯৫, ১৪২, ২২৫, ২২৬, ২২৭, ২২৮, ২৩১, ২৩৩
আধাসামন্ততান্ত্রিক, ২২৮, ২৩০, ২৫৮
আবদুল হক, ২১৮, ২২৩
আবদুল্লাহ ফারুক, ২০
আবু আবদুল্লাহ, ২২৪, ২৩১, ২৩২
আবু মাহমুদ, ১৬, ১৭
আর্যগ্রাম, ১১০
আলবার্ট নিয়েমি, ১৯০
আলাভি, ২২৪, ২৩৩
আখলাকুর রহমান, ২২৩, ২২৯
আদিম, ১২, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৬, ৮৯, ৯৬, ৯৭, ৯৯, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১১০, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১৩৪, ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৫৭, ১৬০, ১৬২, ১৬৮, ১৭৬, ১৮৬, ১৯৩, ১৯৮, ২১৪, ২১৯, ২২৫
আফ্রিকা, ১১, ৫৮, ১০৭, ১২৬, ১২৮, ১৪১, ১৪৩, ১৪৫, ১৪৭, ১৪৯, ১৫২, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৮৬, ১৮৭, ১৯৩
আত্মসাৎকারী, ১৮, ১৩৪, ২৫৪
আর্থসামাজিক ব্যবস্থা, ১১, ১৫, ১৭, ৩৯, ৫৮, ৬৩, ৬৫, ৬৮, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৯, ৯১, ৯৭, ৯৯, ১০৩, ১১১, ১১৩, ১১৪, ১১৬, ১১৮,

১১৯, ১২১, ১৫৫, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৬১, ১৬৫, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭৬, ১৭৭, ১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৮৪, ২১৭, ২২৮
আদর্শ মডেল, ১৫৬
আয়ের ক্ষেত্রে বিপ্লব, ২৭, ২৮, ৪৯
আধা-আধা, ২২৬
আধা-পুঁজিবাদ, ২২২, ২২৩, ২২৫, ২২৬, ২২৭, ২৬৩
আত্মীয়দাহ প্রথা, ১৬২

ই
ইকিমভ, ১৩৪
ইউরোপীয়, ৮২, ৯৭, ৯৯, ১০১, ১০৩, ১১২, ১১৩, ১৪৪, ১৫৫, ১৭৩, ১৯৯, ২২৯, ২৪২
ইত্তলক, ই. সি., ১৪৪
ইচ্ছানিরপেক্ষ, ৭৩, ৭৬, ৭৭, ৮১, ৮৮, ৮৯, ২৪১, ২৬৩
ইমানুয়েল, ২২৩
ইলুসেচকিন্, ভ. প., ১৪৫, ১৪৬
ইসরাইটেল, ১৪১, ১৪২
ইজারা, ২২৩, ২২৪, ২২৬, ২৩০, ২৩৬, ২৩৭
ইলিন, গ. ফ., ১৪৫
ইলিচিয়েভ, ল, ফ, ৯২
ইতিহাসতত্ত্ব, ৬৮, ৭৫, ৮৯
ইউরোপকেন্দ্রিক, ৬৮, ৯৭, ১২০, ১৫৫
ইনটেগ্রাল সমাজ, ২৯
ইয়াও, ১১০, ১৭২, ১৭৩, ২০২, ২০৪, ২০৫, ২০৬

উ
উইলক্স, ১০২
উইটফোগেল, ১০৯
উইলিস, ১৯০
উপরিকাঠামো, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৬৬, ৬৭, ৭১, ৭৭, ৮৪, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ১০০, ১০৮, ১৫৮, ১৫৯, ১৬৯, ১৭৬, ১৮০, ১৯২, ১৯৪, ২১৭, ২২১, ২৩৪, ২৪০, ২৪২
উল আইন, ১৯৬
উদ্বৃত্ত মূল্য, ২৩, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ১৫৬, ২২৪, ২২৯, ২৩২, ২৪১, ২৪৯, ২৫৩, ২৫৪
উৎপাদনশীলতা, ৪৭, ৪৯, ৫০, ১৭৬, ২২৬, ২৫০, ২৫৮, ২৫৯, ২৬০, ২৬২
উৎপাদিকা শক্তি, ১০, ১১, ৩৩, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪২, ৪৭, ৫৯, ৬৬, ৭১, ৭৩, ৭৪, ৭৬, ৭৭, ৮০, ৮১, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৮, ৮৯, ৯০, ১০২, ১০৩, ১৫৮, ১৫৯, ১৬১, ১৭৬, ১৭৭, ১৮০, ১৮৪, ২১৪, ২১৭, ২১৯, ২৩৯, ২৫৯, ২৬০
উৎপাদন সম্পর্ক, ১৮, ৩৬, ২১৯
উৎপাদিত দ্রব্যের বণ্টন, ৩৭, ৩৮
উচ্ছিষ্টাংশ, ১০৩, ১১৬, ১৬৪
উদ্ধৃতি অন্ধত্ব, ১৪২
উপজাতীয়, ৯৯, ১০৬, ১১০, ১৪৪, ১৬০
উত্তরণকালীন, ১০৬, ১৪৮, ১৮১
উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব, ২৪, ৪৫
উৎপাদন পদ্ধতি, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ২০, ৩৩, ৩৫, ৩৭, ৩৮, ৪২, ৪৩, ৪৫, ৬১, ৬৩, ৬৬, ৬৮, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮৩, ৯০, ৯১, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮,

৯৯, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৬, ১২৮, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৬, ১৪৮, ১৫০, ১৫১, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৬০, ১৬১, ১৬৭, ১৬৯, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৯, ১৯০, ১৯১, ১৯২, ১৯৩, ২১৩, ২১৪, ২১৫, ২১৬, ২১৭, ২১৯, ২২০, ২২১, ২২২, ২২৩, ২২৪, ২২৫, ২২৬, ২২৭, ২২৯, ২৩০, ২৩১, ২৩২, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৭, ২৩৮, ২৩৯, ২৪০, ২৪১, ২৪২, ২৪৩, ২৪৯, ২৫০, ২৬৩, ২৬৪

এ
এশিয়া, ১০, ৫৮, ৬৮, ৭৮, ১০১, ১০৭, ১০৮, ১২০, ১২৬, ১২৮, ১৪৭, ১৪৯, ১৫২৫, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৮৬, ১৮৭
এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি, ১০, ১১, ১২, ১৫, ৬৮, ৭৮, ৭৯, ৮৩, ৯১, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৫, ১২৬, ১২৮, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৬, ১৪৮, ১৫০, ১৫১, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৭, ১৮৪, ১৮৬, ২২৯
একীভবনকৃত, ৬২
এটজিওনি, ২১৬
এঙ্গেলস ফ্রেডরিখ, ২৬৫
এুদাভাইয়া পাভিননস্ত, ১৩৫
এশীয় সমাজ, ১০২

ঐ
ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, ৩২,৩৬, ৭১, ৮৮, ৯০, ২১৭

ও
ওয়েভার, ২১৬

ক
কনফুসীয়, ১৭১, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬
কনভারজেন্সি তত্ত্ব, ২৯, ৩০
কভালেভস্কি, ১১১, ১১৫, ১১৬, ১১৭
কভালিয়েভ, এম. ই., ১৪৪
কমিউনিস্ট, ২৫, ৯৮, ১১৯, ১২০, ১২২, ১৩৪, ১৪৬, ২১৪, ২২৭, ২২৮, ২৬৩
কলিন ক্লার্ক, ২১৬
কলিনউড, ৭১
করোভকিন, ফিওদর., ১৮৪
কলিনস, ২১৬
কর্নডোরসে, ৭০
কর রাজস্ব, ১৩৪, ১৩৫, ১৪১, ১৪২
কান্ট, ৬৫, ৭১
কাম্পানেলা, ৪৪
কানাল, ৯৭
কামাল মাহমুদ, ২২৪, ২৩১, ২৩২

কারাসতোভসিয়েভ, ম. আ., ১৪৭
কালপর্ব, ৮৫, ৯০, ১১৬, ১৩২, ১৩৪, ১৮৪
কালবিভাজন, ৯০, ১৯০
কান্তারোভিচ, ১৩৩, ১৪৬
কাবিসানভ, এউ. এম., ১৪৭
কেইনস্, ২৪, ২৫, ২৬
কেম্পবেল, ১০২
কোরোনাস্ভিলি, গ. ভ., ১৪৮
কোন, ই, স,, ৯২
কোবিসানভ, ১৪০
কোকিন, ১৩৪, ১৪৮
কিন্ ও দক্ষিণ সুং রাজবংশ, ১৫৭
কিম, গ. ফ, ১৪৭
কিসিবেকভ, ১৪১, ১৪২, ১৪৮
ক্রিলভ, ১০৫
ক্রিয়াবাদ, ৬৫, ৯০
কর্ভি, ১৭৮, ১৮১
কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারে, ১১৯
ক্লাস গ্রামাটেইভ, ১৩৩
ক্লিওমেট্রিকস, ১৪, ৬৫, ৬৯

খ
খোরাক, ২১৩
খামার, ৪১, ৭৯, ২০৩, ২২৮, ২৩৭, ২৪৯, ২৫০, ২৫৭, ২৬০
খাজনা, ৪১, ১৪০, ১৫৬, ২০৬, ২৩২, ২৪৭, ২৫৬, ২৫৭, ২৬১

গ
গুড় ও চিনি আইন, ১৯৬
গ্যারোডি, ৯৭
গডেলিয়ের, ৯৭, ১৯৯, ১২৬
গবলেট, ৯৭
গলব্রেথ, ২৪, ৩০, ৩১
গ্রন্ড, ২০২
গ্রিনেভিচ, ১৩৩
গারুসিয়ান্স, ১৪১, ১৪২
গণ-অভ্যুত্থান, ৮৬, ১৭৮
গণতন্ত্র, ২৬, ১১৮, ১২৯, ১৩৯, ১৮৯
হ্যারোড, ফ্রিডম্যান, ২১৬
হ্যাট আইন, ১৯৬
হস্তশিল্প, ২২৯, ২৫৭
হবসবন্, ১০৪, ১০৬
গোষ্ঠীসমাজ, ১০, ৯৬, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৬, ১১৮, ১২৬, ১৩৫, ১৬০, ১৬৩, ১৬৫
গ্রিনবেকের, ২০৭

চ
চেরেপনিন, ল, ভ, ৯২
চৌ, ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৭, ১৭৬
চীন, ৯, ৭৯, ১০৮, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৭, ১৪৬, ১৪৮, ১৫১, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৬০, ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৭, ১৮২, ১৮৫, ২১৮, ২২৭, ২২৮
চীনবিশারদেরা, ১৬২
চুন্-চিউ, ১৫৭, ১৬৩, ১৬৪
চিন্, ১৫৭
চি-ইং, ১৫৭
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, ১৪, ৩৬, ৪৪

চৈনিক, ১৬০, ১৬১, ১৬২, ১৭০, ১৭১, ১৭৪, ১৮১, ১৮৪, ২২৭
চক্রতত্ত্ব, ৯
চানিসিয়েভ, আ.ন, ১৮৫
চৌ রাজবংশ, ১৫৭
চুন্‌চিউ, ১৬২
চিরন্তন সামন্তবাদ, ১৩৭

জ
জোতদারি, ১১৪, ১৩৭
জ্যাঁ-পল-সাত্রে, ৪৪
জন স্টুয়ার্ট মিল, ৭১, ২১৬
জন বেইটস ক্লার্ক, ২৩
জন মেইনার্ড কেইনস্‌, ২৪, ২৬, ২১৬
জন ব্রাউনের, ২০৫
জ্যাঁ বাতিস্ত সেঁ'ই, ২৩
জাপান, ৫৭, ৬০
জার্মান, ৮৩, ৮৬, ৯৩, ৯৯, ১২৯, ২২৮
জাতীয় আয়, ৪৬, ৫০, ২৩৪
জাতীয়তাবাদী, ৬৮, ১৯০
জুকভ. ই. ম, ১৮৫
জেনট্রি, ৮৩, ১৩৩, ১৩৪, ১৭০
জনগণের পুঁজিবাদ, ২৬, ২৭
জুলিন্‌, ১৭০
জিন-টিয়ান্‌, ১৬৩
জি-জিয়ান্‌, ১৬৩

ট
টের-আকোপিয়ান, ১০৯
টাউনসেন্ড আইন, ১৯৬
টিনবারজেন, ২৯, ৩৯, ২১৬
ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন, ২০৬

ড
ডাহরেনডফ, ২১৬
ডেভিড রিকার্ডো, ২১

ত
তোকেই, ৯৭, ১০৪, ১০৯, ১২৬, ১৮৬
তান্‌ রাজবংশ, ১৫৭
তাইপিন, ৯৯, ১০৮, ১৭৮, ১৮২
তুমেনিয়েভ, ১৩৮
তুলনামূলক পদ্ধতি, ৩৫
তুর্কি, ৭৯, ১১৪, ১১৫, ১৬০
তাকাচেভ-এঙ্গেলস, ১১১
তামাটে অভিজাত, ১৭৪
ত্রিভুজ বাণিজ্য, ১৯৬

দ
দর্শনশাস্ত্র, ১৭১
দাওসি, ১৭১, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৮৬
দাস, ১১, ১২, ৬৫, ৭২, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৬, ৮৯, ১০৩, ১০৪, ১০৬, ১০৮, ১১৪, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪২, ১৪৩, ১৪৫, ১৪৮, ১৫০, ১৫৩, ১৫৪, ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৮, ১৬৯, ১৮৪, ১৮৬, ১৯১, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৯, ২০৫, ২১৪, ২১৫, ২১৯, ২২৮, ২৪৩
দাসশ্রম, ১৯৪, ১৯৬, ২০০
দাস সমাজ, ৮০, ৮৪, ৮৬, ১৩৪, ১৩৭, ১৩৮, ১৪৫, ১৬২, ১৬৫
দানিয়েল বেল, ২১৬

দারিদ্র্যসীমা, ২৮, ৫৫, ৫৬, ১৬৪
দুবরোভস্কি, এস. এম., ১৫০
দুর্ভিক্ষ, ১০০
দক্ষতাসহ শ্রমশক্তি, ৩৭
দেউলিয়াত্ব, ৫৪
দিলশিন, ল. প, ১৮৬
দিয়াকোনভ, ই. এম., ১৪৯, ১৫০
দিয়াকোভ, ভ, আ, ৯২
দ্বন্দ্বমূলক, ২৪, ৩৬, ২৫৬
দ্বন্দ্বাত্মক, ১৯, ৩২, ৩৬, ৪২, ৬৫, ৬৭
দর্শনের দারিদ্র্য, ১৯৯, ১২৮
দাস উৎপাদন পদ্ধতির, ৭৯, ১৩৩, ২৪৩
দাসযুগীয়, ১৮২
দক্ষ ও শিক্ষিত ক্যাডার, ২৪
দুই সমাজব্যবস্থার সম্মিলনী, ৩৯

ধ
ধাতুশিল্প, ১৯৮

ন
নৌযান আইন, ১৯৬
নেমিরিজম, ৬৫
নৃতত্ত্ব, ৯৮, ১৩৩, ১৩৮, ১৪৪
নব-নিসর্গবাদীয়, ২০
নিকোলস্কি, এন. এম., ১৫০
নির্ণেয়বাদ, ৮২
নিউইয়র্ক, ২০৪
নিউ জার্সি, ২০৪
নিট মুনাফা, ৫২, ৫৩
নিকিফোরভ, ভ, ন, ৯২
ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়ন, ২০৫
নয়া জেনট্রিদের, ৮৩
নাইটস অব লেবার, ২০৬
নীল বই, ১০২
নিচু স্তরের সেন্‌সি, ১৭৩
নতুন মূল্য, ৪৬
নিরঙ্কুশ উদ্বৃত্ত মূল্য, ২০৩

প
পেরেলোমোভ, ল. স., ১৮৬
পেনসিলভানিয়া, ১৯৮, ২০২, ২০৪, ২০৫, ২০৬
প্লেখানভ, ৭২, ১১০, ১২০, ১৪৩, ২২৯
প্লেটনিকভ, ইউ, ক, ৭২, ৯৩
পোস্ট মর্ডানিজম, ১৪
পোস্ট-কলোনিয়ালইজম, ১৪
পেসিরকা, ৯৭
পেটিবুর্জোয়া মতবাদ, ২০৭
প্যাট্রিআরখাল, ১৪১
পলেমিকস, ১৪১
পণ্যোৎপাদন, ১৪১, ২২৪, ২২৬, ২৩৬, ২৩৯, ২৪২, ২৫০, ২৫৭, ২৫৯, ২৬২, ২৬৩
প্রযুক্তিগত, ২৩, ২৯, ৩১, ৩৮, ৩৯, ৬৮, ২৬০
প্রকৃত বুনিয়াদ, ৭৩
প্লটনিকভ, ৭২, ৯৩
প্রাক্-পুঁজিবাদী, ৯, ১১, ৮০, ৯১, ১২০, ১৩৩, ১৩৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৬০, ১৬৭, ১৬৯, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৮৪, ২১৯, ২২৮, ২৩০, ২৩৭, ২৫৮, ২৫৯, ২৬০, ২৬২
প্রাক্-ঔপনিবেশিক, ১১৫, ১১৬, ১৯২

প্রাক্-শিল্প, ২১৯
পাপাইয়ান. জি. কে., ১৪৮
পারস্য, ১০০, ১০১, ১৩৭
পারসনস, ২১৬
পরিভোগ, ৩৯, ২৫২, ২৫৮, ২৬০, ২৬১
পরিভোগজনিত সম্পর্ক, ৩৭
পলিটিকেল ইকনমিস্ট, ৯
পণ্যমূল্য, ৪৬
পুঁজিবাদ, ১০, ১১, ১২, ১৪, ১৫, ১৯, ২১, ২২, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৭, ৫৯, ৬১, ৬২, ৬৮, ৭৮, ৭৯, ৮৫, ৮৬, ৮৯, ৯৫, ১৬০, ১৮২, ১৮৯, ১৯১, ২০৭, ২১৬, ২২২, ২২৩, ২২৪, ২২৫, ২২৬, ২২৮, ২৩১, ২৩৩, ২৩৫, ২৩৭, ২৩৮, ২৪৯, ২৫১, ২৫৭, ২৫৯, ২৬৩, ২৬৪
পুঁজিবাদী, ৯, ১১, ১৫, ১৮, ২০, ২২, ২৩, ২৪, ২৬, ২৭, ২৯, ৩০, ৩১, ৩৩, ৪০, ৪১, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৭, ৪৯, ৫১, ৫৪, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৮০, ৮৩, ৮৪, ৯১, ১০১, ১২০, ১৩৩, ১৩৫, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৬০, ১৬৭, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৮৪, ১৮৯, ১৯০, ১৯১, ১৯৭, ১৯৮, ২০০, ২০৩, ২০৪১, ২০৫, ২০৬, ২১৪, ২১৫, ২১৯, ২২০, ২২২, ২২৩, ২২৪, ২২৫, ২২৬, ২২৭, ২২৮, ২২৯, ২৩০, ২৩২, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৭, ২৩৮, ২৪০, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৭, ২৪৯, ২৫০, ২৫১, ২৫২, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৫, ২৫৭, ২৫৮, ২৫৯, ২৬০, ২৬২, ২৬৪
প্রিমাক, ১৯০
পিতৃতান্ত্রিক, ৯৯, ১৪১
পোস্ট-ইন্ডাসট্রিয়াল, ৩১
পশুতুল্য আত্মাহীন জন্তু, ১৯৩
প্রযুক্তিগত নির্ধারকতাবাদ, ২৯
পুঁজি, ৯৯, ১০৩, ১০৫, ১০৮, ১০৯, ১১২, ১৩১, ১৪৩, ১৫০, ১৯৯, ২০০, ২৪৯
পাণ্ডুলিপি, ১৬, ১০৪, ১০৫, ১০৬
পশ্চিম চৌ, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪
পুরাতাত্ত্বিক, ১১১, ১১৭
পুঁজিবাদের রূপান্তরের তত্ত্ব, ২৬
পুঁজির গণতন্ত্রীকরণের তত্ত্ব, ২৬
পুঁজি সঞ্চয়নের তত্ত্ব, ৪৫

ফ

ফ্লোরিডা, ১৯৯
ফ্রঁসোয়া কেন্, ২১
ফ্রান্সেভ, ৭৪
ফ্রান্স, ২৪, ৫৭, ৬০, ৮৩, ১০৯, ১৯২
ফান্-জেন্ লান., ১৮৬
ফুকিডাড, ৭১
ফিদোসিয়েভ, ৭৪, ৯৩
ফিলাডেলফিয়া, ২০৪
ফিজজিরাল্ড, ১৬২
ফেন সু কেন্ জু, ১৭৫
ফুনুন্, ১৭৪

ব
বৈপ্লবিক, ৩৪, ৩৬, ৬৬, ১১১, ২১৯
বৈষয়িক, ১৮, ২৩, ৩৩, ৪৪, ৪৬, ৬৭, ৭৩, ৭৪, ৮৯, ১০১, ১১২, ১১৮, ১৩৮ ২৫২, ২৬০
বৈসাদৃশ্য, ১৩৫, ১৩৬, ১৫৭
বৈশ্বিক আর্থসামাজিক, ১৭
বেনডিক্স, ২১৬
বেলস্‌কফ, ৯৭
বোরহান উদ্দিন, ৯, ২৬৫
বৈজ্ঞানিক-কারিগরি, ১৪, ২৮, ৩১, ৫৪, ৫৭, ৫৯, ৬১, ৬২, ২১৯
ব্যানার্জী, ৯৭
ব্যাবিলন, ১৩৭
ব্রিটেন, ১৯৭, ২৪১, ২৫৯
ব্রিটিশ, ১১, ১২, ১০১, ১০২, ১১১, ১১৫, ১১৬, ১২২, ১৭০, ১৯৫, ১৯৬, ২০৪, ২১৫
বলোটনিকভ, আ. আ, ১৫১
বর্গা প্রথা, ২৪২, ২৫০
বাইজেন্টাইন, ৮৩, ১০৫
বামপন্থী, ২১৩, ২১৪, ২২২
বাকুনিনের, ১১০, ১১১
বুর্জোয়া, ১৮, ২২, ২৪, ২৮, ৩১, ৩৬, ৩৯, ৪১, ৪২, ৪৯, ৫১, ৫২, ৫৪, ৫৫, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬৪, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭২, ৮২, ৮৪, ৯৩, ১০৩, ১০৫, ১৪৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৯০, ১৯২, ১৯৫, ১৯৭, ১৯৮, ২০৭, ২৩৯, ২৪৯, ২৫৩, ২৫৬, ২৫৮
বিদ্রোহ, ৮৪, ৮৬, ১০৮, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৯৮, ২০৫
বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ পদ্ধতি, ৩৫
বিনিময়, ৩৮, ৩৯, ৪০, ২৫৩, ২৫৫, ২৬২, ২৬৩
বিচ্ছিন্নতা, ১৯, ৪৬, ৪৭, ৫৭, ৫৮, ৮৮, ১৯৩
বৃহৎ শিল্প, ২০০, ২০১
বাংলাদেশের ভূমিব্যবস্থা, ২২৬, ২৬৬
বর্ণনামূলক, ১০, ৬৪, ৬৫, ৬৯
বিকল্প চিন্তার, ১২, ২২১, ২৩১, ২৩৭
বিকল্প, ১২, ৬৮, ৭৫, ১২৯, ২২১, ২৩০, ২৩১, ২৩৭, ২৩৯

ভ
ভেবলেন, ২১৬
ভূ-মালিকানা, ১১৪, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৯
ভূ-শ্রমিক, ১৯৬
ভূমিদাস প্রথা, ৭৯, ১১৯
ভূমিহীন, ১৯৭, ২৪৩, ২৪৭, ২৪৮, ২৫৪, ২৫৬
ভ্লাদিমির আফানাসিয়েভ, ৩৭
ভাদুরী, ২২৩
ভাববাদী অর্থনীতি, ২০, ২২, ২৩
ভাববাদীয় যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, ২০
ভারত, ১০, ১০০, ১০১, ১০২, ১১০, ১১২, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৮, ১২০, ১৩৭, ১৫৩, ১৫৫, ১৫৬, ২৩১, ২৪১
ভার্গা, ১৩৩, ১৪০, ১৫১
ভাগচাষ, ১১, ১৪৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৯, ১৮২, ২২৩, ২২৪, ২২৫, ২২৬, ২৩০, ২৩২, ২৩৬, ২৩৭, ২৩৯, ২৪২, ২৪৪, ২৪৯, ২৫০
ভাসিলিয়েভ, ১০৪, ১২৭, ১৪২, ১৫১, ১৮৭

ভার্জিনিয়া, ১৯৬
ভিত্তিকাঠামো, ১৬০

ম
মেদভেদিয়েভ, ১৪০, ১৫৩
মেসোপটেমিয়া, ১৫৬
মেটামরফোসিস, ৪৫
মোইজম, ১৭৪
মোফাখখারুল ইসলাম, ৯৫
মোগল, ১১৫, ১২৭
মেরিল্যান্ড, ১৯৬, ২০৪
মূর্ত, ৩৫, ৪৫, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৭১, ৭২, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৮৭, ৮৮, ৯০, ৯৯, ১১৬, ১৫৭, ২২১, ২৬৪
ম্যাক-কুল্লোখ, ১০২
মঙ্গোলীয়, ১৭০, ১৮০, ১৮১
মনোপলি, ৩১, ১৯১, ২০৫, ২০৭
মনোপলি মুনাফা, ৩১
মডেল, ১৪, ১০৪, ১২৭, ১৫১, ১৫৬, ১৮৯, ১৯০
মডেলকরণ, ৬৫
মধ্যপ্রাচ্য, ১৫৬
মমদ্‌জিয়ান, খ, ন, ৯৬
মজুরিশ্রম, ১১৯, ২৩৭, ২৫০, ২৫১, ২৫৩, ২৫৪, ২৬২, ২৬৩
মার্কস, ১০, ১৩, ১৪, ১৫, ১৮, ২৩, ২৪, ২৫, ৩৬, ৩৭, ৩৯, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৫, ৫৯, ৬০, ৬১, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৮, ৯১, ৯৩, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১৩৪, ১৩৭, ১৪২, ১৪৩, ১৪৫, ১৪৬, ১৫০, ১৫২, ১৮৫, ১৮৭, ২০৪, ২১৭, ২২১, ২২২, ২২৩, ২২৪, ২৩৮, ২৪২, ২৪৯, ২৫২, ২৫৩, ২৫৪, ২৬৩, ২৬৫
মার্কস-এঙ্গেলস, ১০, ৭২, ৯২, ১০৩, ১০৭, ১০৯, ১১৩, ১২১, ১২২, ১২৫, ১২৮, ১৩১, ১৪৩, ১৫২, ১৬৫, ১৮৫, ১৮৭
মার্কসবাদ, ৪২, ৭৬, ৯৩, ৯৮, ২১৬, ২২৩, ২২৪, ২৩৬
মার্কসবাদী, ৯, ২৪, ৬৪, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৭২, ৭৫, ৭৬, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮৪, ৮৫, ৮৭, ৯৭, ১৪৫, ১৫২, ২২২, ২৩০, ২৬৪, ২৬৫
মাস মাহিনে, ২৫১
মাহফুজ ভূঁইয়া, ২২৪, ২৩১, ২৩২
মার্টন, ২১৬
মাদিয়ার, ১৩৪, ১৪৮, ১৫২
মহিউদ্দিন আলমগীর, ২২৩, ২২৫, ২২৬
মুরাট, ২৪
মুচলেকাবদ্ধ, ১৩৩, ১৩৭, ১৪০
মুৎসুদ্দী, ২২৬
মুজাফফর আহম্মদ, ২১৫
মতাদর্শ, ২২, ৭৭, ৯৯, ১৫৮, ১৫৯, ১৭৬, ১৭৫
মিশ্রণ, ১৪২, ২৩২
মিসর, ১৩৫, ১৩৭, ১৫৬
মিন সম্রাট, ১৫৭
মূল্যস্ফীতি, ১৪
মূর্ত বিকাশসূত্র, ৭১, ৭২
ম্যানেজেরিয়াল বিপ্লবের, ২৮
মিশ্র অর্থনীতির তত্ত্ব, ২৬

য
যুদ্ধবিদ্যা, ১৭১
যুক্তরাষ্ট্র, ৫৭, ৬০, ১৮৯
যুক্তরাজ্য, ৫৭, ৬০

র
রস্টো, ৬৮, ২১৬
রঙ্গলাল সেন, ১৬, ৯৫
রূপান্তর তত্ত্ব, ৪৫
রকফেলার, ২০২
রপ্তানি, ৫০, ৫১, ১৯৪
রাষ্ট্রকাঠামো, ১৩৮, ১৫৮
রাষ্ট্রশক্তি, ৪৪, ৬৭, ২২১
রাষ্ট্রায়ত্ব মালিকানা, ৪৩
রাষ্ট্রক্ষমতা, ৪৩, ১৭২, ১৭৫, ২৪১
রায় অজয়, ২২৬, ২৬৫, ২৬৬
রাজস্ব, ২২, ২৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৯, ১৩৯, ১৪০, ১৪২, ১৬৬, ১৭১, ২০৬, ২৪৩
রাজনৈতিক সৌধ, ৭৩
রাজবংশের পতন, ১৭৭
রাজতন্ত্র, ৮৩, ৮৪, ১১৮, ১৪১
রেইলএন্ডার, ২০২
রেশন্যালিটি, ১৪
রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ, ৪২, ২১৭, ২২৮, ২৩২, ২৬৩
রিজার্ভ আর্মি, ১৭৪

ল
লেনিন, ৭৭, ৮৫, ৮৬, ৯৩, ১২০, ১২৮, ১২৯, ১৩৪, ১৪২, ১৪৩, ১৫৩, ১৮৭, ২২৩, ২২৪, ২২৭, ২২৯, ২৫৪, ২৫৭, ২৫৮
লেনিনীয় ইতিহাসবাদ, ৯৩
লনগ্রয়োরস, ২০২
লুজিয়ানা, ১৯৯
লিপসেট, ২১৬
লিউইন, ৯৭, ১০৬
লৌহযুগের, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭
লড়াকু রাষ্ট্র, ১৭৬

শ
শ্রেণিসংগ্রাম, ১৮, ৪২, ২১৫
শেরমেরগন, ২০২
শোষকশ্রেণি, ৪৬, ৪৭
শ্যানন, ২০২
শ্রমের প্রক্রিয়া, ১৮
শ্রমের উপায়, ৩৭, ৩৮
শ্রমের বস্তু, ৩৭, ৩৮
শ্রমশক্তি, ২৩, ৩৭, ৩৮, ৪৬, ৫৪, ১৩৮, ১৬৪, ১৬৬, ১৬৮, ২২৯, ২৪৮, ২৫০, ২৫১, ২৫২, ২৫৪, ২৫৫, ২৬১
শ্রমসময়, ৫১, ৫২
শ্রাম, ৯৭
শ্রমশোষণ, ২০৩
শ্রমদিন, ২০৩, ২০৪, ২০৫
শ্রমদিবস, ২০৪, ২০৭
শাহিদা আখতার, ১৬
শফিক উজ জামান, ১২, ১৬
শিল্প যুগ, ২১৯
শিল্পবিপ্লব, ১৯৭, ১৯৮, ১৯৯, ২০৪
শোষণজনিত সম্পর্ক, ১৩৩

স
স্ত্রুভে, ভ. ভ., ১৫৪
স্ত্রুচেভস্কি, ই. আ., ১৫৪
স্পার্টাকাস-ইলোট, ১৩৯
স্পার্তার ক্রীতদাস, ৭৯
স্ট্যাম্প আইন, ১৯৬
স্টুসের, ১৩৪
স্পেন, ৮৩, ১৯২, ১৯৭
স্পেন্সার, ৭১
স্টেফান ফন, ১৯৮
সেন্যো, ১০৪
সেইডার, থ, ৯৩
সেচব্যবস্থা, ১১৩, ১৪৫, ১৪০
সৌভ্রাতৃত্বের যুগ, ১৯৫
সোভিয়েত ইউনিয়ন, ৩০, ৩১, ১০৯, ১৩২
সোভিয়েত প্রাচ্যগবেষণা, ১৫, ১৫০
স্যাগোলভ, ২২০
স্যানডার্সের, ১৯২
স্যামুয়েলসন, ১৯২, ২১৬
সন্দেহবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, ২০
সমগ্রতা, ৭২, ৭৩, ৯০
সংস্কৃতি, ১৩৩, ১৪৫, ১৫১
সংস্কারবাদ, ২০৭
সান্-ইন্, ১৭৬
সান্, ইউ-এ, ১৮৭
সাম্য, ১৯০, ২০৭
সাম্যবাদী, ১৫, ৭৭, ৮৩, ৮৯, ৯৭, ৯৯, ১০৩, ১১০, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২১, ১৩৪, ১৪০, ১৪১, ১৪৩, ১৪৪, ১৬০, ১৬২, ১৬৮, ১৭৬, ১৮৬, ২১৪, ২১৯
সাম্রাজ্যবাদ, ৩১, ১১৮, ১৯১, ২১৭
সামন্ত, ১২, ৭৯, ৮০, ৮২, ৮৩, ৮৪, ১০৩, ১০৫, ১২০, ১৩৪, ১৩৮, ১৪০, ১৪৩, ১৭৩, ১৭৭, ১৯৪, ২১৪, ২১৫, ২২০, ২২৫, ২২৬, ২২৭, ২৩১
সামন্তবাদ, ১১, ৪৩, ৬৫, ৭৮, ৭৯, ৯২, ৯৬, ৮৯, ৯৫, ৯৭, ৯৯, ১০৬, ১১৫, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৬, ১৩৭, ১৪২, ১৫০, ১৫৬, ১৭৮, ১৮১, ১৮২, ২১৫, ২২২, ২২৩, ২২৪, ২২৬, ২২৭, ২৩১, ২৩২, ২৩৩, ২৩৫, ২৪২, ২৬৪, ২৬৬
সামন্তবাদী, ১১, ৭২, ৭৯, ৮০, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৬, ৯৯, ১০০, ১০৪, ১০৫, ১০৮, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১২০, ১২১, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৯, ১৬২, ১৬৫, ১৬৯, ১৭৭, ১৮২, ১৮৪, ১৮৬, ২২২, ২২৫, ২২৬, ২২৭, ২৩৬, ২৩৭, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৮
সালাউদ্দিন আহমদ, ১৬, ৬৩
সানিন্, ২২৩, ২২৪
সামির আমিন, ২২৩, ২২৪
সুই, ১৬০, ১৭০, ১৮১
সুভাস কুমার সেনগুপ্ত, ১৬
সুরাহা, ১৪৩
সুলজ্, ২৪
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ১৭
সিমিওনোভ, ইউ, ই., ১৫৩
সিজিওজিনি, ১৭২
সমাজতন্ত্র, ১৪, ১৫, ১৮, ২৬, ২৯, ৩০, ১০৯, ২১৬, ২২৮
সান্-ইয়ান', ১৭৫

সান্, ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৭, ১৭৫, ১৭৬, ১৮১, ১৮২, ১৮৭
সুশাইয়া, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪
সুং রাজবংশ, ১৫৭
সিদাফু, ১৭২
সেন্‌সি, ১৩৩, ১৩৪, ১৫৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪
সেনুআনিয়, ১৭২, ১৭৩
সমাজতন্ত্র ও যুদ্ধ, ২২৮
সান্ অথবা ইন্ রাজত্ব, ১৫৭
সার্ফ, ১৪০, ২৪৭
সার্বজনীন কল্যাণ রাষ্ট্র, ২৬
সামন্ত প্রথার জের, ২২৬
সামন্ত প্রথার অঙ্গ, ২২৬
সঞ্চিত উদ্বৃত্ত মূল্য, ৪৭
সীমাহীন আপেক্ষিকত্ব, ৬৮
সুন্, ১৬০, ১৭০

হ
হল্যান্ড, ৮২
হেগেলীয়, ৩২, ১০২, ২১৩
হো-মো-জো, ১৭৭, ১৮৭
হোমস্টেড অ্যাকট, ২০২
হামজা, ২২৪, ২৩৩
হউআন, ১৫৭
হিলোতেস, ৭৯

A
absolute production, ২১৬
accumulated surplus value, ৪৫
ager publicus, ৯৬, ১০৬
Aggregate Social Product, ৪৬
Alamgir Mohiuddin, ২২৫, ২৬৬
Analysis and Syntheisis, ৯৭
ancient mode of production, ১৩৬
Anikin A, ২০৯, ২১০
antagonistic society, ১৪১

B
Bell D, ৩২
Bernal, J. D., ১৮৭
Betorussov, ৫১
Bhaduri Amit, ২৩০, ২৬৬
Blue Book, ১০২
bonded peasant system, ১৪০
Bogart A.L, ২০৯, ২১০
Brandt B.F, ২০৯, ২১০
by passing capitalism, ২৩০

C
Categories and Laws, ১৯
Chang, Chung-Li., ১৮৭, ১৮৮
Circulation, ২২, ২৫৩
consumption, ৩৯
Contemporary Capitalism, ৫০, ৫২
contextual, ২১৬
Convergency, ২৭
Creel, H. G., ১৮৮

D
De-ideologization of Science, ২২
Democratization of Capital, ২৬

determinism, ২৯, ৯০
dialectic negation, ৩৬
differentiation due to wealth, ৯০
dominant mode of production, ২১, ২১৪, ২১৫, ২৩৮, ২৪০
Divide and Rule, ২১৬

E
Engels F, ২৩৪, ২৬৭
epistemology, ৩৬
essence and appearance, ৩৫
Eurocentric, ৯৭
expropriation of the expropriators, ৬০

F
fatalism, ৯০
form and content, ৩৫
from abstract to concrete, ৩৫
functionalisms, ৯০

G
Gakstgausen. A., ১২৯
general economic laws, ৩৩
Gens, ১২০
Gernet, Jacques., ১৮৮
Goodrich, L. Carrington., ১৮৮

H
Harrison, James. P, ১৮৮
Henretta James, ২০৮, ২১১
historical epoch, ৯০
historical materialism, ৯০
historiography, ১৪, ৬৩, ৮৯
history of ideology, ৯০
holistic concept, ৮৭
Ho-Ping-Ti., ১৮৮
household industry, ১৫৬
Hsu-Cho-Yun, ১৮৮
hyper criticism, ৯০
hypothesis, ১৩, ৩৫

I
Idealistic Rationalism, ২০, ২১
induction and deduction, ৩৫, ৯৭
Inherent Laws, ২২

J
Joes M. Fr., ২০৮

K
Keynes J.M., ২৫
Kipling Rudyard, ১৮৮

L
labour power, ২১৯
land proprietor, ১১৪
law of negation of negation, ৩৫

Lenin, ৯৩, ১২৩, ১৫৩, ১৫৪, ১৬৮, ১৬৯
Lindsay, J., ১৮৮

M
Marx K, ২২৬, ২৬৮
Marx-Engels, ১২৪, ২৩৪, ২৪৯, ২৫২, ২৫৩, ২৬৭
Marxology, ১৮, ৪২
Materialistic dialectic theory of knowledge, ৯৭
Mayers G, ২০৯, ২১১
mechanism of subordination, ৩৯
Men, G. S., ১২৮
methodology of history, ৬৩, ৯০, ৯২
Mixed Economy, ২৬
microsociological method, ৮৯
Mode of Production, ১৩, ১৫, ২০, ২১, ৯০, ৯৫, ১২৩, ১২৪, ১৩২, ১৩৬, ২১৩, ২১৪, ২১৫, ২২২, ২৩৮, ২৪০
monistic, ৮৯
multiple variant, ৯০
Marxian Historiography, ৬৩

N
neccessity and chance, ৩৫
Neopositive-Empiricism and Scepticism, ২০
Nevins A, ২০৯, ২১১
Newly Created Value, ৪৬
Nikiforev and Katchanovsky, ২২৬
North D, ২০৮, ২০৯, ২১১, ২৬৬

O
Ownership-related relations, ১৩৩

P
People's Capitalism, ২৬
Personal Wealth, ৫২
petty-commodity producer, ২২০
pluralism, ৯০
polemics, ১৩১, ১৩৯
poll tax, ১৬৬
positivistic empiricism, ৯০
possibility and reality, ৩৫
prehistory, ১১৯
pre-industrial, ২১৯
preponderance of minifundist family farms, ২৩২
process of concentration, ১৯৫
process of labour, ১৮
Production relation, ২১৪, ২২০, ২৩১, ২৩৮, ২৬৩
productive force, ৯০, ২১৪
pseudomaterialism, ৯০

Q
quotation dogmatism, ২২৭

R
rational historicism, ৯০
reappraisal, ১৩২

S
Schagolov, ২২৬, ২৪২, ২৬৮
Scientific abstraction, ১৯
semi feudalism, ২১৫
Seligman B, ২০৮, ২১২
Shanon F.A, ২০৮
Shouyi, Bai, ১৮৮
Social-Economic formation, ৯১, ১২৩, ১৩২, ২১৪
Socialization of Investment, ২৪
Socio-economic structure, ১৪৪
specific economic laws, ৩৪
Sphere of Production, ২২
Steady Growth, ৫১
Subjective idealism, ২০
subjectivism, ৮৯
super structure, ৮৯
surplus product, ১৩৪

T
Technological Determinism, ২৯
Technological Structure, ৩১
The law of the negation of negation, ৩৩
The law of the unity and struggle of opposites, ৩৩
The law of transformation of quantity into quality and vice-versa, ৩৩
Theory of de-ideologization, ৩১
Thompson M.ch., ২০৮
Traditional Structure, ১৪৩
Transformation of Capitalism, ২৬
transitional economy, ২২০
transitional period, ৯০

U
Unity of logical and historical methods, ৩৫

V
village communities, ১২০
vulgar economic thinking, ৫৪
vulgar mechanicism, ৯০
Validation, ১৩
Vygodsky S. L., ৫০, ৫২

W
Walras M., ২৬
Welfare State, ২৬